প্রথম প্রকাশ – রথ দ্বিতীয়া, ৯ জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশিকা—বীথিকা গঙ্গোপাধ্যায়
'সুরম্যা সত্যবীথিকা'
ছাতাগলি, চুঁচুড়া–৭১২১০১

গ্রন্থস্বত্ব—কৃষ্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ—সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক—শান্তি প্রেস, বড়বাজার, চুঁচুড়া

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশিকা
পুস্তক বিপণি,
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

গালিব, জফর ও ইকবালের অনুবাদের পর গ্রন্থাকারে মীরের অনুবাদ দ্বারা বাংলায় আমার উর্দূ পদ্যানুবাদের কাজ আপাতত শেষ হল। পরবর্তী গ্রন্থে বিভিন্ন- ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হবে, কিছু প্রমুখ উর্দূ কবির কবিতার অনুবাদও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। উপরোক্ত গ্রন্থত্রয়ের ন্যায় মীরের গ্রন্থও বাংলা সাহিত্যে প্রথম। ইতিমধ্যে এই চার কবির নির্বাচিত কবিতার সংকৃত ইংরাজী অনুবাদ 'Echoes From Urdu' প্রকাশিত হয়েছে। ইকবালের কবিতার অনুবাদ গ্রন্থের ন্যায় বর্তমান গ্রন্থেও মীর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও টীকা সংযোজিত হ'ল। এই গ্রন্থে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মীরের জীবনপঞ্জী সংগঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর রচনার বিবিধ অনন্যতার প্রতিও এই গ্রন্থে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমাদের যতদূর জানা আছে এ দুটি কাজ এ পর্যন্ত এত বিস্তৃত পরিসরে করা হয়নি।

ইকবালের কবিতার ক্ষেত্রে আমার উর্দূ-বান্ধব শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, বন্ধুবর শ্রীআলি হাসান ও কলকাতা মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রী এ, এম, এ, হোসেনের সহায়তা ছিল উদার ও ঐকান্তিক। মীরের কবিতার ক্ষেত্রেও বন্ধুবর শ্রীআলি হাসান এবং নবলব্ধ বন্ধু হুগলী মাদ্রাসার শিক্ষক শ্রীগোলাম মহীউদ্দীনের সহায়তা ছিল অনুরূপ। হুগলী মাদ্রাসার অপর শিক্ষকবৃন্দের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নানা কারণে গ্রন্থ প্রকাশে তিন চার বৎসর বিলম্ব হ'ল। আমার অনুবাদ গ্রন্থগুলি সমালোচক ও পাঠকদের আনুকূল্য লাভ করেছে। বর্তমান গ্রন্থটিও যদি অনুরূপ সৌভাগ্য অর্জন করে তবে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

গ্রন্থ প্রকাশকালে একটি খেদ রইল। তা এই যে বন্ধুবর আলি হাসান ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌতে দেহত্যাগ করেছেন, গ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দিতে পারা গেল না। ইন্নাল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজে অউন (আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব—কোরাণ-২ / ১৫৬)।

এই গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিক ও অন্যান্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও তাতে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কিছু ভুলের সংশোধন করা হয়েছে। তবু সহৃদয় পাঠক যদি আরো ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তবে বাধিত হবো।

চুঁচুড়া।

সত্যা গঙ্গোপাধ্যায়

ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

এম. এ., ডি. ফিল,

বরিষ্ঠ বন্ধুবরেষু

সূচী—

এই লেখকের : সরোজিনী নাইডুর কবিতা
মির্জা গালিবের কবিতা
বাহাদুর শা' জফরের কবিতা
ইকবালের কবিতা
Echoes From Urdu
(Verse translation of selected poems of four leading Urdu poets)

জীবন

মীরের পূর্বপুরুষ দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের হেজাজ. অঞ্চল থেকে নিজ গোষ্ঠীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে আসেন। সেখান থেকে আসেন অহ্‌মদাবাদে এবং পরে অকবরাবাদে (আগ্রায়)। সেখানেই এই পরিবার বসতি স্থাপন করেন।

মীরের পিতারা ছিলেন দুই ভাই। জ্যেষ্ঠভ্রাত ছিলেন বিকৃত মস্তিষ্ক। যৌবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। মীরের পিতার নাম মুহম্মদ আলি। লোকে সম্ভ্রম ক'রে তাঁকে আলি মুতকী বলত। মুতকী কথার অর্থ জাগতিক বিষয়ে উদাসীন। তিনি বস্তুতই ছিলেন জাগতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এক বহুমান্য সূফী দরবেশ। একটি শের-এ মীর যেন নিজ পিতার চিত্র অঙ্কিত করেছেন :

হমীশহ্‌ চশম হ্যায় নম্‌নাক হাথ দিল্‌ পর্‌ হ্যায়্‌
খু.দা কিসোকো নহ্‌ হম্‌সা ভী দর্দ্‌ মন্দ্‌ করে
সিক্ত সদা দুই আঁখি হস্ত ন্যস্ত বক্ষের উপরে,
আর কারে খোদা যেন আমা হেন আতুর না করে।

[মীরের পিতা দু'টি বিবাহ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠা ছিলেন দিল্লীর মান্য ফ'র্সী কবি সিরাজুদ্দীন আলি খাঁ আজু.'র ভগ্নী। মীর ছিলেন দ্বিতীয়ার গর্ভজাত। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় মীরের জন্ম হয়।

পিতা মীরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁকে নানা উপদেশ দিতেন। পিতা বলতেন, 'বেটা, প্রেমের আশ্রয় নাও, কেননা প্রেম ব্যতীত জীবন বোঝা স্বরূপ। দুনিয়ার যা কিছু আছে সবই প্রেমের প্রকাশ। পৃথিবীর সব কিছু প্রেমেই আচ্ছাদিত। এই দুনিয়া এক হাঙ্গামা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এমন কারো প্রেমিক হও এই পৃথিবী যাঁর প্রতিবিম্ব।' পিতা মীরের শরীর সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করতেন এবং কখনো কখনো তাঁর জন্য ক্রন্দন করতেন। মীরের এক বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হাফিজ. মুহম্মদ হাসান। মীরের প্রতি পিতার অত্যধিক স্নেহের জন্য বৈমাত্রের ভ্রাতা মীরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। মীরের এক সহোদর ভ্রাতাও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মুহম্মদ রজ.ী।

পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আগ্রায় মীরের জীবন স্বস্তি ও প্রীতিতে কেটেছে। কিন্তু অল্প বয়সেই (এ সময়ে মীরের বয়স ছিল বছর দশেক) পিতার মৃত্যু হল। মীরের স্বস্তি অপগত এবং দুর্দ্দিন সমাগত হ'ল। পিতার এক অত্যন্ত অনুগত শিষ্য ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সৈয়দ অমানুল্লাহ্। মীরের পিতা একবার লাহোর থেকে ফেরার পথে অমানুল্লাহ্-র বাসস্থান আগ্রার ঈষৎ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বয়ানায় উপস্থিত হন। সে দিনটি ছিল অমানুল্লাহ্-র বিবাহ দিবস। মীরের পিতার প্রভাবে অমানুল্লাহ্ নববিবাহিতা পত্নী এবং স্বগৃহ পরিত্যাগ করে চিরদিনের জন্য গুরুগৃহে আগ্রায় চলে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মীরের পিতার সঙ্গেই বসবাস করেন। বাল্যকালে মীর এঁর তত্ত্বাবধানে লেখা পড়া করেন এবং কোরান অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন ঈশ্বর-জ্ঞানিত পুরুষের কাছেও ইনি মীরকে নিয়ে যেতেন। মীরের যখন সাত বৎসর বয়স তখন অমানুল্লাহ্ আগ্রায় আসেন। মীরের দশ বৎসর বয়সের সময় পিতার মৃত্যুর কিছু পূর্বে অমানুল্লাহ্-র মৃত্যু হয়। সুতরাং মীর তিন বৎসর তাঁর সাহচর্য পেয়েছিলেন।

মীরের পিতা অমানুল্লাহ্কে ভাই বলতেন। তাই মীর তাঁকে বলতেন পিতৃব্য। এঁর মৃত্যুতে মীর পিতৃবিয়োগের ন্যায় বা ততোধিক দুঃখ পেয়েছিলেন। অমানুল্লাহ্ মীরকে সন্তানবৎ স্নেহ করতেন। তিনি জীবিত থাকলে পিতার মৃত্যুর পর মীর বিপন্ন হয়ে পড়তেন না। পরিণত বয়সে 'জি.করে মীর' নামক আত্মজীবনী লেখার সময়েও মীর অত্যন্ত প্রীতি ও সম্মানের সঙ্গে অমানুল্লাহ্-র উল্লেখ করেছেন।

পিতার মৃত্যু হ'ল। মীর এবার কি করবেন, কি করে সংসার প্রতিপালিত হবে? স্বভাবতই মীরের দৃষ্টি গেল দিল্লীর দিকে। দিল্লী ভারতের রাজধানী, অর্থ ও ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। আগ্রা থেকে দিল্লীর দূরত্বও বেশি নয়। তদুপরি তখন দিল্লীতে প্রভাবশালীদের মধ্যে মীরের দরবেশ পিতার গুণগ্রাহী কিছু লোক ছিলেন। অতএব কিশোর মীর কিছুকাল এদিক ওদিক পরিভ্রমণ ক'রে একদিন দিল্লীর পথে পা বাড়ালেন। তখন সময়টা ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি।

দিল্লীতে তখন মুহম্মদ শাহ্ সম্রাট এবং প্রধান দু'জন রাজপুরুষ ছিলেন নবাব সমসামুদ্দৌলাহ্ অমীরুল উমরা খান-ই-দৌরান এবং তাঁর ভ্রাতা মুজ-ফ্ফর খাঁ। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিত, যদিও উজ়ীর বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এৎমাদুদ্দৌলাহ্ কমরুদ্দীন খাঁ। সমসামুদ্দৌলাহ্ ছিলেন পদাধিকার বলে উজীরের পর দ্বিতীয় মুখ্য পদাধিকারী মীর বখ্শী (রাজকীয় অর্থ প্রদান বিভাগের প্রধান এবং সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজপুরুষ) এবং মুজ-ফ্ফর খাঁ ছিলেন সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রিয়পাত্র। উজীরের অমুজ্জ্বলত্ব ও অকর্মণ্যতার জন্য এঁরা দুই ভাই সম্রাটের উপর প্রভাব বিস্তার করে দরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। সমসামুদ্দৌলাহ ছিলেন মীরের পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মীর দিল্লী এসে তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলে তিনি নিজ সরকার থেকে মীরকে দৈনিক এক টাকা ভাতা নির্দ্দিষ্ট করে' দিলেন। মীর বহুলাংশে নিশ্চিন্ত হয়ে আগ্রা ফিরে এলেন।

এরপর প্রায় চার বৎসর মীরের জীবন আপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হয়। তারপর এল ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ। এই বৎসরের প্রথম দিকে নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করেন। কর্ণালের যুদ্ধে মুহম্মদ শাহ্ পরাজিত হন। নিহত হন ভ্রাতা মুজ-ফ্ফর খাঁ সহ সমসামুদ্দৌলাহ্।

কর্ণালে সমসামুদ্দৌলাহ্ প্রয়াত হলেন, আর আগ্রার মীরের উপর সর্বনাশ নেমে এলো। তাঁর দৈনিক ভাতা বন্ধ হ'ল, ছিন্ন হ'ল তাঁর জীবনযাপনের সূত্রটি। আগ্রায় একদিন পিতার জন্য যাঁরা মীরের প্রতি সদয় এবং প্রসন্ন ছিলেন, তাঁরা এখন তাঁর বিরোধিতা করতে লাগলেন। মীর লিখেছেন, 'পিতার জীবিতাবস্থায় যারা আমার পায়ের ধূলো সুর্মা ব'লে চোখে লাগাত, তারা এখন মুখ ফিরিয়ে রইল।' আগ্রায় বাস মীরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে মীর আবার দিল্লীর পথ ধরলেন।

পিতার মৃত্যু হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আগ্রায় সুহৃদবর্গ ও আত্মীয়রা কেন মীরেরপ্রতি বিমুখ হলেন, মীর তার কোনো কারণ উল্লেখ করেন নি। মীর না বললেও আগ্রায় সুহৃদবর্গ ও আত্মীয় বন্ধুদের মীরের উপর বিরূপ হওয়ার একটি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময় মীরের কৈশোর অতিক্রান্ত, যৌবন প্রায় সমাগত। বয়স পনেরো বছরের মতো। শোনা যায় এসময়ে তিনি এক বিবাহিতা আত্মীয়ার সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েন। নবাব সমসামু-

দ্দৌলাহ্‌র বৃত্তি পাওয়ায় আর্থিক দিকে অনেকটা নিশ্চিন্ততা এসেছিল। এদিকে যৌবনও সমাগতপ্রায়। তদুপরি পিতার কাছ থেকে মীর সর্বদা প্রেমের কথা শুনতেন, যদিও তা ঈশ্বর প্রেম। এ সবের সমাহারে নবীন যুবকের চিত্ত-চঞ্চলতা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল।

মীর দিল্লী এলেন। সময়টা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। বছরের প্রথম দিকে কর্ণালের যুদ্ধের শেষে দিল্লী লুণ্ঠন করে নাদির শাহ্‌ ৫ মে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। নাদিরের সৈন্যদের হাতে দিল্লী শহরে ২০,০০০ লোক প্রাণ হারালেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কবি-সাহিত্যিকদের কেউ মারা যান নি। দিল্লীর কবি-সাহিত্যিকদের অন্যতম প্রধান ছিলেন পূর্বোক্ত ফার্সী কবি সিরাজুদ্দীন আলি খাঁ আর্জু। নাদির শাহ্‌ দিল্লীর রাজকোষ এবং সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন লোকদের গৃহ লুণ্ঠন করে ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। মনে হয় আর্জু তত সম্পন্ন ছিলেন না এবং সেজন্য লুণ্ঠন এড়াতে পেরেছিলেন সমসামুদ্দৌলাহ্‌-র মৃত্যুর পর এখন দিল্লীতে মীরের পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো অপর কেউ ছিলেন না। আর্জু ছিলেন বিমাতার সম্পর্কে মীরের মাতুল। সুতরাং মীর এবার আর্জুর কাছেই আশ্রয়প্রার্থী হলেন। নাদির শাহ্‌-র লুণ্ঠনের সাক্ষাৎ শিকার না হওয়ায় আশ্রয় দিতে আর্জুর অসুবিধা হ'ল না। তা ছাড়া সে বছর সময় মতো উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় ফসল খুব ভাল হ'ল, এবং নাদিরের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে' দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে সুদিন পরিলক্ষিত হ'ল। এর সুফল আর্জুও নিশ্চয় ভোগ করেছিলেন।

আর্জু মীরকে আশ্রয় দিয়ে কবিতা রচনায় হাতে খড়ি দিলেন এবং মীর তাঁর আনুকূল্যে শহরের সম্ভ্রান্ত লোকদের গৃহ হ'তে কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করেন। আর্জুর সংস্পর্শে আসার আগে অমানুল্লাহ্‌-র কাছে মীর কিছু অধ্যয়ন করেছিলেন। এখন তিনি আরো কিছু অধ্যয়নের সুযোগ পেলেন। কবিতা রচনার কোনো প্রয়াস মীর আগ্রায় করেননি মনে হয়। আর্জুর কাছে তার শুভসূচনা হল। মীর একটু সুসময়ের মুখ দেখলেন।

কিন্তু মীরের এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। আর্জুর কাছে মীরের আশ্রয় পাওয়ার সংবাদ আগ্রায় পৌঁছল। আগ্রা থেকে আর্জুর কাছে বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্র এলো, মীর অশান্তির সৃষ্টিকারী, তার সহায়তার জন্য অবশ্যই

কোনো চেষ্টা করবেন না'। মীরের প্রতি পিতার স্নেহের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মীরের উপর বিরূপ ছিলেন, কিন্তু আজু.'র কাছে লিখিত পত্রে তিনি মীরকে যে অশান্তির সৃষ্টিকারী বলেছেন তার অন্য অর্থ ছিল। তিনি এর দ্বারা নিকটাত্মীয়া বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে মীরের গোপন প্রণয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ ঘটনা পত্রে বিবৃত করেছিলেন বলেও মনে হয়, নতুবা মীরের প্রতি সহৃদয় আজু.'র পরবর্তী আচরণের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আজু.'র গৃহে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যুবতী থাকারই সম্ভাবনা। হয়তো সে কারণেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাতুল আজু.'কে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মীর লিখেছেন যে ঐ পত্র পাওয়ার পর আজু.' তাঁর প্রতি খুবই বিরূপ হলেন, দেখা হলেই তাঁকে তিনি ভৎর্সনা করতেন এবং তিনি যেন বস্তুতই মীরের এক দুশমন হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দুর্ব্যবহার এতই বৃদ্ধি পেল যে তার পূর্ণ বিবরণ দিলে তা একটি 'দফতরের (ফাইল) আকার ধারণ করবে।' মীরের অবস্থা এখন উন্মাদের মতো হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি সারাদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়ে' থাকতেন।

এরপর আজু.'র সঙ্গে মীরের সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল। মীর আবার পথে বেরোলেন। কিছু কালের জন্য মীর অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়লেন। (স্মরণ করা যেতে পারে যে মীরের জ্যেষ্ঠভ্রাত উন্মাদ ছিলেন।) এবার মীরের পিতার আর এক ভক্ত ও গুণগ্রাহী আত্মীয় কম.রুদ্দীনের স্ত্রী মীরের সহায় হলেন। তিনি মীরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং অনতিবিলম্বে মীর আরোগ্য লাভ করলেন।

মনে হয় এঁর আশ্রয়ে বাস করার সময়েই মীর অধ্যয়ন ও কবিতা রচনায় আবার উৎসাহ পান। মীর তাঁর এ সময়ের দুই গুরুর কথা উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন অজ.ীমাবাদ নিবাসী মীর জাফর এবং অমরোহা নিবাসী সৈয়দ সাদৎ আলি। এঁদের শিক্ষায় মীর যথাক্রমে অধ্যয়ন ও কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করলেন এবং অল্পদিনেই দিল্লীতে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, ছোট বড় সকলেই তাঁর কবিতা সাগ্রহে পড়তে লাগলেন। বস্তুত কবিত্ব ছিল মীরের মজ্জাগত, ঈশ্বর দত্ত। আজু.', মীর জাফর এবং সৈয়দ সাদৎ আলি তার উৎস-

মুখটি মাত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নতুবা এত স্বল্প শিক্ষায় ও পরিশ্রমে এরূপ দক্ষতা ও খ্যাতি লাভ সম্ভব নয়।

আর্জু এবং ঐ দুই শিক্ষক তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মীরকে নিশ্চয়ই ফার্সীতে কবিতা রচনায় শিক্ষা দেন। কিন্তু মীরের সৌভাগ্য ক্রমে শেষোক্ত জন মীরকে মাতৃভাষা উর্দুতে কবিতা রচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করেন। বাংলায় মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছিল। উর্দুর সৌভাগ্যক্রমে এই সাহিত্যে একশত বৎসর পূর্বেই তা ঘটল এবং উর্দু একশত বৎসর পূর্বেই তজ্জনিত সুফলের অধিকারী হ'ল। গালিবকে এরূপ পরামর্শ দেওয়ার কেউ ছিলেন না, থাকলে হয়তো তাঁর হাত থেকে অধিক ও উৎকৃষ্টতর রচনা উর্দু সাহিত্য পেত।

মীরের এ সময়ে নিজ ভরণপোষণের কোনো উপায় ছিল না। ভরণপোষণের নিশ্চিত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে দুই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন এবং কবিতা রচনায় শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। তাই মনে হয় পূর্বোক্ত মহিলাই মীরের এ সময়ের এই প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন। এতে দু' তিন বৎসর সময় লেগে থাকতে পারে। তা হ'লে ১৭৪২/৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মীর ফখরুদ্দীনের স্ত্রীর আশ্রয়ে বাস করেন।

মীরের কবিখ্যাতি যখন শহরে ব্যাপ্ত হ'ল তখন পৃষ্ঠপোষকের অভাব হ'ল না। এবার মীরের পৃষ্ঠপোষক হলেন পূর্বোক্ত উজীর (প্রধান মন্ত্রী) এত্‌মাদুদ্দৌলাহ্ কমরুদ্দীন খাঁর দৌহিত্র রিয়ায়েৎ খাঁ। এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মীরের ছ' সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পাঞ্জাবের মানুপুরে অহ্‌মদ শাহ্ আবদালীর সঙ্গে মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌র প্রথম যুদ্ধ হয়। এ সময়েও উজীর ছিলেন এৎমাদুদ্দৌলাহ্ কমরুদ্দীন খাঁ। যুদ্ধের পূর্বে আবদালীর শিবির থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গোলার আঘাতে ইনি মারা যান। কিন্তু যুদ্ধে আবদালী পরাজিত হয়ে স্বদেশে পলায়ন করেন। উজীরের সঙ্গে দৌহিত্র রিয়ায়েৎ ও যুদ্ধে গিয়েছিলেন। মীর হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গী।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেও মীর রিয়ায়েৎ খাঁর সঙ্গেই ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে উজীর কমরুদ্দীন খাঁর মৃত্যুর পর এবার উজীর হলেন অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ। মাতামহের উজীরত্বের সময়ে রিয়ায়েতের যে প্রতিপত্তি ছিল এখন তা

রইল না। উপরন্তু রিয়াযেতের এক ব্যবহারে আত্মাভিমানী মীর ক্ষুব্ধ হলেন। রিয়াযৎ তাঁর একটি কাওয়াল (গায়ক) বালককে মীরের কিছু কবিতা শিক্ষা দিতে মীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বাধ্য করলেন। মীর বালককে শিক্ষা দিলেন বটে, তবে তারপর রিয়াযেতের সংসর্গ তিনি পরিত্যাগ করলেন। সময়টা ছিল ১৭৪৯/৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

এবার অন্য তীরে তরী বাঁধা। ১৭৪৮-এর মার্চে মানুপুরের যুদ্ধ হ'ল। এপ্রিলে বিজয়ী সম্রাট মুহম্মদ শাহ্-র মৃত্যু হওয়ায় একমাত্র পুত্র আহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। নতুন উজীর অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ্ রাজধানীর বাইরেই বেশি থাকতেন। দরবারে সম্রাটের সবচেয়ে বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠলেন নবাব বাহাদুর নামে পরিচিত নপুংসক জাভিদ খাঁ। মীর এবার এঁর আশ্রয় পেলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক নিরক্ষর জাভিদ খাঁ কবি মীরের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন।

গোত্রপরিচয়হীন জাভিদ খাঁ দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিত্বহীন আমোদপ্রিয় সম্রাটকে উচ্চকুলোদ্ভব অযোধ্যার নবাব প্রধানমন্ত্রী সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে লাগলেন। সুতরাং সফদর জঙ্গ জাভিদকে ভালো চোখে দেখলেন না। উভয়ের বিবাদ ক্রমবর্ধমান হ'ল। অবশেষে সফদর জঙ্গ্ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আলোচনার জন্য স্বগৃহে জাভিদ খাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে হত্যা করালেন। মীরও ঐ সময় থেকেই আবার আশ্রয়চ্যুত হলেন। জাভিদ খাঁর আশ্রয়ে মীর দু' আড়াই বৎসর মাত্র ছিলেন।

এবার কোথায়? এবার জাভিদের প্রতিপক্ষ শিবিরেই মীরের আশ্রয় জুটল। সফদর জঙ্গের এজেন্ট (প্রতিনিধি) ছিলেন রাজা লছমীনারায়ণ। (মীর সম্ভবত এঁকেই উজীরের দেওয়ান মহানারায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন।) রাজা নিজেই মীরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মীর এই প্রথম হিন্দু রাজপুরুষের আশ্রয়ে এলেন। কিন্তু এ আশ্রয় ছিল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী। সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ ও যুদ্ধের পর ১৭৫৩'র নভেম্বর মাসে সফদর জঙ্গ্ উজীরত্ব পরিত্যাগ করে নিজ রাজ্য অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। রাজা লছমীনারায়ণেরও পদলুপ্তি ঘটল। মীর আবার অনাথ হলেন।

রাজা লছমীনারায়ণের সঙ্গে এক বৎসরের মতো থাকার পর মীর এলেন

আর এক হিন্দু রাজপুরুষের আশ্রয়ে। ইনি হলেন রাজা যুগলকিশোর। মীর লিখেছেন যে রাজা লছমীনারায়ণের আশ্রয়চ্যুতির দু' তিন মাস পর রাজা যুগলকিশোর তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে নিয়ে যান। রাজা লছমীনারায়ণ এবং রাজা যুগলকিশোর উভয়েই ছিলেন উজীর সফদর জঙের দুই প্রধান রাজপুরুষ। ১৭৫৩'র নভেম্বর মাসে যখন সফদর জঙ উজীরত্ব পরিত্যাগ ক'রে নিজ রাজ্যে চলে গেলেন, তখন উভয় রাজাই পদ ও প্রাধান্য হারালেন। সম্রাট আহম্মদ শাহ্ উভয়ের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করলেন। পরবর্তী উজীর ইন্তিজামুদ্দৌলাহ্ সম্রাটের কাছ থেকে এঁদের মার্জনা আদায় করেন এবং ১৭৫৪'র মে মাসে উভয়ের সম্পত্তিও ফেরৎ দেওয়ান। মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই দুই যোগ্য রাজপুরুষকে সম্রাটের কাজে পুনরায় নিয়োগ করা। পরবর্তী কালে ১ম জন যে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তা ইতিহাস থেকে জানা যায়—১৭৬২'র ফেব্রুয়ারী মাসে রাজা লছমীনারায়ণ পাঞ্জাবের সর্‌হিন্দের দেওয়ান ছিলেন। মনে হয় সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার পরই রাজা যুগল কিশোর মীরকে আপন আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহ'লে মীরের নিরাশ্রয় থাকার কালটা দু-তিন মাস না হয়ে কিছু বেশি হয়। তবে রাজা যুগলকিশোর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাই যে কোনো অবস্থায়ই একটি মাত্র লোকের ভরণপোষণ তাঁর পক্ষে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সে মানসিকতা হয়তো নাও থাকতে পারে।

এক্ষেত্রে অপর বিচার্য বিষয় হ'ল এই যে যখন উভয় রাজাই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন তখন একজন মীরকে পরিত্যাগ করলেন কিন্তু অপর জন তাঁকে গ্রহণ করলেন কেন? মনে হয় দ্বিতীয় জনের উপর বিপর্যয় কিছু পরে এসেছিল এবং সেই অবকাশে মীরকে তিনি আশ্রয় দেন।

১৭৫৪'য় মীর রাজা যুগলকিশোরের আশ্রয়ে এলেন। ১৭৫৭'র জানুয়ারীতে আবদালির আক্রমণের সংবাদ আসায় ভীত দিল্লীবাসীদের সঙ্গে রাজা যুগলকিশোর আশ্রয়ের আশায় মথুরা যাত্রা করেন। রাজার জীবনে এই দ্বিতীয় দুর্দৈব। সম্ভবত এসময়েই মীরকে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। রাজা যুগলকিশোরের আশ্রয়ে মীর প্রায় তিন বৎসর ছিলেন।

মীর এবার দেওয়ান নাগরমলের আশ্রয়ে এলেন। দেওয়ান নাগরমল

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের খাস এলাকার দেওয়ান। দীর্ঘকাল তিনি এপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই শক্তিশালী আশ্রয়ে মীরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার সুযোগ পান। ১৭৫৭'র জানুয়ারি থেকে ১৭৭১-এর শেষার্ধ পর্যন্ত প্রায় পনেরো বৎসর মীর দেওয়ান নাগরমলের কাছে ছিলেন।

দেওয়ান নাগরমলের কাছে থাকার সময়টা মীরের অপেক্ষাকৃত শান্তি ও সম্মানে কেটেছে। কিছু পূর্বে দিল্লীতে প্রচুর অশান্তি ও হাঙ্গামা হয়েছে। পরে যুবরাজ দিল্লী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। সম্রাট হয়েছেন নিহত। দিল্লী প্রভুহীন নগরীরূপে রয়েছে প্রায় দশ বৎসর। এ সময়ে দেওয়ানের শক্তিশালী ছত্রছায়ায় মীরের আর্থিক ও শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। দেওয়ান নাগরমল ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের অন্যতম। সুতরাং রাষ্ট্রের অপর প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁদের গৃহে তাঁকে রাজকার্যে যাতায়াত করতে হ'ত। সময়টা ছিল মীরের মধ্য-যৌবন থেকে পরিণত বয়সে উত্তরণের কাল। দেওয়ানের নিরাপদ আশ্রয়ে এই প্রথম মীর একটানা দীর্ঘকাল নিশ্চিন্তে সাহিত্য রচনা করতে পারলেন। কবি খ্যাতি তখন তাঁর শীর্ষে। তাই দেওয়ান নাগরমলও নিশ্চয়ই মীরকে আশ্রয় দেওয়া সম্পর্কে গর্ব অনুভব করতেন। সুতরাং রাজনীতিক ও সামাজিক সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি মীরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। রাজপুরুষরাও মীরকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। এসময়ে দিল্লী-বিজয়ী অহমদ্ শাহ্ আবদালীর প্রতিনিধিরূপ রোহিলা সর্দার নাজিবুদ্দৌলাহ্ দিল্লীতে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত। তাঁর নেতৃত্বে দিল্লী ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

দেওয়ান নাগরমলের সঙ্গে মীর দীর্ঘকাল ছিলেন। নিজ আশ্রয় থেকে দেওয়ান নাগরমল মীরকে অপর এক উচ্চ রাজপুরুষের কাছে পাঠান। ইনি ছিলেন সেকালে সম্রাট ২য় শাহ্ আলমের সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন হুসামুদ্দীন। এঁরই পরামর্শে দিল্লী থেকে বিতাড়িত সম্রাট এলাহাবাদের নিরাপদ ব্রিটিশ আশ্রয় ত্যাগ করে বিঘ্নসঙ্কুল দিল্লীতে ফিরে আসেন। এলাহাবাদ থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে সম্রাট ফররুখাবাদের কাছে অবস্থান করছিলেন। সময়টা ১৭৭১-এর জুলাই-আগষ্ট মাস। মীর এখানে এসে হুসামুদ্দীনের সঙ্গে

মিলিত হলেন। কিন্তু হুসামুদ্দীনের সঙ্গ করা মীরের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তিনি হুসামুদ্দীনের আশ্রয় হারালেন। ইতিপূর্বে নাগরমলের আশ্রয়ও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। সুতরাং মীর এবার সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হলেন।

এ সময়ে মীর কারো আশ্রয় না পেলেও বন্ধু পেয়েছিলেন। তিনি হলেন আবুল কাসিম খাঁ। ইনি ছিলেন সে সময়ে (মে, ১৭৭৩—নভেম্বর, ৭৯খ্রী:) দরবারে সম্রাটের সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ও পরামর্শ দাতা আব্দুল অহদ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। হুসামুদ্দীনের অনতিবিলম্বে পতন হয়েছিল। পতনের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আব্দুল অহদ খাঁ। সাড়ে ছ' বছর আব্দুল অহদ খাঁর প্রাধান্য বর্তমান ছিল। সম্ভবত এ সময়েই মীর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। পিতৃব্যের প্রাধান্য যখন অপসৃত হ'ল এবং তিনি বন্দী হলেন তখন আবুল কাসিম খাঁর বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও সহায়তা থেকে মীর বঞ্চিত হলেন। অন্যান্যদের মতো আবুল কাসিম খাঁ মীরের আশ্রয় দাতা ছিলেন না, সহায়ক ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন মাত্র। আব্দুল অহদের পতনের পর সম্রাট শাহ্ আলমের নিজের খুব দুরবস্থা হয়। সুতরাং তাঁর পক্ষে মীরকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়নি, যদিও তিনি নিজে কবি হওয়ায় মীরের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে মীরকে কিছু কিছু সাহায্য পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে মীরের দিল্লী ত্যাগের পটভূমিকা তৈরী হ'ল।

রোহিলা সর্দার নাজিবুদ্দৌলাহ্-র পর দিল্লীতে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হ'ন সেনাপতি মির্জা নজফ খাঁ। দশ বৎসর তার প্রাধান্য বজায় ছিল। মির্জা নজফের মৃত্যুর পর (এপ্রিল, ১৭৮২) তাঁর চার সহকারীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়। এ সময়েই লক্ষ্ণৌ থেকে নবাব আসফুদ্দৌলাহ্-র আমন্ত্রণ আসায় নিমজ্জিত ব্যক্তির ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনের ন্যায় মীর সাগ্রহে সেই বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করলেন।

মীর ৪০ বৎসর দিল্লীতে ছিলেন। জীবনের বাকি ২৮ বৎসর তাঁর লক্ষ্ণৌতে কাটে। দিল্লীতে অভাব, অনিশ্চয়তা ও অসহায়তার তিনি শিকার হয়েছিলেন। স্রোতের শৈবালের ন্যায় তিনি ভেসে বেড়িয়েছেন। লোককথার কাহিনীতে যেমন, তেমনি ভাবে তিনি যে ডাল ধরেন সেই ডালই ভাঙে। শেষে লক্ষ্ণৌ এসে তাঁর দিল্লীর পূর্বোক্ত অবস্থার অবসান হয়। তখন তাঁর বয়স

ষাট বৎসরের মতো। নবাব তাঁর জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁর কবি-খ্যাতি পূর্বেই লক্ষ্ণৌ পৌঁছেছিল। মনে হয় লক্ষ্ণৌতে আসার পূর্বে মীরের শ্রেষ্ঠ রচনার সবটাই না হলেও অধিকাংশ রচিত হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্ণৌ এসে মীরের যে পরিস্থিতি হ'ল তা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অনুকূল ছিলনা। মনে হয় এখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কমই রচিত হয়। লক্ষ্ণৌতে মীর নিরাপত্তা পেয়েছেন কিন্তু হারিয়েছেন সৃষ্টির মানসিকতা। এখানে মীর পেলেন ক্রমবর্ধমান অসুস্থতা, দিল্লী ত্যাগের বেদনা, অশালীন ও চটুল দরবারী পরিবেশ এবং বন্ধুহীনতা। এ সবই উত্তম সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধক।

মীর আসায় লক্ষ্ণৌর সাহিত্যিক পরিবেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। ঘন ঘন কবিতা পাঠের আসর (মুশায়রা) বসতে লাগল। দূর দূর থেকে আমীর গরিব সবাই আসতে লাগলেন মীরের নিজ মুখ থেকে কবিতা শোনার জন্য এবং শোনার পরে নিজ নিজ বাসস্থানে তাঁরা সেই সব কবিতা নিয়ে যেতে লাগলেন। দরবারে এবং জনসমক্ষে মীরের জনপ্রিয়তা ও সম্মান ঊর্ধ্বমুখী হ'ল। কিন্তু এসব সত্বেও যে নগরী মীরকে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্ততা দিল সে নগরীকে বা তার নবাবদের মীর কোনো দিনই ভালোবাসতে পারেন নি। লক্ষ্ণৌর নিন্দায় মীর শের লিখেছেন। নবাবদের প্রতি তিনি দুর্ব্যবহার করেছেন। অবশেষে অগ্রসরমান মৃত্যু তাঁর বাকি সাহিত্যে এবং জীবনে ছায়াপাত করল। বন্ধু তাঁর কোনো দিনই বেশি ছিলেন না। এখন তাঁরা আরো অপসৃয়মান হলেন। শেষে ভগ্নহৃদয়ে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে একদিন মীর লক্ষ্ণৌতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মীরের পরিবার সম্বন্ধে যে খবর জানা যায় তা এই যে তিনিও সম্ভবত পিতার ন্যায় দু'টি বিবাহ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যা রেখে যান। এঁরা সকলেই কবিতা লিখতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ আস্কারি পিতার ন্যায় মনোভাবাপন্ন ছিলেন। 'অর্শ্' ছিল তাঁর তখল্লুস। কনিষ্ঠ পুত্র মীর ফয়েজ আলির তখল্লুস ছিল 'ফয়েজ'। কন্যা 'বেগম' তখল্লুস গ্রহণ করেছিলেন। মীরের জীবিতাবস্থায় বিবাহের পর এই কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে বৃদ্ধ ও বিষন্ন মীরকে আরো বিষাদসাগরে নিমজ্জিত করে যান।

যে দু'টি গ্রন্থ থেকে মীরের জীবন কথা জানতে পারা যায় তা মীরের নিজের রচনা। গ্রন্থ দু'টি ফার্সী ভাষায় লেখা। নাম 'জি.করে মীর' (মীরের কথা) এবং 'নিকাতুল শোয়া' (কবি কথা)। প্রথমটি প্রথমে এবং দ্বিতীয়টি বহু পরে লিখিত হয় বলে ডঃ হক অনুমান করেছেন। জি.করে মীর গ্রন্থে মীর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমোক্ত বৎসরে দিল্লীতে সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ (১৭১৯–১৭৪৮ খ্রীঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তৎপুত্র আহ্‌ম্মদ শাহ্ (১৭৪৮–৫৪ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন দ্বিতীয় বৎসরটিতে ভারতে মুঘল শাসক বংশের ইতিহাসে নিকৃষ্টতম অপমান ও দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাটি হ'ল, এই বৎসরের শেষ ভাগে আধুনিক উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রোহিলখণ্ডের রোহিলা সর্দার গুলাম কাদের খাঁ অরক্ষিত দিল্লী দখল করে' অর্থ আদায়ের জন্য অসহায় সম্রাট ২য় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে চরম অপমান করে এবং পরে সম্রাটের চক্ষু অন্ধ ও উৎপাটিত করে। জি.করে মীর গ্রন্থে যখন ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তখন গ্রন্থটি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয়েছিল। এর ছ'বছর পূর্বে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মীর চিরদিনের জন্য দিল্লী ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌ চলে যান। সুতরাং ১৭৮২ থেকে ১৭৮৮ এই ছ'বছরের ঘটনার মীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। তবে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়, তাদের যোগাযোগও অব্যাহত ছিল। সুতরাং মীর ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কারণ নেই। মীরের অপর গ্রন্থ নিকাতুল শোয়া যদি জি.করে মীর-এর পরবর্তী কালের রচনা হয় তবে সেটি রচিত হয়েছিল ১৮শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে। মীরের তখন অতি-বৃদ্ধ অবস্থা।

জি.করে মীর গ্রন্থে মীর নিজের কথার অতিরিক্ত তাঁর সময়ের কথাও বলেছেন। সময়টা ছিল মুঘল শাসনের ক্রমাবনতির যুগ। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্ দিল্লীর উপর প্রবল আঘাত হানলেন। পনেরো কোটি টাকা, পঞ্চাশ কোটি টাকার মণিরত্ন পোষাক পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র এবং কোহ্-ই-নূর

(আলোক পর্বত) নামক হীরা ও ময়ূর সিংহাসন তিনি নিয়ে গেলেন। তদুপরি চামড়ার পোষাক নির্মাতার পুত্র নাদির শাহ্‌, এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত দিল্লী রাজ-পরিবারের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং রাজধানীর সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ও অনূঢ়া কন্যাদের নিজ অঙ্কশায়িনী করলেন।

এই লুণ্ঠন ও অপমানের রেশ মিলাতে না মিলাতেই আবার ভারতের আকাশে দেখা দিলেন আর এক ধূমকেতু। ন'বছরের মধ্যেই আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী ভারত আক্রমণ করলেন এবং ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উনিশ বৎসরে ন'বার তিনি ভারতের উপর আক্রমণ হানলেন।

এই সব বৈদেশিক আক্রমণ তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল আভ্যন্তরিণ অরাজকতা। অযোগ্য, ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্মণ্য সম্রাট বংশধররা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় একের পর এক সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। কিন্তু শাসন পরিচালনা করেছেন কোনো না কোনো রাজপুরুষ। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম এসেছিলেন অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ্‌ (১৭৪৮-৫৩ খ্রীঃ)। তিনি দিল্লী দরবারে প্রধান মন্ত্রী (উজীর) ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব দেশের কল্যাণে নিয়োজিত না করে' নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে নিয়োগ করলেন এবং অবশেষে প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। এবার রঙ্গমঞ্চে এলেন পরবর্তী উজীর ইন্তিজামুদ্দৌলাহ্‌ (১৭৫৩-৫৪খ্রীঃ) মাত্র এক বছরের জন্য। তাঁরপর (১৭৫৪-৬০) এলেন ইমাদুল মুল্ক্‌। ইনি সম্রাট আহ্‌মদ শাহ্‌কে অন্ধ করে' সিংহাসনচ্যুত করলেন এবং পরবর্তী সম্রাট ২য় আলমগীরকে (১৭৫৪-৫৯খ্রীঃ) হত্যা করালেন। ইমাদের পর ক্রমান্বয়ে রোহিলা সর্দার নাজিবুদ্দৌলাহ্‌ (১৭৬১-১৭৭০খ্রীঃ), মির্জা নজফ খাঁ (১৭৭২-৮২খ্রীঃ), আফ্রাসিয়াব খাঁ ও মুহম্মদ্‌ শফী (১৭৮২-৮৪খ্রীঃ), মহাদজী সিন্ধিয়া (১৭৮৪-৯৪ খ্রীঃ) এবং দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া (১৭৯৪ ১৮০৩খ্রীঃ) দিল্লীতে কর্তৃত্ব করেন। শেষোক্তকে পরাজিত করে ব্রিটিশরা ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করলে চৌষট্টি (১৭৩৯-১৮০৩খ্রীষ্টাব্দ) বৎসর ব্যাপী অস্থিরতা হ্রাস পায়। আলোচ্য সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন প্রকৃত পক্ষে বৃত্তি-ভোগী। যে রাজপুরুষ যখন প্রধান হয়েছেন তিনি সম্রাট ও তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাসিক এক লক্ষ সওয়া লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতেন। তথা-কথিত সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় এতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

ব্রিটিশরাও অবশ্য সম্রাটকে বৃত্তিভোগীই করে রাখলেন। তাঁর মাসিক বৃত্তি ধার্য হল প্রথমে নব্বুই হাজার টাকা এবং ১৮৩৩খৃষ্টাব্দে এই অর্থ বৃদ্ধি পেয়ে হল মাসিক সওয়া লক্ষ টাকা।

চৌষট্টি বৎসর ব্যাপী যে অরাজকতার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে সে অরাজকতায় অংশ নিয়েছিল দিল্লীর উত্তর-পূর্বের রোহিলারা, দক্ষিণ-পশ্চিমের জাটরা, উত্তর-পশ্চিমের শিখরা এবং দক্ষিণ ভারতের মারাঠারা। এ সময়ে দিল্লীর উপর যতো আক্রমণ ও হাঙ্গামা হয়েছে বা দিল্লী প্রশাসন যতো যুদ্ধ বিগ্রহে বা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলির সংখ্যা ছিল কমপক্ষে একাত্তর। একটি হিন্দী প্রবাদে বলা হয়েছে যে 'কমজোর আদমী কী বিবী সবকী ভওজাঈ লগতী হ্যায়' অর্থাৎ দুর্বল লোকের স্ত্রী (যুবতী) সকলেরই (রঙ্গরস করার পাত্রী) ভ্রাতৃবধূতে পরিণত হয়। দিল্লীর অবস্থা ছিল ঠিক ঐ ভওজাঈর মতো। দুর্বল দিল্লী প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে চতুর্দিকের উদ্যমশীল শক্তিরা এসময়ে তাকে ঠুকরে গেছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে মীর দিল্লীতে বসবাস করেছেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নাদির শাহ-র দিল্লী আক্রমণের পর ঐ বছরের শেষার্ধে মীর দিল্লী আসেন এবং ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের আমন্ত্রণে তিনি লক্ষ্ণৌ চলে যান। পূর্ব্বোক্ত চৌষট্টি বছরের মধ্যে মীরের দিল্লী বাসের তেতাল্লিশ বছরে পূর্বোক্তরূপ ছেচল্লিশটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বিগ্রহ বা হাঙ্গামা হয়েছে অর্থাৎ গড়ে বৎসরে একটির বেশি করে'। মীর তাঁর আত্মজীবনী জি.করে মীর-এ একালের চিত্র ধরে রেখেছেন। এদিক থেকে তাঁর আত্মজীবনীর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সার যদুনাথ সরকার তাঁর ৪ খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার'-এ ইংরেজি, হিন্দী, মারাঠী, রাজস্থানী, সংস্কৃত ও ফরাসী সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এই সব ভাষার মোট উল্লিখিত সূত্রের সংখ্যা এক শ' চোদ্দ। এত সব সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও সার যদুনাথ মীরের জি.করে মীর থেকে কোনো উপাদান সংগ্রহ করেন নি। সার যদুনাথ আলোচ্য সময়ের এক প্রধান পুরুষ জাট রাজা সুরযমল জাটের (মৃত্যু ডিসেম্বর, ১৭৬৩খ্রী:) হিন্দীতে সূদন লিখিত এবং কাশীর নাগরী প্রচারণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত 'সুজন চরিত্র' নামক জীবনীমূলক গ্রন্থ ব্যবহার

করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক কালের প্রত্যক্ষদর্শী মীর-লিখিত জি.করে মীর তাঁর দ্বারা উপেক্ষিত হ'ল।

জি.করে মীর গ্রন্থে এমন অনেক সংবাদ আছে যা সার যদুনাথের গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। এরূপ কিছু ঘটনার এখানে উল্লেখ করা হ'ল। মীরের আগ্রা বাসের সময়ে আগ্রার সুবাদার যে ছিলেন মুসরৎ ইয়ার খাঁ, সার যদুনাথের গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ নেই। সমসামুদ্দৌলাহ যে নবাব উপাধিধারী ছিলেন, সার যদুনাথ তা লেখেন নি। সম্রাট আহম্মদ শাহ্-র প্রিয়পাত্র এবং দরবারে উজীর সফদর জঙের প্রতিদ্বন্দ্বী মীরের পৃষ্ঠপোষক জাভিদ খাঁকে সফদর জঙ বিশ্বাস-ঘাতকতা করে' ১৭৫২খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে হত্যা করালে মীর যাঁর আশ্রয়ে আসেন, মীর তাঁর নাম রাজা মহানারায়ণ বলে' উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে তিনি ছিলেন উজীরের দেওয়ান। সার যদুনাথ তাঁর গ্রন্থে মহানারায়ণের উল্লেখ করেন নি, রাজা লছমীনারায়ণের উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে তিনি উজিরের এজেন্ট ছিলেন। মনে হয় মহানারায়ণ ও লছমীনারায়ণ একই ব্যক্তি। মীর তাঁর আশ্রিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর সম্পর্কে মীরের বিবরণ নির্ভুল হওয়ারই কথা। পক্ষান্তরে আচার্য যদুনাথ সরকারী নথিপত্র থেকে তাঁর নাম গ্রহণ করেছেন। এখন বিচার্য, কার কথা সত্য, রাজার প্রকৃত নাম লছমীনারায়ণ ছিল, না মহানারায়ণ ছিল।

মনে হয় রাজার প্রকৃত নাম আচার্য যদুনাথ কথিত লছমীনারায়ণই ছিল। তিনি সরকারী নথিপত্রে এই নাম পেয়েছেন। হিন্দু নামের রীতি অনুযায়ী এই নামই ঠিক, মহানারায়ণ সাধারণত কারো নাম হয় না। এছাড়া এসময়কার ইতিহাসে অন্যত্র লছমীনারায়ণ নাম পাওয়া গিয়েছে। তাহলে জিজ্ঞাসা, মীর মহানারায়ণ নাম কোথায় পেলেন। এর জবাবে বলা যায় যে সম্ভবত রাজা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সাধারণ্যে নিজ প্রকৃত নামের পরিবর্তে মহানারায়ণ বলে' কথিত হতেন, 'মহা' তাঁর পদগৌরব সূচিত করত। মীর প্রকৃত নাম না লিখে তাঁর লোককথিত নামই ব্যবহার করেছেন।

এর সমর্থন অন্যত্র পাওয়া যায়। সম্রাট আহম্মদ শাহ্‌র প্রিয়পাত্র পূর্বোক্ত জাভিদ খাঁর উপাধি নবাব বাহাদুর ছিল না, কিন্তু দরবারে তাঁর প্রতিপত্তির জন্য লোকমুখে তিনি ঐ উপাধিতে উল্লিখিত হতেন। মীর তাঁর আত্মজীবনীতে

ভিদ যাঁকে নবাব বাহাদুর বলেই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আচার্য যদুনাথ কখনো তাঁকে নবাব বাহাদুর বলে উল্লেখ করেন নি। উভয়ে যে অভিন্ন ব্যক্তি তারো উল্লেখ নেই। কেবল আচার্য যদুনাথ দ্বারা উদ্ধৃত একটি সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায় যে বেতন না পাওয়া অসন্তুষ্ট প্রাসাদরক্ষীরা তাঁকে নবাব বাহাদুর বলে উল্লেখ করচে। আচার্য যদুনাথ লিখিত 'ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার' গ্রন্থে 'তারিখ-ই-আহ্‌মদ শাহী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ঘটনার বিবরণে উভয়ের অভিন্নত্ব জানতে পারা যায়।

আচার্য যদুনাথ রাজা যুগলকিশোরের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি যে সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌-র সময়ে বাংলার দেওয়ান ছিলেন, তা তিনি লেখেন নি। মীরের গ্রন্থ থেকে এ সংবাদ জানা যায় দেওয়ান নাগরমলের উল্লেখ আচার্য যদুনাথ তাঁর গ্রন্থে বহুবার করেছেন। দেওয়ান নাগরমল যে ক্রাউনল্যাণ্ডের (সম্রাটের খাস অধীনস্থ অঞ্চল) দেওয়ান ছিলেন, তাও তিনি লিখেছেন। কিন্তু দেওয়ান নাগরমল যে রাজা, মহারাজ এবং উমদাতুল মুল্ক্‌, উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং তিনি যে উপ-প্রধানমন্ত্রী (নায়েব উজীর) ছিলেন, আচার্য যদু-নাথের গ্রন্থে তার উল্লেখ নেই। উমদাতুল মুল্ক্‌ অতি উচ্চস্তরের উপাধি। সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌-র দরবারে সর্বাধিক সম্মান ও বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন ২য় আমীর খাঁ; তাঁর এই উপাধি ছিল। মীরের গ্রন্থে রাজা যুগলকিশোর সম্বন্ধে এই সব অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া যায়। সম্রাট ২য় শাহ্‌ আলমের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং দরবারের এক প্রধান পুরুষ আব্দুল অহদ খাঁর ভ্রাতা আবুল বরকাৎ খাঁ যে কাশ্মীরের সুবাদার ছিলেন, তাও মীরের গ্রন্থ থেকেই জানা যায়। অবশ্য হ'তে পারে যে মীরের গ্রন্থের কিছু কিছু তথ্য আচার্য যদুনাথের প্রয়োজন না হওয়ায় তিনি তা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু মীরের গ্রন্থের সহায়তা পেলে সার যদুনাথের তথ্যে যে আরো সংযোজন করা যেতো তা উপরে উল্লিখিত কিছু উদাহরণ থেকে বোঝা যায়।

সার যদুনাথের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এই শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের সময় যথাক্রমে ১৯৩৮ ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর এই মহাগ্রন্থ যখন লিখিত হচ্ছিল তখন মীরের জি.করে মীর প্রকাশিত হয়নি। সার যদুনাথ

ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিরো বোধ হয় সন্ধান পান নি। জি.করে মীর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে অঞ্জুমান তরক্কী উর্দু (পাকিস্তান)-এর তরফে করাচীতে প্রকাশিত হয়। তারো কিছু পূর্বে ঐ গ্রন্থের আলোচনা করাচীর 'উর্দু' নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। কিছুকাল আগে পর্যন্তও এ গ্রন্থ সুলভ ছিল না। সুতরাং সার যদুনাথ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত নিজ গ্রন্থগুলির সংস্করণে মীরের গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন নি। মীরের উক্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ যে বহু ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ, সকলেই একথা স্বীকার করেন। শ্রীঈশ কুমার গ্রন্থটিকে 'ঐতিহাসিক তথ্যের খনি' বলে' বর্ণনা করেছেন।

মীরের পরবর্তী কবি মির্জা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯খ্রী: এবং দিল্লীর শেষ মুঘল বাদশাহ কবি ২য় বাহাদুর শাহ জাফর(১৭৭৫-১৮৬২খ্রী:) ১৮৫৭খ্রীষ্টাব্দের মহাঅভ্যুত্থানের শিকার হয়েছিলেন। গালিব ব্রিটিশ সরকার থেকে বৃত্তি পেতেন, যা ছিল তাঁর জীবনধারণের প্রধান উপায়। মহাঅভ্যুত্থানের ফলে ঐ বৃত্তি তিন বৎসর বন্ধ থাকে এবং গালিব তখন খুবই আর্থিক দুরবস্থায় পড়েন। বাহাদুর শাহ্‌র অবস্থা হয়েছিল আরও করুণ। ব্রিটিশরা বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক হওয়ার অভিযোগে তাঁর বিচার করে এবং শাস্তিস্বরূপ তিরাশি বৎসর বয়স্ক বাদশাহ্‌কে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। সেখানে চার বৎসর বাদে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। যেহেতু এঁরা উভয়েই ছিলেন কবি ও লেখক, তাই এটা স্বাভাবিক যে এঁদের রচনায় ঐ মহাঅভ্যুত্থানের ছায়াপাত হবে। গালিব অল্প কিছু চিঠিতে এবং বাহাদুর শাহ অল্প কিছু গজলে মহাঅভ্যুত্থানের কথা বলেছেন। স্বল্প হ'লেও ঐ সব রচনা থেকে মহাঅভ্যুত্থানের ভারতীয়-বর্ণিত চিত্রটি পাওয়া যায়। এদিক থেকে এর গুরুত্ব আছে, কেননা মহাঅভ্যুত্থানের বিবরণ প্রায় সবই ব্রিটিশদের দ্বারা লিখিত।

মীরের জি.করে মীর গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপরোক্ত দুই কবির ইতিহাসাশ্রিত স্বল্প রচনা হ'তে অনেক বেশি। 'জি.করে মীর' হ'ল জীবনী গ্রন্থে বিধৃত ইতিহাস কথা। সুদীর্ঘ কালের ঘটনার বিবরণ তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য কেহ কেহ এই গ্রন্থের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যেমন, কেহ কেহ বলেছেন যে মীর তাঁর পিতার

সূফী সাধক রূপে যে বিপুল খ্যাতির কথা বলেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে মীর নিজ পিতার সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মীর যদি কিছু অতিশয়োক্তি করে' থাকেন তবে তা অস্বাভাবিক নয়। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মীরের পিতা সাধারণ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। প্রথমত, সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি সিরাজুদ্দীন আলি খাঁ আজু. নিজ ভগ্নীকে তাঁর হাতে সমর্পন করেছিলেন। এটা মীরের পিতার যৌবনের কথা। যখন তিনি জীবনের পথে বেশ অগ্রসর হয়েছেন, তখন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষেরা কেহ কেহ তাঁর অনুরাগী হয়েছিলেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্-র বিরুদ্ধে কার্নালের যুদ্ধে মৃত্যু পর্যন্ত সাত বৎসর সমসামুদ্দৌলাহ্ খান-ই-দৌরান ছিলেন (ভ্রাতা মুজ.ফফর খাঁর সঙ্গে) সম্রাট মুহম্মদ শাহ্-র সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। এহেন সমসামুদ্দৌলাহ্ মীরের পিতার অনুগত ছিলেন। একবার লাহোর থেকে ফেরার পথে দিল্লীতে সমসামুদ্দৌলাহ্ মীরের পিতার দর্শনপ্রার্থী হ'লে সমসামকে মীরের পিতা বলেছিলেন, 'ওহে আমীর, আমার সঙ্গে দেখা করে কি হবে? আমীর ও ফকিরের সাক্ষাৎ অর্থহীন'। এ থেকে মীরের পিতার আত্মিক উচ্চাবস্থা এবং তাঁর প্রতি দরবারের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আস্থা ও আনুগত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং মীরের পিতা মীরকথিত 'পৃথিবী বিখ্যাত' (শোহ্রাহ্-এ-আফাক) না হ'লেও খুবই যে মান্য ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সৈয়দ অমানুল্লাহ্ বিবাহের দিনই মীরের পিতার প্রভাবে নববিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করে' তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে' চলে এসেছিলেন এবং গুরুর মৃত্যুর কিছু পূর্বে নিজ মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর সঙ্গে বসবাস করে' গেছেন। এথেকেও মীরের পিতার প্রভাবের পরিচয় মেলে।

জি.করে মীর—এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে অপর একটি সন্দেহের কারণ এই যে মীর এই গ্রন্থে সিরাজুদ্দীন আলি খাঁ আজু. সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ ও তিক্ত মন্তব্য করেছেন কিন্তু পরবর্তী নিকাতুল শোয়া গ্রন্থে সে সব কথার তিনি উল্লেখ করেন নি, বরং আজু.কে 'উস্তাদ ও পীর ও মুর্শিদ' (শিক্ষক ও গুরু) বলেছেন। জি.করে মীর-এ মীর লিখেছেন, "কিছুদিন তাঁর (আজু.র)

কাছে রইলাম এবং শহরের নানা লোকের কাছ থেকে কিছু বই নিয়ে পড়লাম। যখন আমার কিছু যোগ্যতা হ'ল তখন ভাই সাহেবের (বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) চিঠি এল। তিনি লিখলেন যে 'মীর মহম্মদ তকী সর্বদা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, তার ভরণ পোষণ এবং শিক্ষাদীক্ষার জন্য অবশ্যই কোনো চেষ্টা করবেন না।' ঐ আত্মীয় সিরাজুদ্দীন আলি খাঁ আর্জু ছিলেন বস্তুতই এক বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। নিজ ভাগিনেয়ের চিঠি পেয়ে তিনি আমার বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। যখনি সাক্ষাৎ হতো তখনি বিনা কারণে গালমন্দ শুরু করতেন এবং নানা প্রকারে আমাকে কষ্ট দেবার চেষ্টা করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ দাঁড়ালো শত্রুর মতো। তাঁর শত্রুতার যদি পূর্ণ বিবরণ দেই তবে তা এক দফতরের (ফাইলের) আকার গ্রহণ করবে।" মীর লিখেছেন যে এই শত্রুতার জন্য তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়ে' থাকতেন এবং তাঁর অবস্থা হয়েছিল উন্মাদের মতো।

পরে যখন মীর নিকাতুল শোরা গ্রন্থ লিখলেন তখন আর্জু সম্বন্ধে এই সব কথার পুনরুল্লেখ করা হ'লো না। বরং তাঁকে শিক্ষক ও গুরু ব'লে সম্মান দেওয়া হ'ল। একই ব্যক্তির সম্বন্ধে দু'টি গ্রন্থে দু'রকম বিবরণ দেওয়ায় কিছু সমালোচক মীরের রচনার বিশ্বাস যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মীরের দু'টি গ্রন্থে আর্জু সম্বন্ধে বিবরণে তারতম্য আছে এ কথা ঠিক, কিন্তু তা তাঁর বিবরণের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব সূচিত নাও করতে পারে। তার অন্য কারণ থাকা সম্ভব। ডঃ আব্দুল হক এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ডঃ হক লিখেছেন যে মীর যখন জিকরে মীর লেখেন তখন আর্জুর দুর্ব্যবহারের কথা তাঁর মনে তাজা ছিল, মনও ছিল দুঃখভারাক্রান্ত এবং তাঁর দুনিয়াও ছিল উদ্বেগসঙ্কুল। সুতরাং যা কিছু ঘটনা ঘটেছিল সব তিনি ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, তার উদ্বেগসঙ্কুল অবস্থারও অবসান হয়েছে। তাই তাঁর ক্ষোভও আপনা থেকেই হ্রাস পেয়েছে এবং নতুন গ্রন্থ নিকাতুল শোরায় ঐ সব পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি না করে' তার উপর তিনি যবনিকাপাত করেছেন।

আজু.র কাছে মীর যে কিছু সহায়তা পেয়েছিলেন তা মিথ্যা নয় এবং মীর যদি তা স্মরণ করে' আজু.র দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করে' থাকেন তবে তা তাঁর মানবিকতার পরিচায়ক।

ডঃ হকের কথা যুক্তিযুক্ত কিন্তু এর মধ্যে কিছু অসঙ্গতি র'য়ে গেছে। জি করে মীর ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের রচনা এবং আজু.র সঙ্গে মীর বসবাস করেছিলেন ঐ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষে। অর্থাৎ এই দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের তফাৎ অর্ধশতাব্দী কালের মতো। এই দীর্ঘ ব্যবধানে দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতিও মনে তাজা থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, জি.করে মীর রচনার সময় মীরের বয়স ছিল পঁয়ষট্টির অধিক। বহুকাল পূর্বের দুঃখের ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মানসিকতা এ বয়সে থাকার কথা নয়। তৃতীয়, জিক.রে মীর রচনার সময় মীর লক্ষ্ণৌবাসী, তখন তাঁর অর্থাভাবজনিত দুঃখ ও উদ্বেগ ছিলনা। ডঃ হকের কথানুসারে নিকাতুল শোরা জি.করে মীর এর দীর্ঘ কাল পরের রচনা না হওয়ারই সম্ভাবনা। কেননা জি.করে মীর রচনার সময়েই মীর যথেষ্ট বৃদ্ধ। দু'টি গ্রন্থ রচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান সর্বাধিক দশ বারো বৎসর হ'তে পারে। তা হ'লেও শেষ গ্রন্থটি রচনার সময় মীরের বয়স হয় আশির কাছাকাছি। এ বয়সের পর নিকাতুল শোরার মতো তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনার আগ্রহ ও ক্ষমতা লোকের না থাকারি কথা। যাই হ'ক, জি.করে মীর ও নিকাতুল শোরা কম বেশি একই রকম সময়ে ও পরিস্থিতিতে মীর রচনা করেছিলেন। সুতরাং ডঃ হক তাঁর যুক্তি উত্থাপনে উভয় গ্রন্থের রচনাকালের মধ্যে মীরের যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির এবং সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানের কল্পনা করেছেন তা ঠিক নয়।

জিকের মীর গ্রন্থ মীর যদি বহু পূর্বেও রচনা করতে আরম্ভ করে' থাকেন তবু ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর গ্রন্থ সমাপ্তির সময়ে তিনি আজু.' সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্য পরিবর্তন করেননি। আসলে আজু.' সম্বন্ধে মীর ঐ দুই গ্রন্থে সত্যকে ভাগ করে লিখেছেন। আজু' যে তাঁকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাঁর আশ্রয়ে মীর যে কিছু শিক্ষা দীক্ষা এবং কবিতা রচনায় প্রারম্ভিক প্রেরনা ও প্রশিক্ষণ পেয়েচিলেন, একথা সত্য। আবার আপন ভাগিনেয়ের কথায় আজু.' যে মীরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, যার ফলে মীর তাঁর আশ্রয়চ্যুত

হন, এ কথাও মিথ্যা নয়। মনে হয় অতি বৃদ্ধ বয়সে নিকাতুল শোরা রচনার সময়ে মীরের মন নরম হয়েছিল এবং আজু একদা তাঁর যে উপকার করেছিলেন তা স্মরণ করে তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ কথা পুনরায় লিপিবদ্ধ করা থেকে তিনি বিরত থাকেন।

স্থির করে মীর-এর বিশ্বাস যোগ্যতার একটা বড় প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে সার যদুনাথ সরকার মীরের গ্রন্থটি সম্বন্ধে অবহিত না থাকলেও তাঁর গ্রন্থে তিনি যেসব ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা মীরের উল্লিখিত বিবরণের বিরুদ্ধে যায় নি। সে কালের প্রধান রাজপুরুষগণ, যেমন সমসামুদ্দৌলাহ্, জাভিদ খাঁ, আব্দুল অহদ খাঁ, লছমীনারায়ণ, যুগলকিশোর, নাগরমল প্রভৃতি সম্বন্ধে মীরের বিবরণ সর্বত্র সার যদুনাথের বিবরণের সমর্থক।

নিকাতুল শোরায় মীর ও তাঁর সমসাময়িক দেড়শতাধিক ফার্সী ও উর্দূ কবির সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাথমিক গ্রন্থ। মীর দাবী করেছেন যে তাঁর এই গ্রন্থ উর্দূ কবিতার প্রথম সমালোচনা গ্রন্থ।

মীরের পরবর্তী কবি গালিব উর্দূর ন্যায় ফার্সীতেও প্রচুর লিখেছেন। তাঁর ফার্সী দিওয়ান (গজল সংগ্রহ) আছে। গালিব নিজেকে সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ ফার্সীভাষাজ্ঞ বলে' মনে করতেন। তাঁর এই ধারণা খুব অযথার্থ ছিল না। গালিব গুরুত্ব দিতেন তাঁর ফার্সী কবিতার উপর, উর্দূ কবিতা তিনি লিখতেন অবহেলার সঙ্গে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে গালিব তাঁর উর্দূ কবিতার জন্যই এক শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বৃত হয়েছেন। তাঁর ফার্সী কবিতা তাঁকে সে সম্মান দিতে পারে নি।

গালিব তাঁর ফার্সী কবিতার জন্য গর্বিত হলেও চিঠিপত্র লিখেছেন উর্দূতে। তাঁর চিঠিপত্র উর্দূ সাহিত্যে এক উচ্চ সম্মানের আসন অধিকার করে' আছে। কোন কোন সমালোচক তাঁকে হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ পত্র লেখক বলেছেন। গালিবের সমসাময়িক কালের উর্দূ পত্রলেখকগণ যখন গম্ভীর ভাব ও ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং চিরাচরিত কৃত্রিম সম্বোধনপদ্ধতি ও লিখন রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, গালিব তখন সেসব একেবারে বর্জন করে পরস্পর বাক্যালাপের ভাষায় চিঠি লিখেছেন, যাতে মনে হয় যেন তিনি চিঠি লিখছেন না, উদ্দিষ্ট

ব্যক্তিকে সামনে বসিয়ে কথা বলছেন। গালিবের চিঠির অপর গুরুত্ব এই যে এতে উর্দূ গদ্যের প্রাথমিক স্তরের নমুনা বিধৃত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হল এজন্য যে মীর জি.করে মীর-এ আত্মজীবনী এবং নিকাতুল শোরায় কবিকথা আলোচনা করলেও কেন যে আলোচনার ভাষারূপে বেছে নিলেন ফার্সীকে তা বোঝা যায় না। আব্দুস সামাদ নামে এক বিচক্ষণ শিক্ষকের কাছে গালিব আরবী ও ফার্সী শিখেছিলেন এবং ফার্সীভাষাজ্ঞরূপে তাঁর অধিকার ও গর্বও ছিল। তিনি যে দরবারী ও মান্য ভাষা ফার্সীকে গুরুত্ব দেবেন তা স্বাভাবিক। কিন্তু মীরের শিক্ষায় আরবী-ফার্সীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল না। ফার্সী ভাষাজ্ঞরূপে তাঁর কোনো দাবিও ছিল না। গালিবের যেমন ফার্সী দিওয়ান আছে, মীরের তেমন কোনো প্রকাশিত ফার্সী দিওয়ান নেই। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মীর ফার্সীতেও কিছু কবিতা লিখেছিলেন বটে[১] কিন্তু তাঁর মান তেমন উচু নয় বলেই সমালোচকদের ধারণা। সেগুলি সম্ভবত সে কারণেই প্রকাশিতও হয় নি, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলি রক্ষিত আছে। এই যখন অবস্থা তখন মীর পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় ফার্সীতে লিখলেন কেন বোঝা দায়। তিনি যে নিকাতুল শোরা ফার্সীতে লিখেছেন সেটা উর্দূ সাহিত্যের পক্ষে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কেননা মীর ঐ গ্রন্থ ফার্সীর বদলে উর্দূতে লিখলে দু'টি কারণে উর্দূর গৌরব বৃদ্ধি হত। মীরের এই গ্রন্থে একাধারে উর্দূ কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এবং উর্দূ কবিতার ইতিহাস ও সমালোচনা আছে। উর্দূ ভাষায় লেখা হলে এই গ্রন্থ ঐ ভাষার প্রথম কবিজীবনী তথা সাহিত্যের ইতিহাস এবং সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থের মর্যাদা পেত। উর্দূকে অনুরূপ গ্রন্থের জন্য আরো প্রায় একশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। উর্দূ এরূপ প্রথম গ্রন্থটি পেল যখন মুহম্মদ হুসেন আজাদ গত শতাব্দীর শেষ দিকে আবে হায়াৎ (জীবন সলিল)

১। উর্দূ কবিদের ফার্সীতে লেখার প্রথা ইকবালের কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। ইকবাল ফার্সীতে ছ'টি এবং উর্দূতে চারটি কাব্য গ্রন্থ লেখেন এবং ফার্সীকে গুরুত্ব দিয়ে ফার্সীগ্রন্থই আগে ছাপেন। পাঠকদের দাবিতে পরে উর্দূ গ্রন্থগুলি ছাপা হয়। আধুনিক উর্দূ কবিরা ফার্সীতে লেখা বর্জন করেছেন।

গ্রন্থ রচনা করলেন। মীর এবং উর্দু সাহিত্য উভয়েরই দুর্ভাগ্য যে খেয়াল-বশে মীর ফার্সী ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করে নিজেকে এবং উর্দু ভাষাকে দ্বিবিধ সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন। শুধু তাই নয়, উর্দুতে লেখা হলে ভারতীয় ভাষার নিরিখেও এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেত। বাংলায় লেখা রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যিক জীবনী ও সাহিত্যের আলোচনা গ্রন্থগুলির মধ্যে এক প্রাচীনতম গ্রন্থ। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সর্ব প্রথম ১২৬০ বঙ্গাব্দে প্রত্যেক কবির জন্য পৃথকভাবে এ কাজ শুরু করেন। ন্যায়রত্নের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। মীরের নিকাতুল শোরা এর প্রায় পচাত্তর বৎসর পূর্বের রচনা। উর্দুতে লিখিত হলে এই গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে অনুরূপ এক প্রাথমিক গ্রন্থের সম্মান পেত। মীরের সমসাময়িক কবি গুলাম হুমদানী মস.হফী ও (১৭৫০--১৮২৪খ্রী:) ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুরূপ একটি গ্রন্থ ফার্সীতে লেখেন, যাতে ৩৫০ জন উর্দু কবির কথা আছে। তাঁর ও মীরের গ্রন্থদ্বয়ের রচনা কালের মধ্যে ব্যবধান বেশি নয়। গ্রন্থ দু'টি ফার্সীতে লিখে উর্দুকে এঁরা উভয়েই এক দুর্লভ সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন।

পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির পরিপ্রেক্ষিতেও মীরের এই গ্রন্থের বিশেষ তাৎপর্য আছে। মীরের প্রখ্যাত ইংরেজ সমসাময়িক ড: সামুয়েল জনসন (১৭০৯–১৭৮৪খ্রী:) ইংরেজি ভাষায় অনুরূপ গ্রন্থ 'দি লাইভস্ অব পোয়েট্স' রচনা করেন ১৭৭৯ ৮১ খ্রীষ্টাব্দে। টমাস ওয়ারটনও (১৭২৮–৯০খ্রী:) এ সময়ে (১৭৭৪-৮১ খ্রী:) অনুরূপ গ্রন্থ 'হিস্টরি অব ইংলিশ পোয়েট্স' রচনা করেন। মীরের গ্রন্থ রচনার সঠিক তারিখ অবর্তমানে আমাদের পূর্বোক্ত অনুমান অনুসারে এঁদের গ্রন্থই ঈষৎ পূর্বতন, প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের রচনা। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ইংরেজি, ফার্সী (ভারতীয়) ও বাংলা এই তিন ভাষায় অন্যোন্যনিরপেক্ষভাবে কবি জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ প্রায় একই সময়ে রচিত হয়েছিল বাংলায় হয়েছিল সর্বপ্রথম। ইংরেজি ও ভারতীয় রচিত ফার্সীতে উক্ত গ্রন্থ দু' দু'জন রচনা করেন। বাংলায় ঐ সময়ে অনুরূপ একটিই গ্রন্থ রচিত হয়। এই ভাষায় ঐ জাতীয় দ্বিতীয় গ্রন্থ রচিত হয় কিছু পরে বাংলা ১৩১১ সালে (ইংরেজি ১৯০৪/৫খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীহরি-মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক। গ্রন্থটির নাম 'বঙ্গ ভাষার লেখক'। 'গালিবের

জীবনীর উপাদান ছড়িয়ে আছে তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিপত্রে। ইক্‌বাল তো সাম্প্রতিক কালের লোক। তাঁর জীবনী রচনায় তাই কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। সমসাময়িক আব্দুল মজিদ সালিক পাকিস্তান (অধুনা,) থেকে ইক্‌বালের একটি জীবনী প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের বেশ মান্যতা আছে।

কবিতা

মীর তকী মীর উর্দু কবিকুলের শিরোমণি, পৃথিবীতে যে সব কবির নাম চিরদিন বেঁচে থাকবে তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করলে তাতে অবশ্যই মীরের নাম রাখতে হবে। উর্দু সাহিত্যের প্রারম্ভিক প্রমুখ সমালোচক ডঃ আব্দুল হক্‌, মীরের কবিতার যে মান্য সঙ্কলনটি করাচির অঞ্জুমান তরক্কী উর্দূর (উর্দু উন্নয়ন সমিতি) তরফে সম্পাদনা করেছেন, তার ভূমিকায় তিনি এ কথা বলেছেন।

মীর মহম্মদ তকী 'মীর' ছিলেন সার্থকনামা পুরুষ। 'মীর' কথার অর্থ 'প্রধান'। কবি মীর অবশ্যই উর্দুর এক প্রমুখ কবি ছিলেন। তকী শব্দের অর্থ জাগতিক বিষয়ে উদাসীন। মীর জাগতিক বিষয়ে উদাসীন না হলেও সূফী পিতার সন্তান মীর নিজেও ছিলেন সূফী মনোভাবাপন্ন। সূফীরা এ জগৎকে অনিত্য জেনে জাগতিক ব্যাপারে, উদাসীন হয়ে' থাকেন। নামের শেষের 'মীর' শব্দটি উর্দু সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী কবির 'তখল্লুস' বা ছদ্মনাম। উর্দুতে তখল্লুস গ্রহণ এক সময় অপরিহার্য ছিল। উর্দুর সব চেয়ে জনপ্রিয় কবি মির্জা অসদুল্লাহ খাঁ গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রী:) প্রথমে অসদ (সিংহ) তখল্লুখ গ্রহণ করেছিলেন। পরে অপর এক কবির এই তখল্লুস আছে জানতে পেরে তিনি এটি বর্জন করে' 'গালিব' (প্রবল) তখল্লুস গ্রহণ করেন। আধুনিক কালেও এ রীতি চলে এসেছে। তবে একেবারে হাল আমলের কোনো কোনো কবি এই প্রাচীন রীতিটি অব্যাহত রাখতে তত আগ্রহী নয়। অনতিঅতীত কালে কবি ইক্‌বালের (১৮৭৩-১৯৩৮খ্রীঃ, ইক্‌বাল কথার অর্থ সৌভাগ্য) কোনো তখল্লুস ছিল না।

মীর, গালিব ও ইক্‌বাল উর্দু কবিতার ত্রয়ী, কিন্তু মীর এক বিষয়ে অপর দু'জন অপেক্ষা উপেক্ষিত। এই উপেক্ষা হ'ল মীর সম্পর্কে আলোচনায়। বলা হয় গালিব ও ইকবাল সম্পর্কে এক এক লাইব্রেরি গ্রন্থ লেখা হয়েছে যা সমষ্টি-গতভাবে গালিবিয়ৎ এবং ইক্‌বালিয়ৎ নামে পরিচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় মীরের সম্পর্কে লেখকেরা আপেক্ষিকভাবে নীরব। ডঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ তাঁর গ্রন্থ নক্‌দে মীর-এ (মীরের আলোচনা) মীর সম্পর্কে সমালোচনার অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করেন নি। তিনি লিখেছেন, 'মীর তকী মীরের জীবন ও কবিত্ব সম্পর্কে সমালোচক ও ঐতিহাসিকেরা অনেক কিছু লিখেছেন, আমিও এই সমুদ্রে একটি বিন্দু যোগ করতে চাইছি।' মীরের উপর লিখিত 'অনেক কিছুর' কোনো বিবরণ তিনি দেননি। তবে মনে হয় কবি ও মানুষ মীরের গুরুত্বের বিচারে তাঁর সম্পর্কে 'অনেক কিছু' লেখা হয়েছে এ মন্তব্য যথার্থ নয়। ডঃ আবদুল্লাহ্‌ সম্ভবত সাময়িক পত্রের লেখার কথাই এখানে বলেছেন, গ্রন্থের নয়। ভারতের সাহিত্য আকাদামি কর্তৃক (১৯৮২ খ্রীঃ) শ্রীঈশকুমারের ইংরেজি গ্রন্থ 'মীর তকী মীর' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে লেখক লিখেছেন যে মীরের বিষয়ে তিনি দু'টি মাত্র গ্রন্থ দেখেছেন। একটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ খাজা অহ্‌মদ ফারুকীর 'মীর তকী মীর-হায়াৎ অওর শায়রী' (মীর তকী মীরের জীবন ও কবিতা), অন্যটি লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌র দিল্লী থেকে প্রকাশিত পূর্বোক্ত 'নক্‌দে মীর'। শ্রীঈশকুমার মীর-আলোচনার অন্যতম প্রারম্ভিক ও প্রমুখ গ্রন্থ ডঃ আব্দুল হক্‌এর 'ইন্তখাবে কলামে মীর' (মীরের নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ) গ্রন্থটির উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত এ গ্রন্থটির তিনি সন্ধান পাননি। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে অঞ্জুমান তরক্কী উর্দু (পাকিস্থান) কর্তৃক করাচী থেকে ঐ গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বোধহয় বছর কুড়ি আগে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত মীরের অন্যতম প্রথম কাব্য সঙ্কলন। এ গ্রন্থ এখনো ভারতে সুলভ না হওয়ায় শ্রীঈশকুমার বোধহয় এটির সন্ধান পান নি। নতুবা কোনো মীর—আলোচনায় এ গ্রন্থটির উল্লেখ না থাকলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ মনে করলে অন্যায় হবেনা। যাই হ'ক, এ গ্রন্থটি সহ বর্তমানে মীর

আলোচনার মান্য গ্রন্থের সংখ্যা তাহলে দাঁড়াল চার। এ সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ইক্‌বালের রচনা বক্তব্য ও দর্শন প্রধান এবং কিঞ্চিৎ দুরূহ। ফার্সী জ্ঞানাভিমানী গালিবের রচনায় ফার্সী শব্দের ব্যবহার কিছু বেশি (যদিও তা কৌতুক রসে আপ্লুত ও জনমনোরঞ্জক) মীরের রচনা সহজ ও সরল। (গালিবের রচনার সঙ্গেই তুলনায় তাঁর রচনার মিল বেশি। গালিবের ও মীরের কিছু শের এমন যে অনায়াসে তারা মালিকানা পরিবর্তন করতে পারে।) এসব সত্ত্বেও মীরের প্রতি সমালোচকের অনীহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে মীরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এই আলোচনায় পূর্বে ডঃ হকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েচে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবিও মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। ডঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে এর কতকগুলি নমুনা সংগ্রহ করেছেন। নমুনার কতকগুলি সুপরিচিত, কতকগুলি তত পরিচিত নয়। উর্দু ও ফার্সী উভয় ভাষা থেকেই এগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্য থেকে কিছু এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে।

মীরের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কবি মির্জা মহম্মদ রফীহ্‌ সওদা (১৭১৩–১৭৮০খ্রীঃ) লিখেছেন

সওদা তু ইস্ জ়মীন মেঁ গ়জ়ল দর্ গ়জ়ল হী লিখ
হোতা হ্যায় তুঝ্‌কো মীর সে উস্তাদ কী তর্‌হ
সওদা, তুমি এ জমিতে গজলই গজল লিখে চলো,
মীরে ও তোমাতে যেন গুরু আর শিষ্য ভাব হ'লো।

মীরের সমসাময়িক গুলাম হমদানী মস্‌হফী (১৭৫০–১৮২৪খ্রীঃ) ফার্সীতে লিখেছেন, 'হস্ত্ উস্তাদী এ-রেখ্‌তহ্‌বর ও মুসল্লিম অস্ত্', অর্থাৎ মীর যে রেখ্‌তার (উর্দুর) ওস্তাদ অর্থাৎ গুরু এবং তিনি যে উচুস্তরের এবং মান্যতাপ্রাপ্ত কবি, মস্‌হফী একথা স্বীকার করেছেন ইমাম বখ্‌শ নাসেখ্‌ও (১৮২৮খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু) ছিলেন মীরের সমসাময়িক। তিনি একটি উর্দু দ্বিপদীতে লিখেছেন, 'আপ বে-বহরহ্ হ্যাঁয় জো মুয়াৎকিদে মীর নহীঁ' অর্থাৎ মীরে (মীরের শ্রেষ্ঠত্বে যদি আপনি বিশ্বাসী না হন তবে আপনি অভাগা।

শেখ্ ইব্রাহিম জ়ওক্ (১৭৮৯–১৮৫৪খ্রীঃ) একটি শের-এ খেদ করেছেন, 'নহ্‌হুয়া পর নহ্ হুয়া মীর কা অন্দাজ় নসীব', হায়, হায়, মীরের লেখার কায়দা আমার বরাতে হল না।

মীরের সম্বন্ধে গ.ালিবের দু'টি বিখ্যাত উক্তি আছে। প্রথমটিতে তিনি লিখেছেন

রেখ.তে কে তুম হী উস্তাদ নহী গ.ালিব
কহ্‌তে হ্যায় অগলে জ.মানে মেঁ কোয়ী মীর ভী থা
গালিব, তুমিই নও একমাত্র ওস্তাদ রেখতার,
লোকে বলে আরো আগে মীর নামে ছিল কেউ আর।

অন্য শেরটিতে মীর নাসেখে.র পূর্বোক্ত পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন :

গ.ালিব অপনা ইয়েহ্‌ অক.ীদহ্‌ হ্যায় বক.ওল নাসেখ,
আপ বে-বহরহ্‌ হ্যায় জো মুআৎকী.দে মীর নহী
বলেছেন যথা নাসেখ তেমনি আমিও সে মতাধীন,
মীরে বিশ্বাসী নহে কো যে জন সেজন ভাগ্যহীন।

হসরৎ মোহানী একটি শেরে মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন

শের মীর সে ভী পুর দর্দ্‌ লেকিন হসরৎ
মীর কা শিওয়হ্‌-এ-গুফতার কহাঁ সে লাউঁ
মীরের চেয়েও দরদে পূর্ণ শের, তবে হসরৎ,
কোথা আর পাব মীরের বলার কায়দা ও কসরৎ।

উপরে যাঁদের মীর সম্পর্কিত মত উদ্ধৃত করা হ'ল তাঁরা সকলেই খ্যাত-নামা কবি বা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। ডক্টর সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ তাঁর গ্রন্থে মীর সম্পর্কে আরো কিছু মতামত উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও আছে। যেমন, সওদা ও মীরের তুলনা করে' ফার্সীতে হকীম কু.দরতুল্লাহ্‌ ক.াসিম লিখেছেন যে সওদা হ্‌লেন অশান্ত সমুদ্র এবং মীর এক বিরাট খাল। অবশ্য তিনি এও জানিয়েছেন যে সাধারণের অভিমত হ'ল এই যে সওদা গ.জ.ল রচনায় মীরের উৎকর্ষ স্পর্শ করতে পারেন নি।

ডঃ আবদুল্লাহ্‌র তুলনাত্মক আলোচনা পছন্দ নয়। মীর ও সওদা সম্পর্কে মস্‌হফীর তুলনাত্মক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজ বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আধুনিক আলোচনায় তুলনাত্মক বিচার প্রায় অপরিহার্য। যাই হ'ক, ডঃ আবদুল্লাহ্‌ তুলনাত্মক বিচার না করে মীরের রচনার কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হ'ল সরলতা, সহানুভূতি, রচনার সাধারণ আবেদন ও সাঙ্গীতিকতা প্রভৃতি।

ডঃ আব্দুল হকের মীর সম্বন্ধে অভিমত অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনা না করেই তিনি মীরকে উর্দু কবিকুলের শিরোমণি বলেছেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলেও মীরকে তিনি মান্যতা দিয়েছেন। তুলনাত্মক আলোচনার ক্ষেত্রেও সাদীর মূল রচনার তুলনায় মীরের অনুবাদ যে উন্নততর একথা বলে ডঃ হক. মীরের স্থান অতি উচ্চে নির্দিষ্ট করেছেন। আধুনিক কবি সর্দার জাফরীও বলেছেন যে যদি গ.ালিব ও ইক.বালের শ্রেষ্ঠত্ব কেউ স্বীকার নাও করে তবু মীরের শ্রেষ্ঠত্ব কেউই অস্বীকার করবে না। মীর নীজেও নিজ রচনার উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। একটি শের-এ তিনি বলেছেন:

হুলুস্থুলু পড়তে পারে হেন প্রতি পাতায় একটি আছে শের,
কেয়ামতের আসার দিনটি তকই রইবে জীবন আমার দিওয়ানের।

ডঃ সৈয়দ মহীউদ্দিন ক.াদরী জে.ার তাঁর 'তারিখে. অদবে উর্দু' (উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখেছেন যে গজলে সম্ভবত কেহই মীরের সমকক্ষতা করতে পারে না, মসনবীতেও মাত্র দু'এক জনই তাঁর সমকক্ষ আছেন।

কিন্তু সকল সমালোচক মীর সম্পর্কে এই উচ্চমত পোষণ করেন না। প্রথমেই ইক.বালের নাম করতে হয়। ইক.বালের স্বল্পকালীন গুরু ছিলেন নবাব মির্জ.া খাঁ দাগ. (১৮৩১-১৯০৫ খ্রীঃ)। পারিবারিক কারণে গালিব এঁর বিরোধীপক্ষ ছিলেন। তা সত্ত্বেও ইক.বাল তার কবিজীবনের একেবারে প্রারম্ভে গ.ালিবকে একটি কবিতায় উচ্চ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এহেন ইক.বাল কিন্তু মীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। শ্রীঈশকুমার মীরকে গ.ালিব ও ইক.বালের পরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা খুবই উন্নত কিন্তু তাঁর নিকৃষ্ট রচনা আবার খুবই নিকৃষ্ট। তাঁর মতে মীরের ছ'টি দিওয়ানের অধিকাংশ অতি সাধারণ স্তরের কিন্তু বাকি যা থাকল তার স্থান অতি উচ্চে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঈশকুমার তাঁর মতের সমর্থনে গ.ালিবের সমসাময়িক কবি নবাব মুস্তফা খ.াঁ শায়েফতাহ্‌র (১৮০৬—১৮৬৯ খ্রীঃ) অনুরূপ ফার্সী মতামত উদ্ধৃত করেছেন। পূর্বোদ্ধৃত কবি ও সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসার অভিমত সত্ত্বেও মীরের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী লেখকের অভাব হয়নি।

কোনো লেখকের সব রচনাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হ'বে এরকম আশা করা যায় না। রচনার উৎকর্ষ এবং উৎকৃষ্ট রচনার পরিমাণের উপর লেখকের পর্যায় নির্ভর করে। ডঃ জে.য়েদের মতে মীরের শের সংখ্যা ৩০—৪০ হাজারের মধ্যে হ'বে। কারো মতে এর মধ্যে মাত্র বাহাত্তরটি শের (দ্বিপদী) খুব বিখ্যাত। কারো মতে মীরের রচনার অধিকাংশ (আশি শতাংশ) নিম্নমানের। যদি কোনো কবির রচনা এরূপ হয়, তবে সে কবিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে সমালোচক ইতস্তত করবেন। অন্তত ডঃ হকে.র মতো এক বাক্যে উর্দু 'কবিকুল-চূড়ামণি' বলতে নিশ্চয়ই দ্বিধা হবে। বক্তব্যের মহত্বের উপর যদি গুরুত্ব দিতে হয় তবে নিশ্চয় উর্দু কবি ত্রয়ীর মধ্যে ইক.বাল প্রথম স্থান পাবেন। ইক.বালের পূর্বে উর্দু কবিতায় বক্তব্যের গুরুত্ব ছিল না। প্রেম ছিল মুখ্য উপজীব্য। কত রকম ভাবে যে প্রেমের কথা বলা যায় উর্দু কবিতা তার যেন এক প্রদর্শশালা। স্বভাবতই এজন্য বলার কায়দার উপর জোর দিতে হয়েছে বেশি।

গ.ালিব বলেছেন যে তাঁর (নিজের) বলার ঢংটি পৃথক। মনে হয় এই ঢংটি হ'ল কৌতুকরসে জাড়িত ক'রে সব কিছু বলা। যেমন চিঠি পত্রে তেমনি কবিতায় গ.ালিব আনন্দ ও বেদনা উভয়ই কৌতুকরসাশ্রিত করে' উপস্থিত করেছেন। এ জন্যই গ.ালিব নিঃসন্দেহে সর্বাধিক জনপ্রিয় উর্দু কবি। মীরের ক্ষেত্রে এই কায়দা হ'ল সরলতা—বক্তব্যের এবং ব্যবহৃত শব্দের। গ.ালিবের মতো মীরের ফার্সী জ্ঞানের গর্ব ছিল না। সুতরাং শব্দ ব্যবহারে মীর অনেক স্বদেশী।

ইক.বালের কায়দার প্রয়োজন হয় নি, কেননা তাঁর ছিল বক্তব্যের ঐশ্বর্য। তবু তাঁর বলার কায়দা আদৌ ছিল না তা নয়। তাঁর এই কায়দা হ'ল স্পষ্টতা ও ওজস্বিতা, যেমন বক্তব্যের তেমনি বলার ভঙ্গীর। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যায় দু'টি বিখ্যাত লাইন

খু.দী কো কর্ বুলন্দ্ ইতনা কে হর্ তক.দীর সে পহ্‌লে
খু.দা বন্দে সে খু.দ পুছে বতা তেরী রজ.া ক্যা হ্যায়
আপনারে করো এত উন্নত, সব ভাগ্যের আগে,
খোদা খোদ তাঁর বান্দারে ক'বে, বল কি বাসনা তোর।

অথবা একটি ফার্সী শের

চুনাঁ বজী কে অগর মর্গ মাস্ত্‌ মর্গে দাওআম
খুদা জে. করদাহ্‌ খুদ শর্মসারতর গর্দদ্‌
এমন করে' বাঁচো যেন হলেও মরণ সবার অবসান,
মিটিয়ে দিয়ে তোমার জীবন খোদা যেন নিজেই লজ্জা পান।

মনে হয় যেন স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রগর্ভ বাণী শুনছি। যেন স্বামীজী বলছেন, 'কিছুতেই ভয় পেওনা। তোমরা অদ্ভুত কাজ করবে। ………… ভয়ই আমাদের দুঃখের কারণ, নির্ভীক হ'লে স্বর্গ মুহূর্তের মধ্যে আমাদের করতলগত হবে। অতএব, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্‌ নিবোধত।' *

মীর ও গালিবের সঙ্গে তুলনাত্মক বিচারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ইকবাল সম্পূর্ণ অন্য জাতের কবি। প্রচলিত উর্দূ কাব্যধারার সঙ্গে তাঁর মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলেরও অভাব নেই। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং ঐ সাহিত্য দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। প্রচলিত উর্দূ কাব্য ধারা পরিহার না করেও তিনি ইংরেজি কাব্য ধারার অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রথম কবিতাটি (হিমালয়) উর্দূর আদর্শে নয়, ইংরেজি কবিতার আদর্শে রচিত। পরবর্তী কালেও ইংরেজি কাব্যাদর্শে ইকবাল বহু কবিতা রচনা করেছেন। উর্দূ কাব্যাদর্শে ইকবাল গজল রচনা করেছেন বটে, গজলের বহিরঙ্গ তিনি বজায় রেখেছেন বটে, কিন্তু গজলের অন্তরঙ্গে তিনি পরিবর্তন সাধন করেছেন, সেই চিরাচরিত প্রেম-মিলন বিরহের কথা না বলে গজলে তিনি কখনো বলেছেন ইসলামের কথা, কখনো তাঁর খুদী

---

*ইকবালের পূর্বোদ্ধৃত শের দু'টি তাঁর বিখ্যাত খুদী দর্শনের প্রতিনিধিত্বমূলক। এই দর্শন স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের অনুরূপ। স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ প্রকাশিত হয় ১৯শ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে। ইকবালের খুদী দর্শন যে ফার্সী 'অসরারে খুদী' (খুদী রহস্য) কাব্য গ্রন্থে আছে তা প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং সময়ের দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ প্রবীণতর। তবে ইকবাল স্বামীজীর কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। ইকবালের পুত্র বিচারপতি জাভিদ ইকবাল আমাকে একথা জানিয়েছেন।

দর্শনের কথা। এই পরিবর্তনে ইক্‌বাল ইংরেজি সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মনে হয় ইক্‌বাল এখানে একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঈপ্সিত জনগণের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়া। মাধ্যম হিসাবে সঙ্গত কারণেই তিনি উর্দু সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় রূপ গ়জ়লের সহায়তা গ্রহণ করেন।

বিচারের ভিত্তি যেখানে এক নয় সেখানে তুলনাত্মক বিচার বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং উর্দু কবিতার ত্রয়ীর পারস্পরিক বিচার থেকে ইক্‌বালকে বাদ দেওয়া উচিত। সেদিক থেকে মীর ও গ়ালিবের বিচার সম্ভব এবং ন্যায়সঙ্গত।

বালক কবি গ়ালিবের কিছু আড়ষ্ট কবিতা অতিবৃদ্ধ মীরকে দেখালে মীর মন্তব্য করেছিলেন যে যোগ্য শিক্ষকের হাতে পড়লে এই বালক উত্তরকালে ভালো কবি হতে পারবে, নতুবা এমনি অর্থহীন আড়ষ্ট কবিতাই লিখে যাবে। গ়ালিব কাউকে গুরু করেন নি। মীরের ক্ষেত্রে তবু পূর্বোক্ত আজ়ু এবং মীর কথিত দুই স্বল্পকালীন গুরু অজ়ীমাবাদ নিবাসী মীর জ়ফর এবং অমরোহা নিবাসী সৈয়দ সাদৎ আলির নাম জানা যায়। কিন্তু গ়ালিবের ক্ষেত্রে কোনো গুরুর খবর পাওয়া যায় না। তবু মীরের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণ করে' গ়ালিব পরবর্তীকালে উর্দু কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে মীরেরি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। গ়ালিবের কোনো স্বীকৃত গুরু না থাকলেও মনে হয় মনে মনে মীরকেই তিনি গুরুত্বে বরণ করেছিলেন। এ কথা তিনি স্বীকার করেন নি বটে, তবে পূর্বোল্লিখিত মীরের দু'টি প্রশস্তিসূচক শের–এ যে শ্রদ্ধা তিনি জ্ঞাপন করেছেন তাতে এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। গ়ালিব যেন উর্দু কবিতার ক্ষেত্রে এক একলব্য অলক্ষ্যে থেকে (মীর ও গ়ালিবের কখনো সাক্ষাৎ হয় নি) মীর নিজ রচনার মাধ্যমে শিষ্য গ়ালিবকে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত করে' গেছেন।

উভয়ের রচনার মিলের দিকে লক্ষ্য রাখলে এ ধারণা যুক্তিযুক্ত মনে হবে। দেখা যাবে যে উভয়ের বিচরণ ক্ষেত্রগুলি প্রায় একই। যেমন, মীরের ক্ষেত্রে এগুলি হ'ল আত্মম্ভরিতা, প্রেম, দার্শনিকতা, দুঃখ ও সুরা এবং গ়ালিবের ক্ষেত্রে এগুলি কৌতুক, আত্মকথা, প্রেম, দার্শনিকতা, দুঃখ ও সুরা। প্রেম, দার্শনিকতা ও দুঃখ উভয়েই আছে। আত্মম্ভরিতা ও সুরাও উভয়ে আছে বটে, তবে মীরের আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত প্রকট, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও কখনো কখনো তা বিরক্তি

কর। গ.ালিবে আত্মম্ভরিতা নেই বললেই চলে, অল্প ক'টি শের-এ যা সামান্য আছে, তাও মীরের মতো উদ্ধত ও অশালীন নয়। আত্মম্ভরিতার বদলে গ.ালিব আত্মকথা বলেছেন। গ.ালিবে সুরার কথা বহু। এটা স্বাভাবিক, কেননা গ.ালিব ছিলেন প্রবল মদ্যাসক্ত। মীর সুফী সাধকের সন্তান এবং স্বয়ং সুফী মনোভাবাপন্ন হওয়ায় সম্ভবত মদ্যপান করতেন না। তা সত্ত্বেও উর্দু কবিতার ফার্সী ঐতিহ্য অনুসারে তিনি কবিতায় সুরার কথা না বলে পারেন নি। এই ঐতিহ্য এতই প্রবল যে ইসলামে মদ্য পান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও (কোরানে তিনটি বাক্যে এ সম্বন্ধে নিষেধ আছে, ২ | ২১৯, ৪ | ৪৩ এবং ৫ | ৯০) এবং ইক.বাল ইসলামের কবি হওয়া সত্ত্বেও কবিতায় তিনি নানা জায়গায় সুরাপানের কথা বলেছেন (নিন্দার জন্য নয়, অবশ্য কোরানেও সুরাপানের' কিছু' উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, ২ | ২১৯)। সর্বশেষে 'কৌতুকের' কথা। পূর্বে বলা হয়েছে এটিই গ.ালিবের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তৎকথিত অন্দাজে. বয়াঁ বা বলার ঢং। এর উল্লেখ করে গ.ালিব বলেছেন

> হ্যায় অওরভী দুনিয়া মেঁ সুখ.নওয়র বহুৎ অচ্ছে
> কহ্.তে হ্যায় কে গ.ালিব কা হ্যায় অন্দাজে. বয়াঁ অওর
> কথার শিল্পী উত্তম আরো আছে দুনিয়ায়, তবে
> বলার ঢংটি গালিবের কিছু পৃথক, বলিছে সবে।

কৌতুকই যে এই বলার ঢং সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। মনে হয় এটিই গ.ালিবের তুরুপের তাস। যদি গ.ালিব জনমনে নিজ স্থান মীরের সমপর্যায়ে বা তারো উপরে স্থাপন করতে পেরে থাকেন, তবে তা এই কৌতুকের সুষ্ঠু ও ও বহুল প্রয়োগের ফলে। মীরেও কৌতুক আছে। কিন্তু অল্প পরিমাণে। এই সঙ্কলনে পাঠক এরূপ কিছু অনতিউচ্চারিত শের-এর সন্ধান পাবেন। মনে হয় যেন অর্জুনের মতো গুরু মীরের কাছ থেকে কৌতুক রসের অস্ত্রটি আহরণ করে গ.ালিব সেই অস্ত্র বর্ধিত ও শাণিত করে' তা দিয়েই গুরুকে পরাজিত করেছেন। আর কারো কাছ থেকে কৌতুক রসের ধারাটি গ.ালিব পেতে পারেন না, কেননা মীরের পূর্বে (বা পরেও) উর্দু কবিতায় কৌতুক রস সুলভ নয়।

মীর যদি গ.ালিবের কাছে উর্দু কাব্য সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্থানটি হারিয়েও

থাকেন, তবু এই সাহিত্যে তাঁর এমন কিছু অবদান আছে যা তাঁকে উর্দু সাহিত্যে এক অনন্ত স্থান দিতে পারে। প্রথমেই মীরের সরলতার কথা বলা যায়। এর উল্লেখ সকলেই করেছেন রবীন্দ্রনাথ সহজ করে' লেখার দাবির উত্তরে 'খাপছাড়া' গ্রন্থে বলেছিলেন

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

মীর কিন্তু কেবল সহজ কথা নয়, গভীর কথাও সহজ করে' লিখতে পেরেছিলেন। সেকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নগণ্য ছিল। সুতরাং কবিতা পড়ার বিষয় যতটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল শোনার। উর্দুর শের, গ.জ.ল প্রভৃতি তাই 'কহা' হ'ত, 'লেখা' নয়, অর্থাৎ প্রাথমিক ভাবে তা জনসমক্ষে পড়া হ'ত। এই 'জন' ছিল সাধারণত সমাজের উচুস্তরের লোক, জনসাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার বিশেষ ছিল না। গালিবের কবিতাপাঠের চিত্র আছে। তা'তে সাধারণের দেখা মেলে না। যে সব চিঠিতে তিনি তাঁর শের-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন বা উল্লেখ করেছেন, সে সব চিঠির সঙ্গেও সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরাই সম্বন্ধিত। এদিক থেকে মীর ভাগ্যবান। তিনি ছিলেন 'জন'প্রিয় কবি। জনগণ তাঁর জীবিতাবস্থায়ই তাঁর কবিতার সঙ্গে সম্বন্ধিত ছিল। দিল্লীতেই তাঁর খ্যাতি হয়েছিল, যে জন্য এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে আহ্বান। লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পূর্বে তাঁর খ্যাতি দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ আসতেই শহরে যেন কবিতার হাওয়া লেগে যায়। কবিতা পাঠের ধুম পড়ে যায় শহরে। লক্ষ্ণৌতে লোক কি রকম ভাবে তাঁর কবিতা শুনতে আসত তার বর্ণনায় মীর লিখেছেন যে আমীর থেকে গরিব পর্যন্ত সকলেরই সমাবেশ হ'ত তাঁর কবিতা পাঠের আসরে। দূর দূর থেকে লোক আসত ঐ সব আসরে মীরের নিজ মুখ থেকে তাঁর কবিতা শোনার আগ্রহে এবং আসর শেষে শ্রুত শেরগুলি উপহার হিসেবে নিজ নিজ শহরে গ্রামে নিয়ে যেত। একটি শের-এ মীর বলেছেন

অলভ্যের মতো নই, কি আছে আমার ?
শহরে শহরে তবু আমার প্রচার।

এ সৌভাগ্য সে যুগে সম্ভবত অন্য কোনো কবির হয় নি। মীর নিজের জনসম্পর্ক সম্বন্ধে অন্য একটি শের-এ বলেছেন

খাস লোক শের মোর ভালোবাসে মনে,
বাৎচিৎ কিন্তু মোর সাধারণ সনে।

বস্তুত মীর হলেন উর্দুর প্রথম জনগণের কবি। মুখ্যত ভাষার সরলতা এবং তৎসঙ্গে ভাবের কিছু সরলতা ও মনোগ্রাহিতা তাঁকে এই সম্মানের অধিকারী করেছে।

আরো একটি বিষয়ে প্রথম হওয়ার গৌরব মীরের প্রাপ্য। সে বিষয়টি হ'ল এই যে মীরই ভারতে, অন্তত উত্তর ভারতে, প্রধান কবিদের মধ্যে প্রথম আধুনিক কবি।

সাহিত্যে আধুনিকতার আরম্ভ মানুষের কথা দিয়ে। সকল সাহিত্যেরই শুরু ঈশ্বর বা ধর্মের মহিমা কীর্তনে। উর্দু গদ্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। উর্দু ভাষার উদ্ভব উত্তর ভারতে হলেও উর্দু সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। এই সাহিত্যের প্রারম্ভিক কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন খ.াজা বন্দহ.নওয়াজ. গেসোদরাজ. (১৩২১-১৪২২খ্রীঃ, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল হজ.রৎ সৈয়দ মুহম্মদ হুসেনী এবং তখ.ল্লুস ছিল শহ.বাজ.। বহমনী রাজ্যের গুলবরগার কবি তিনি। দক্ষিণ ভারতে উর্দু সাহিত্যের উদ্ভবের এক বৈশিষ্ট্য এই যে অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় কবিতার বদলে এই সাহিত্যের শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে। গেসোদরাজে.র হাত দিয়েই এর সূচনা হয়। তিনি ক'টি ধর্মীয় গদ্য গ্রন্থের অনুবাদ দিয়ে এই সূচনা করেন। 'দকন মেঁ উর্দু' (দক্ষিণ ভারতে উর্দু) গ্রন্থের লেখক নসীরুদ্দীন হাশমী অনুমান করেছেন যে যেহেতু অনুবাদ দিয়ে এই সাহিত্যকর্ম শুরু হয় এবং যেহেতু গদ্যে অনুবাদ পদ্যানুবাদের চেয়ে সহজ, তাই উর্দুর এই সাহিত্যকর্ম পদ্যের বদলে গদ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। একে তিনি অন্যান্য সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য বলেছেন।

গদ্য দিয়ে সাহিত্যের সূত্রপাত করে' উর্দু যেমন একটি অনন্যতার সৃষ্টি করেছে তেমনি পদ্যেও উর্দু সৃষ্টি করেছে অপর একটি অনন্যতার। সে অনন্যতা এই যে পদ্যে ঈশ্বর বা ধর্ম কথা দিয়ে শুরু না করে উর্দু সম্পূর্ণ জাগতিক বিষয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। বিষয়টি

হল ব্যাধি, চিকিৎসা প্রভৃতি সংক্রান্ত। এক্ষেত্রেও গেসোদরাজ.ই হলেন কবি। তাঁর ঐ কবিতার দু' একটি নমুনা এরূপ

(১) পানী মেঁ নমক ডাল মজ.া দেখতা দিসে
যব ঘুল গয়া নমক তো নমক বোলনা কিসে

জলে নুন ফেলে মজা দেখো, যখন নুন গলে' যাবে তখন কা'কে আর নুন বলবে ?

(২) আখঁ কো হলীলহ দাঁত কো দেঁা
হকীম কে ঘর যাওয়ে কওন

যদি চোখের হলীলা(?) দাঁতে দাও, তবে আর হকীমের বাড়িতে কা'কে যেতে হবে ?

ইসলামে দেবদেবী নেই বলে' তাঁদের নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রশ্ন নেই। কিন্তু গদ্যের মতে পদ্যেও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে উর্দু যাত্রা শুরু করতে পারত। কিন্তু তা না করে ব্যাধি, চিকিৎসা প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপার নিয়ে যাত্রা শুরু করে' উর্দু কবিতা মানুষের জগৎ ও মানুষের কথা বলার কাজ এগিয়ে রেখেছিল। এই ভাবে উর্দু কবিতার বিসমিল্লাহ. (শুভারম্ভ) হ'য়েছিল। দেবদেবী না থাকায় মানুষের কথাই হ'ল তার কথা। আধুনিকতার যা প্রধান শর্ত সেই মানুষের ও তার জগতের কথা দিয়ে শুভারম্ভ হওয়ায় অন্য সাহিত্যের চেয়ে উর্দু এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই ধারা চার শত বৎসর পরে মীরে এসে উজ্জ্বল উজ্জীবন লাভ করল। তাঁর ঘরের হাল. শিকারের কথা, পশু পাখীর কথা প্রভৃতি রচনা এর সাক্ষ্য দেয়।

পশুপাখী পালনের খুব শখ ছিল মীরের। কুকুর. বিড়াল ও ছাগল নিয়ে মীর মসনোয়ী (বিষয় নির্ভর কবিতা) লিখেছেন। মুর্গীর উপর লিখেছেন একটি মর্সিয়া (বিষাদ কাব্য)। নবাব আসফুদ্দৌলাহ্-র শিকারের উপর মীর তিনটি মসনোয়ী লিখেছেন। নিজের বিবিধ কষ্টের কথাও লিখেছেন। 'ঝুট' (মিথ্যা)-র উপর তাঁর একটি মসনোয়ী আছে এসবই আধুনিকতার লক্ষণান্বিত।

দাসাভাব ইসলামের ভাব। এ সম্পর্কে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। উর্দুর লেখকরা (অনাধুনিক কাল পর্যন্ত) সকলেই ছিলেন মুসলমান। সুতরাং ধর্মের প্রভাবে 'দাস' মানুষের মহিমা কীর্তনের সুযোগ হয়তো উর্দুতে কম ছিল। বস্তুত মীরের পূর্বে বা মীরের কালে মানুষের মহিমার কথা কোনো

কোনো উর্দু কবি বলে' থাকলেও মীরই প্রথম স্পষ্ট ভাষায় মানুষকে দিলেন উচ্চ মর্যাদা। আধুনিকতার এটি একটি শর্ত। যে সব শের-এ এই মর্যাদার কথা ব্যক্ত হয়েছে এই সঙ্কলনে তার কয়েকটির অনুবাদ আছে।

জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে কবিতা বাংলায় প্রথম লিখলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত(১৮১২—৫৯খ্রীঃ)। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, 'তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি, বাংলায় তিনিই প্রথম সামাজিক কবি'। মীরের মতোই গুপ্ত কবি তপসে মাছ, আনারস, বোকা পাঁঠা, পৌষপার্বণ প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। মানুষের কথাও তিনি বলেছেন তাঁর নারী চরিত্র বর্ণনায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িত নারী ও শিশুর ব্যথায়, দুর্গোৎসবে পুরুষ সমাজের মত্ততা ও নীচতায়। মানুষের কথা তাঁর পরবর্তী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন রাজপুত বীরগাথা মূলক আখ্যান কাব্যে এবং মধুসূদন বললেন মহাকাব্যে রাম-রাবণের কথার আবরণে এবং প্রহসনে ও সনেটে। এঁরা সকলেই মীরের কিছু কমবেশি এক শতাব্দী পরের কবি। ইয়োরোপের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা সর্বপ্রথম নানা বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা লাভ করেছিল। আধুনিকতার দাবি ও তারই প্রথম। কিন্তু আমরা দেখছি যে এ বিষয়ে বাংলার চেয়ে উর্দুর দাবি বেশি। বাংলার কবিরা তখনো কেউই স্পষ্ট করে' মানুষের মর্যাদার কথা বলেন নি। কিন্তু মীর স্পষ্ট ও সোজাসুজি মানুষের মর্যাদার কথা উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন

সুউচ্চে মানুষ নিজে তুলিয়াছে স্বল্প অবকাশে,
ধূলিমুষ্টি সে তো বটে, শির তবু তুলেছে আকাশে।

আজ মানুষ সত্যি সত্যি শির আকাশে তুলেছে। এমন কি আকাশ ভেদ করে' আরো উর্ধ্বে যেন খোদার আরশের (ইসলাম অনুসারে সপ্ত আকাশের উর্ধ্বে অবস্থিত খোদার আসন, যেখানে তিনি অবস্থান করেন) দিকে সে ধাবিত হয়েছে। মানুষের এই মহিমা মীর দেখতে পান নি; দেখতে পেলে কীভাবে ও ভাষাতেই না জানি তিনি মানুষের বন্দনা গাইতেন। বাংলার কবি চণ্ডীদাস প্রক্ষিপ্তভাবে তাঁর পদে মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। কিছু বাংলা মঙ্গল-কাব্যেও মানুষের কথা, এমন কি মানুষের মর্যাদার কথাও আছে। কিন্তু ভাব ও বিষয় বিচারে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত হলেও কালের বিচারে এরা মধ্যযুগীয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপারেও উর্দুকে সাধুবাদ দিতে হয়। বাংলা

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রথম মধুসূদন জন্মেছিলেন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। মীরের জন্ম এর ঠিক এক শ' বছর আগে। মীর আধুনিক শ্রেষ্ঠ উর্দু কবিদের মধ্যে প্রথম। তাহলে উর্দু তার শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির যখন জন্ম দিয়েছিল, বাংলা দিয়েছিল তার এক শ' বছর পরে। উর্দুর এ গৌরব কম নয়। এ প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই আরো একটু প্রসারিত করে' একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে কেবল বাংলা নয়, সম্ভবত আধুনিক ভারতীয় সকল ভাষাগুলির মধ্যে উর্দুই সর্ব প্রথম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির জন্ম দেয়।

উর্দু আরো একটি কৃতিত্বের অধিকারী। সে যে কেবল প্রথম শ্রেষ্ঠ আধুনিক ভারতীয় কবির জন্ম দেয় তাই নয়, সে ঐ সময়েই একই সঙ্গে অন্তত তিনজন প্রায় সমান শ্রেষ্ঠত্বের কবিরও জন্ম দিয়েছিল। মীর ছাড়া এই অপর দুই কবি হলেন মির্জা মুহম্মদ রফীহ্ সওদা (১৭১৩-৮০খ্রীঃ) বং মীর এহাসান (১৭৩৬ ?-৮৬খ্রীঃ)। বাংলায় প্রথম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি মধুসূদনের পর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের জন্য ৩৭ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মীর, সওদা ও হাসান ব্যতীত মীর দর্দ্ (১৭১৯—৫৮খ্রীঃ) এবং মুহম্মদ মীর সোজ় (১৭২০-৯৮খ্রীঃ)-এর ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর কবির সমাবেশে ঐ সময়ে কবিতায় উর্দুর যে স্বর্ণযুগের *আবির্ভাব, তাও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে

---

*এরপর উর্দুর (অবশ্য কেবল কবিতায়) দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ আসে জ়ওক়, গালিব-মোমিন—জ়ফর-অনীস-দবীর-নসীম-আতিশ-নাসেখ়-খলীক়-জ়মীর-শওক়-দের কালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। সত্তর-পঁচাত্তর বছরের ব্যবধানে দু'বার এভাবে উর্দুর দু'টি শ্রেষ্ঠ কাল এসেছিল। এ ব্যাপারে বাংলার গৌরব আরো বেশি এবং তা দু'টি কারণে। প্রথমতঃ বাংলায় এ রকম দু'টি শ্রেষ্ঠ কাল এসেছিল আরো কম সময়ে, মাত্র পঞ্চাশ বছরের মতো ব্যবধানে। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুর কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের কালের ব্যবধান এ রকমই হবে। ১৮৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৬৫-৮২খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশিত করেন তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি। আবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি বেরোয় ১৮৬০-৭২খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৮৫৯—৮২খ্রীষ্টাব্দের এই

প্রথম বলে মনে হয়। বাংলায় এঘটনা ঘটেনি। মধুসূদনের কালে তিনি ছিলেন একাকী। রবীন্দ্রনাথকে আলোচনার বাইরে রাখছি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন তাঁদের কালে মাত্র দু'জন ছিলেন। তবে আধুনিককালে বাংলা এ ব্যাপারে উর্দু'র মতো এক সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর দক্ষতার বেশ কিছু কবির সমাবেশ ঘটিয়েছে। এই কবিরা হলেন নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অজিত দত্ত, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে প্রভৃতি। হিন্দীর ব্যাপারও বাংলার মতো। আধুনিক কালে হিন্দী একই সঙ্গে মৈথিলীশরণ গুপ্ত, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রামনরেশ ত্রিপাঠি, নিরালা, বালকৃষ্ণ শর্মা নবীন, সুভদ্রা কুমারী চৌহান, মহাদেবী বর্মা প্রভৃতি কবিকে একত্র করেছে। উর্দু ও আধুনিক কালে জোশ মলীহাবাদী, ফিরাক. গোরখপুরী ও ফয়েজ. অহমদ ফয়েজে.র একত্র সমাবেশ করে কবিতায় মহৎ উজ্জীবন ঘটিয়েছে। সাহিত্যের উর্বরতা আধুনিক যুগলক্ষণ, তবে মনে রাখতে হবে যে

২২। ২৩ বছরের কালটা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ধুন্ধুমার কাল। এরপর রবীন্দ্রযুগ। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ ৬০ বছর ধরে সাহিত্যের ফসল ফলিয়েছেন ১৮৮১-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ কালে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির কাল ১৮১৩-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি প্রকাশিত হয় ১৯০৮-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কালের ব্যবধানের স্বল্পতা ব্যতীত বাংলার গৌরবের অপর কারণ এই যে উর্দু যেখানে উৎকর্ষ প্রকাশ করেছে কেবল মাত্র কবিতায়, সেখানে বাংলার উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে কবিতা-উপন্যাস-নাটকের ত্রিধারায়। হিন্দীর ক্ষেত্রেও স্বর্ণ যুগের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল, হয়তো একথা বলা যায় না। ববং বলা যায় ঐ যুগটি প্রলম্বিত হয়েছে। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র হিন্দীতে গদ্য, নাটক প্রভৃতির নতুন স্রোত প্রবাহিত করলেন, কিন্তু তাঁর কালকে হিন্দীর স্বর্ণ যুগ বলা সমীচীন নয়। ঐ যুগ এলো তাঁর অব্যবহিত পরে যখন উপন্যাসে ও ছোটগল্পে প্রেমচন্দ্, নাটকে জয়শঙ্কর প্রসাদ এবং কবিতায় মৈথিলীশরণ গুপ্ত, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রামনরেশ ত্রিপাঠি প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যকে সুশোভিত করলেন। এঁদের কালের মতো বিবিধ অঙ্গে শোভিত সুচারু উজ্জীবন হিন্দীর পরবর্তী কোনো এক কালে আর হয়নি। তবে উপন্যাস, গল্প, একাঙ্ক নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতির খাতে হিন্দীর প্রবাহ এগিয়ে চলেছে।

বাংলা ও হিন্দী (এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাও) শক্তিশালী বেশ কিছু কবির প্রথম একত্র সমাবেশে উর্দুর চেয়ে দেড় শ' পৌনে দু' শ' বছর পিছিয়ে আছে।

প্রকৃতি সচেতন লেখকরূপেও উর্দু সাহিত্যে মীরের একটি বিশেষ স্থান আছে। উর্দু সাহিত্য প্রকৃতির প্রতি বিশেষ অনুকূল নয়। গালিবে প্রকৃতি সুলভ নয়। তাঁর প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় দেখি একটি চিঠিতে যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে যমুনার সেতুতে বা বার্ষিক ফুলমেলায় বন্ধুদের সঙ্গে তিনি ভ্রমণে যেতেন। আলতাফ হুসেন হালী (১৮৩৭-১৯১৪খ্রীঃ) কিছু প্রাকৃতিক কবিতা লিখেছেন। ইক্‌বাল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গে দরা-য় (ভোরের হাওয়া) বারো তেরটি প্রকৃতি ভিত্তিক কবিতা লিখেছেন। বাঙ্গে দরা নামটিই প্রকৃতি গন্ধী। তাঁর প্রথম কবিতা 'হিমালয়'ও প্রকৃতির অঙ্গ। এগুলি সবই তাঁর বিলেত থেকে প্যান-ইসলামিজমের আদর্শ নিয়ে ফেরার আগের রচনা। পরে ইক্‌বাল আর প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকাননি। প্যান-ইসলামিজম ও খুদী দর্শন প্রকৃতিকে গ্রাস করেছে। আসলে মীরের আগে বা পরে সমগ্র উর্দু সাহিত্যেই প্রকৃতি বেশ অবহেলিত।

উর্দু ছিল আসলে দরবারী সাহিত্য। দরবারের ছত্রছায়ায় এই সাহিত্য বেড়ে উঠেছে। এজন্য এ সাহিত্যে লোক সাহিত্যেরও দর্শন দুর্লভ। দরবার যে সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের স্থল তাতে প্রকৃতির অনুপ্রবেশ সহজ নয়। যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশে এই দরবারি সাহিত্যের পরিপোষণ হ'ত তার নৈতিক মান ছিল অত্যন্ত অবনত। মীরের পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্ণৌর দরবারে ছিল বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, নীতিহীনতা, এমনকি অশ্লীলতা। বাইরের সাংস্কৃতিক চাকচিক্যের আবরণে দরবারের এই ছিল প্রকৃত রূপ। ইন্‌শা, জুরাৎ প্রভৃতি কবিগণ এই পরিস্থিতির অনুকূল তরল ও অশ্লীল কবিতা রচনা করে' দরবারে তাপ সঞ্চার করতেন। স্বয়ং নবাবগণ ছিলেন এসকলের পৃষ্ঠপোষক। নবাব আসফুদ্দৌলাহ্ প্রতি সন্ধ্যায় আফিং খেয়ে বুঁদ হ'য়ে থাকতেন। তাঁর ইয়ার বন্ধুরা ছিল ইতর শ্রেণীর। আমোদ প্রমোদের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। অবশ্য দানধ্যানেও তাঁর বহু অর্থ ব্যয় হ'ত। এর মধ্যে অপাত্রে দানও ছিল বহু। ফলে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে একটি ছড়ার প্রচলন হয়েছিল

জিসকো ন দে মৌলা,
উসকো দে আসফুদ্দৌলাহ্

যে নাহি পায় খোদার দ্বারে,

আসফুদ্দৌলাহ্ দেয় তাহারে।

আচার্য যদুনাথের মতে তিনি ছিলেন চারিত্রিক দৃঢ়তাহীন ভোগী পুরুষ। রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই তাঁর ছিল না। এই দরবারী ভোগ ও লালসার বাইরে গিয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মানসিকতা কারো ছিল না।

মীরের মানসিকতা এই দরবারী মানসিকতায় বিরোধী ছিল। ঐ পরিবেশে তিনি স্বস্তি বোধ করতেন না। দরবারও পারত না তাঁকে শান্তি দিতে। নবাবের শিকারের সঙ্গী হয়ে মীর দরবারী আবহাওয়া থেকে অব্যাহতি পেতেন। নাগর সংস্কৃতির নিন্দায় মীর একটি শের-এ লিখেছেন

শহরের ভালো মীর দেখিলাম ঢের,

চলন কোথাও নাই দিল্ জিনিসের।

তাঁর প্রাণ চাইত প্রকৃতিতে পরিত্রাণ। তাবলে একথা বললে ভুল হবে যে মীর প্রকৃতি প্রেমে বহু শের রচনা করেছেন। প্রকৃতি প্রেমে তাঁর রচনার ব্যাপ্তি বেশি নয়। কিন্তু প্রকৃতি বিরহিত উর্দু কবিতার প্রারম্ভে মীর প্রকৃতির কথা যেটুকু লিখেছেন তাই তাঁকে অনন্যতা দিয়েছে। এরকম শের এই সঙ্কলনে আছে। শুধু দরবার নয়, মসজিদ বা খানকাও ত্যাগ করে একটি দিন প্রকৃতির সঙ্গে মীর কাটাতে বলেছেন

মসজিদে থাকো কিম্বা থাকো খানকায়,

একটি উষা তো সন্ধ্যা করো বাগিচায়।

প্রকৃতি সচেতনতার পর ইতিহাস সচেতনতার কথাও বলতে হয়। যে অশান্ত পরিবেশে মীর জীবন-যাপন করেছেন তা সাহিত্য রচনার পক্ষে উপযুক্ত নয়। আমরা জানি যে শান্তির পরিবেশেই সাহিত্যের কুসুম প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপারই আমরা লক্ষ্য করি। মীরের যে যুগ, তা উর্দু সাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ। মীর, সওদা, হাসান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা এই যুগে সাহিত্যের ফসল ফলিয়েছেন। এঁরা ছিলেন দিল্লীবাসী। দিল্লীতে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে অশান্তি, উদ্বেগ ও অরাজকতা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে, তার মধ্যে এঁরা

সাহিত্য রচনা করে গেছেন। কি করে এই পরিবেশে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হ'ল তা সাহিত্য সমালোচকদের বিস্ময়ের বিষয়। দিল্লী ছেড়ে এঁরা যখন লক্ষ্ণৌ চলে যান তখন সওদা ও হাসানের তো বটেই, সম্ভবত মীরেরো শ্রেষ্ঠ রচনার অধিকাংশই রূপ পরিগ্রহ করেছে। অশান্ত পরিবেশের ফল প্রত্যেককেই ভুগতে হয়েছিল, যার অন্যতম পরিণতি স্বরূপ এঁরা দিল্লী ত্যাগ করেছিলেন।

এই অবস্থায় এটা স্বাভাবিক যে এঁদের রচনায় এই অশান্ত ইতিহাস ছায়াপাত করবে। এরূপ আশা করার আরো একটি কারণ আছে তা এই যে ইসলামের প্রাদুর্ভাব থেকেই মুসলমান অত্যন্ত ইতিহাস সচেতন। কোরানের বাণীগুলি আল্লার দূত মারফং আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হ'ত, স্মৃতির উপর ভরসা করে' ফেলে রাখা হ'ত না। হজরৎ মহম্মদের জীবনের যত খুঁটিনাটি ঘটনা তাও লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা তো যুগে যুগে বিখ্যাত। ভারত ইতিহাস রচনায় এঁদের অবদান অমূল্য। মুসলমান দরবারে ইতিহাস লেখক থাকতেন। গালিবকে বাহাদুর শা' জফর এমনি ভাবেই তাঁর বংশের ইতিহাস লেখায় নিযুক্ত করেছিলেন।

তুলনামূলক ভাবে বলা যায় যে হিন্দুরা ছিল ইতিহাস সচেতনতা বর্জিত। হিন্দুর বেদ লিখিত হয় নি। তার মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয়নি। তার রাজসভায় ইতিহাস লেখক থাকতেন না। মনীষী অল্ বেরুণী বলেছেন যে ভারতীয় হিন্দুরা ইতিহাস পরম্পরার প্রতি নজর দেয় না হয়তো ভারতীয় মায়াবাদ এজন্য বহুলাংশে দায়ী। বহুকাল পরে ১২শ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুর প্রথম ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী রচিত হয়। মুসলমান প্রভাব এর পিছনে কাজ করে থাকতে পারে। কাশ্মীরের রাজবংশাবলীর সপ্তম থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস এই গ্রন্থে সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে। সমালোচকগণ বলেছেন যে রচয়িতা কলহনের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক সুলভ মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

যাই হ'ক, ইতিহাসের এক দীর্ঘ বিক্ষুব্ধ কালে জীবন অতিবাহিত করলেও মীরে ইতিহাস চেতনার তেমন প্রকাশ নেই। তাঁর কবিতায় ইতিহাস অল্পই অনু-প্রবেশ লাভ করেছে। একটি শের-এ মীর তাঁর স্বদেশের ভয়াল অবস্থার কথা বলেছেন, 'ভয়াল বনানীসম স্থিতি মোর জনমভূমির'। এই সংকলনে আরো কিছু শের-এ তিনি অরাজক দিল্লীর কথা বলেছেন, এই মাত্র। সেদিক থেকে বাহাদুর

শা' জ.ফরই বোধ হয় উর্দু কবিদের মধ্যে অধিক ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বেশ কিছু কবিতা লুণ্ঠিত অপমানিত দিল্লীর উপর লেখা। গ.ালিবের কবিতায় ইতিহাসের ছায়াপাত নেই। কেবল ক'টি চিঠিতে ১৮৫৭'র অভ্যুত্থান চিহ্ন রেখে গেছে। আর আছে তাঁর 'দাস্তানবু' নামক ফার্সীতে লেখা গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে। তবে এই গ্রন্থের বিশ্বাসযোগ্যতা তেমন নেই, কেননা বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন গ.ালিব এই গ্রন্থ লেখার সময় ইংরেজদের যাতে অপ্রীতিভাজন না হন সে দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন।

ইতিহাস সচেতনতায় উর্দু কবিতা দরিদ্র, কিন্তু ইতিহাসাশ্রিত একটি কবিতা উর্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এটির রচয়িতা সওদা। মীরের একটি কবিতা (এই সংকলনের ১২৮ নং) এবং সওদার এই কবিতাটির পটভূমি এক, কিন্তু উৎকর্ষে সওদার কবিতাটি যে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবিতাটির অনুবাদ নিচে দেওয়া হ'ল।

বলি সেদিন মির্জ.া রফীহ্ সওদাটাকে,
হেলাফেলায় কাটাও কেন জীবনটাকে ?
যাও খুঁজে নাও চাকরি, কেনো একটি ঘোড়া,
দোহাই তোমার, করো কিছু কর্ম থোড়া।'
কথা শুনে বললে হেসে, "ও, তাই বুঝি,
বিকছে হাটে চাকরি ? বলো, আজই খুঁজি।
জবর জবর ওমরাহদের কাহিল দশা,
গেছে জমিন, বিদ্রোহীরা তখতে বসা।
আসমুদ্র হিন্দুস্থানের যিনি মালিক,
ফতুর তিনি, এক কড়িরও নাই কিছু ঠিক।
আমীর রাজা সেনানীরা বেণের দ্বারে
রাখছে বাঁধা আপন আপন তরবারে।
ভিক্ষা মেগে ফিরছে ঘুরি' নিঃস্ব পারা
তোমার মতো আমার মতো দুঃস্থ যারা।

ইস্তাম্বুলে ইস্ফাহানে যাক না সবে,
হেথায় থেকে মহামারীর শিকার হবে ?
আসছে সিপাই, দিচ্ছে তালা সকল দ্বারে,
বেশি লোকই বিদায়, নয়তো কারাগারে।
নাইকো বাতি; হাজার ঘরে আঁধার ছাওয়া,
ডাকছে পেঁচা হিন্দোল হ'ত যেথায় গাওয়া।
ধূলায় মলিন শ্বেতপাথরে নৃত্যশালা,
ঝোপের বাহার, দুলত যেথায় গোলাপ মালা।
মালঞ্চেতে কাঁটা গাছের ফলাও আবাদ,
তোমার ভাগ্যে এই ছিল, হে জাহানাবাদ!
প্রাণ সাগরের সবার সেরা হে তীর ভূমি,
প্রেমিক জনার হিয়ার মতো পিষ্ট তুমি।
বোরখা ঢাকা উচ্চকুলের মান্য নারী
শিশুক্রোড়ে দ্বার হতে দ্বার ভ্রমণচারী।
হাঁকছে, 'নেবে পুণ্য মাটির জপের মালা' ?
এসব দেখা নিজের চোখে। কাঁদার পালা
বহাই যদি, দিল্লী মাঝে সকল বাড়ি
দেবে ধুয়ে আমার চোখের বন্যা বাড়ি।
আর কেঁদো না, হে দুখী মন, সময় বাঁকা,
এখন ভালো মোদের সবার নীরব থাকা।"

মীরের আর একটি কৃতিত্বের উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করব সে কৃতিত্ব হ'ল এই যে মীর ছিলেন তাঁর সময়ের এক শক্তিশালী সমাজ সচেতন লেখক। সমাজের সমালোচনার জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়। গালিব একটি শের-এ সমালোচনার ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার উল্লেখ করেছেন। গালিব লিখেছেন

শোনিতাপ্লুত মাতালের কথা লিখিতাম হামেশাই,
পরিণামে তার হস্ত আমার খণ্ডিত হল তাই।

গালিব অবশ্য তেমন সামাজিক সমালোচক ছিলেন না। মীরের তুলনায় তো নয়ই। গালিবকে মোটামুটি বলা যায় বাস্তববাদী এবং কম্প্রোমাইজে বিশ্বাসী।

মীরের মেজাজ ছিল আপোষ বিরোধী। যাঁদের কাছে তিনি উপকৃত তাঁদের সঙ্গেও তিনি আপোষ করতেন না। এ প্রসঙ্গে অযোধ্যার যে নবাবরা তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মীরের আচরণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

অযোধ্যার যে দুই নবাবের দয়ায় মীর জীবনের দুঃখ ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন অযোধ্যার চতুর্থ নবাব আসফুদ্দৌলাহ (১৭৭৫-৯৭খ্রীঃ), যিনি মীরকে দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে এসেছিলেন, এবং নবাব সাদৎ আলি (১৭৯৭-১৮১৪খ্রীঃ), যিনি আসফুদ্দৌলাহ্-র পর অযোধ্যার নবাব হয়েছিলেন। অপরের সঙ্গে তো বটেই, এই দুই প্রতি-পালকের সঙ্গেও মীর আপোষ করতেন না। নবাবদের প্রশংসায় বলা উচিত যে মীরের এরূপ ব্যবহারের জন্য তাঁরা মীরের প্রতি বিরূপ হন নি এবং তাঁর বৃত্তিও বন্ধ করেন নি। একবার নবাব সাদৎ আলি খাঁ যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রথানুযায়ী সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখান। মীর সেখানে ছিলেন কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ান নি। নবাব কারণ জানতে লোক পাঠালে মীর জবাব দিলেন, উনি যেমন এ রাজ্যের নবাব, আমিও তেমনি আমার রাজ্যের (উর্দু কবিতার) নবাব। সুতরাং উঠে দাঁড়াবার প্রশ্ন ওঠে না মীরের আচরণ সমসামুদ্দৌলাহ্-র প্রতি মীরের পিতার পূর্ব-উল্লিখিত আচরণ স্মরণ করায়। সাক্ষাৎপ্রার্থী সমসামকে মীরের পিতা সাক্ষাৎ করতে দিতে রাজী হন নি। মীর আরো অশোভন কাজ করলেন যখন নবাব তাঁর জন্য কিছু সাহায্য পাঠালে তিনি সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন যে যোগ্য প্রতিনিধি মারফৎ সাহায্য পাঠানো হয় নি, সুতরাং তিনি তা গ্রহণ করবেন না। নবাব এতেও কিছু মনে করলেন না এবং একজন পদস্থ রাজ-প্রতিনিধির মাধ্যমে সাহায্য পাঠিয়ে দিলেন।

হিন্দু সমাজে যেমন ব্রাহ্মণ, মুসলমান সমাজে তেমনি সেখ, ইমাম প্রভৃতিরা সাধারণের কাছে এবং ক্ষমতাবানদের কাছেও যথেষ্ট মান্যতা পেয়ে থাকেন। এঁদের বিরোধিতা করা বিপজ্জনক। কিন্তু তা জেনেও মীর আপন রচনায় এঁদের সমালোচনা করতে পশ্চাদপদ হন নি। শেখ., ইমাম প্রভৃতিদের মত্তাসক্তি, মসজিদে নানা অবাঞ্ছিত কাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে মীর তাঁর শের-এ সোচ্চার হয়েছেন।

গালিবের সমাজ সচেতনতা তেমন ছিল না, একথা পূর্বে বলা হয়েছে ইক্‌বালে শেখ্‌-ইমামদের সমালোচনা কিছু পাওয়া যায়। শেখ-ইমাম-রাও ইক্‌বালকে অব্যাহতি দেন নি। ইক্‌বাল গায়ত্রী মন্ত্রের উপর কবিতা লিখেছিলেন বলে' এবং তিনি দাড়ি রাখতেন না বলে শেখ্‌-ইমামরা তাঁকে ভৎর্সনা করেছেন। প্রথমোক্ত কাজের জন্য এক ইমাম ইক্‌বালকে কাফের বলে ফতোয়াও (ঘোষণা) দিয়েছিলেন। পূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের সমাজ সচেতনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের দুর্গোৎসবকারী ধনী ব্যক্তিদের নীচতাকে এবং নববর্ষে বাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। মধুসূদন প্রহসনে, কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম পেঁচার নকসায় এবং প্যারিচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলালে এ কাজ করেছেন। এগুলি সবই গদ্য গ্রন্থ। মীর কবিতায় শেখ্‌-ইমামদের অনুচিত কাজের সমালোচনা করে' সমাজসচেতনতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে গুপ্তকবি ও অন্যান্যদের এক শ' বছর আগে মীর একাজ করেছিলেন। অন্যান্য কতিপয় ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও মীর তথা উর্দু সাহিত্য ঈশ্বর গুপ্ত তথা বাংলা সাহিত্য এবং সম্ভবত অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের চেয়েও এক শ' বছরের মতো অগ্রগামী।

মীরের সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অংশ প্রকাশ পেয়েছে গূঢ়ার্থক ব্যঞ্জনাময় শের-গুলির মাধ্যমে। এজন্য তিনি উর্দু সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এ ছাড়া মীরের অপর যেসব কৃতিত্বের উল্লেখ করা হল, তাও তাঁকে এক বিশিষ্টতা অর্পণ করেছে। এসব কিছুর একত্র বিচারে মীর যে শুধু উর্দুর নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেরই এক অনন্য পুরুষ ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না

কবিতা

শের ও গ.জ.ল

১। কহিল সে, 'বে-খবর, চলো ওহে হেরি পন্থ খান,
আমিও ছিলাম কভু পূর্ণগর্ব শিরের সমান।'

কহ্‌নে লগা কে দেখ্‌কে চল্‌ রাহ্‌ বেখ.বর
ম্যয় ভী কভো কিসীকা সরে পুর গ.রুর থা

২। আসিল হে সে তো ঠিক মোর পাশে কিছুক্ষণ তরে,
তবে হায় সেইক্ষণে প্রাণ মোর ছিল ওষ্ঠ 'পরে।

আয়া তো সহী ওহ্‌ কোয়ী দম্‌কে লিয়ে লেকিন
হোটোঁপে মেরে জব্‌ নফসে বাজ.পসীঁ থা

৩। নাম তাহাদের আজ কেহ নাহি লয় হেথা, যারা
বৈভবের নিচে কাল রেখেছিল এ মুলুক সারা।

নাম আজ কোয়ী ইয়াঁ নহীঁ লেতা হ্যায় উন্‌হোঁকা
জিন্‌ লোগোঁকে কল্‌ মুল্ক্‌ ইয়েহ্‌ সব জে.রে নগীঁ থা

৪। ওখান থেকেই এসো মসজিদে ইমাম সাহেব আজ,
কাল তক এই মীরেরি তো ছিল জুয়া সুরা হের কাজ

মসজিদ মেঁ ইমাম আজ হুয়া আকে ওহাঁসে
কল্‌ তক্‌ তো ইয়েহ্‌ হী মীর খ.রাবাৎনশীঁ থা

৫। ইসলামের দীপ্তি লাগি কিছু কিছু কুফর তো চাই,
সুলেমানী জপমালা রম্য যদি, উপবীতও তাই।

কুফ্‌র্‌ কুছ চাহিয়ে ইসলামকী রওনক্‌ কে লিয়ে
হুসন্‌ জুন্নার হ্যায় তসবীহ্‌-এ-সুলেমানীকা

৬। আমার দিওয়ান এই পূর্ণ আছে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে,
ভেবো না তুমিও কেন এই পরেশানী সমাহারে।

দর্‌হমী হাল কী হ্যায় সারে মেরে দিওয়ান মেঁ
সয়ের কর্‌ তু ভী ইয়েহ্‌ মজ্‌মুআ পরেশানী কা

৭। মূর্তিপূজনেরে মীর ইসলাম তো কেহ নাহি কহে
মুসলমানীতে হেন বলো কার বিশ্বস্ততা রহে।

বুৎপরস্তী কো তো ইসলাম নহীঁ কহ্‌তে হ্যায়
মুআতকীদ কওন হ্যায় মীর অ্যায়সী মুসলমানী কা

৮। খানকা হইতে হ'লো যে এবার দেরি যেতে কাবা পুরে,
সে পথ হ'তে যে সরাবখানার পথ গেছে কিছু ঘুরে।

দের মেঁ কাবাহ্‌ গয়া ম্যয় খানকাহ্‌ সে অব কী বার
রাহ্‌ সে ময়খানে কী উস রাহ্‌ মেঁ কুছ ফের থা।

৯। এই যুগে হে ইলাহী প্রেমের কি হ'লো বলো, আজ
ওফাকে ছেড়েছে ওরা, নীতিতেও কিবা আছে কাজ।

ইস অহদ মেঁ ইলাহী মুহব্বৎ কো ক্যা হুয়া
ছোড়া ওফাকো উন্‌নে মুরওঅৎ কো ক্যা হুয়া

১০। উল্টে গেল সব তদবির ঔষধে কাজ হ'লো না লেশ,
দেখলাম এই দিল্‌-এর ব্যাধি কাজটি শেষে করল তো শেষ।

উলটী হো গয়ীঁ সব তদবীরেঁ কুছ নহ্‌ দওয়া নে কাম কিয়া
দেখা ইস বীমারী-এ-দিল্‌ নে আখির কাম তমাম কিয়া

১১। কেঁদে গেল যৌবনের কাল, বার্ধক্যেতে আঁখি মুদিলাম,
বিভাবরী জাগিলাম কত্তু, ভোর হ'ল, করিনু আরাম।

অহদে জওয়ানী রো রো কাটা পীরী মেঁ লীঁ আঁখেঁ মুঁদ
ইয়ানী রাত বহোৎ থে জাগে সুব্হ হুয়ী আরাম কিয়া

১২। কিসের কাবা কেমন কিবলা কোনসে হরম্ কী এহ্রাম,
গলির বাসিন্দারা সবে এখান থেকেই করল সলাম।

কিসকা কাবহ্ ক্যয়সা কি.বলহ্ কওন হরম হ্যায় ক্যা এহ্রাম
কুচেকে ইসকে বাশিন্দোঁনে সবকো এহীঁ সে সলাম কিয়া

১৩। মীরের ধর্মের কথা এবে কি জিজ্ঞাসো ? কবেই তো আমি করিলাম
কাটিয়া তিলক আর বসি দেবস্থানে পরিত্যাগ দীন্ ইসলাম।

মীর্ কে দীন ও মজ.হব্ কো অব পুছতে ক্যা হো উন্নে
ক.শক.হ্ খীঁচা দয়ের মেঁ বৈঠা কবকা তর্ক্ ইসলাম কিয়া

১৪। মেটার নহে কক্ষনো মোর কবিতার এই গরম খবর,
রইবে বেঁচে এই দুনিয়ায় আমার দিওয়ান যাবৎ হশর।

জানেকা নহীঁ শোর সুখ.ন কা মেরে হরগিজ.
তা হশ্র্ জহাঁ মেঁ মেরা দিওয়ান রহেগা

১৫। যে শিরের আজ গর্ব হেথায় রাজতাজ ধারণের,
কাল তার তরে এখানেই হয় হায় হায় মাতমের।

জিস সর কো গ.রূর আজ হ্যায় ইয়াঁ তাজ.ওয়রী কা
কল্ উস্পে এহীঁ শোর হ্যায় ফির নওহাগরী কা

১৬। কয়েদেও মোর মাতামাতি পাগলামি গেল নাকো হায়!
এবে এই শিরের ব্যাধির উপশম প্রস্তরের ঘায়।

জি.ন্দা মেঁ ভী শোরিশ নহ্গয়ী অপ্নে জুনূঁকী
অব সঙ্ মদাওয়া হ্যায় ইস আশুফ্তহ্সরী কা

১৭। সন্ধ্যা থেকেই নিভু নিভু রয় সে জানি,
হৃদয় যেন গরিব ঘরের প্রদীপখানি।

শামসে কুছ বুঝাসা রহ্‌তা হ্যায়
দিল্ হুয়া হ্যায় চিরাগ় মুফলিস কা

১৮। হতভাগা যত শুঁড়িদেরই আমি ছিলাম তো সুনজরে,
শেখ যে আমায় পানশালা থেকে আনলো উঠিয়ে ধরে।

থে বুরে মুগ়বচোঁকে তিওয়ার লেক্
শেখ় ময়খ়ানেসে ভলা খ়িস্‌কা

১৯। ওহে মেঘ, সিক্ত আঁখি দিলো আজি ফল,
প্রসারিত হ'ল আজ তাহার আঁচল।

ফয়েজ় অয়ে অবর্ চশ্‌মে তর্‌সে উঠা
আজ দামন ওসীহ্ হ্যায় উস্‌কা

২০। বিচ্ছেদের ক্ষত আর অভিলাষ মিলন ও কামনার তরে—
এসব হাঙ্গামা আমি সাথে করে লয়ে গেনু মাটির ভিতরে।

দাগ়ে ফিরাক় ও হসরতে ওস্‌লে আর্জু-এ-শওক়
ম্যয় সাথ জ়েরে খ়াক ভী হংগামহ্ লে গয়া

২১। গাফিল, কেঁদো না ভেবে যাত্রীদল যাবে একইবার,
শোনো ওহে এই পথে যাত্রা বাকি শেষ কাফিলার

অয়ে তু কে ইয়াঁসে আক়বতে কার জায়েগা
গ়াফিল নহ্ রো কে ক়াফলহ ইয়েক্ বার জায়েগা

২২। হশরের পরে নির্ভরতা, তাই নাহি আসে এইখানে,
মাঝ থেকে দেখার ওয়াদা কবে যাবে কেই বা তা জানে।

মওকু়ফ হশর্ পর্ হ্যায় সো আতে ভী ওএ নহীঁ
কব দরমিয়াঁ সে ওয়াদহ্-এ-দীদার জায়েগা

২৩। মস্তীতে আমি ছাড়ি মন্দির হয়েছিনু কাবাগামী,
হয়েছিল বড় ভ্রমই, কিন্তু সামলে গিয়েছি আমি।

মস্তী মেঁ ছোড় দয়ের কো কাবে চলা থা ম্যয়
লগ্.জি.শ বড়ী হুয়ী থী ও লেকিন সঁভল গয়া

২৪। কত প্রকৃতির প্রকৃতি হেথায় মাটি সনে মিলিয়াছে,
ছাড়িয়া শহর যাওনা ক্ষণেক মাজারেরা যেথা আছে।

মিলা হ্যায় খ.াকমেঁ কিস্ কিস্ তরহ্কা আলম ইয়াঁ
নিকল্কে শহর সে টুক সয়ের কর মজ.ারোঁকা

২৫। বদনাম আওয়ারা ক্ষীণ পরেশান ঢের—
না শুধাও হাল কিছু এ কালো মুখের।

বদনাম ও খ.ার ও জ.ার ও নজ.ার ও শিকস্তহ্ হাল
আহ্ওয়াল কুছ নহ্ পুছিয়ে ইস রুসিয়াহ্ কা

২৬। দিলের থেকে গেল না আর সুন্দরীদের মুখের নেশা,
কোনো কালেই কাটল না আর উকিঝুকি মারার পেশা।

দিল্সে শওকে. রুখে. নিকু নহ্ গয়া
ঝাঁকনা তাকনা কভু নহ্ গয়া

২৭। যদিও প্রতিটি পদেই তাহার ছিল মঞ্জিল, তবু
মগজের থেকে খোঁজার নেশাটি গেল নাকো আর কভু।

হর্ ক.দম পর্ থী উস্কী মঞ্জি.ল লেক
সর্সে সওদায়ে জুস্তজু নহ্ গয়া

২৮। সামনে থেকে বে-সতূঁকে হটিয়েও দিলে কোহ্কন
উঠাবার তো নাই ক্ষমতা, ভারি শিলা এ প্রেমধন।

গো বে-সতূঁ কো টাল দে আগেসে কোহ্কন
সঙ্গে গিরানে ইশক্. উঠায়া নহ্ জায়েগা

২৯। কাহারো লাগিয়া কভু খেদ নাহি কর, বিশ্বাস সে রয় আপনাতে,
হৃদয় খুইয়ে যদি বানাইলে কাবা, কিবা ফল লাভ হ'ল তাতে।

মৎ রঞ্জ্ কর্ কিসীকো কে অপনে তো এতেঁক়াদ
দিল্ ঢায়ে কর্ জো কাবহ্ বনায়া তো ক্যা হুয়া

৩০। তোমা 'পরে মমতায় ছিল যে ভরোসা, হলে অত্যাচারী,
ভেবেছিনু মোম তব রহিয়াছে দিল্-এ, হ'লো শিলা ভারী।

মেহর কী তুঝ্ সে তওক্কোহ্ থী সিতমগর নিক্লা
মোম সমঝে থে তেরে দিল্ কো সো পথর নিকলা

৩১। ভাঙ্গা দিল্ হার নাহি মানে, আছে ব্যথা আছে ক্ষতভয়,
শিকারের বাঞ্ছা যদি থাকে, জখমের ভয়ও তবে রয়।

নহীঁ ভাজহ্ দিল্ কী শিকস্তগী এহী দর্দ্ থা এহী খস্তগী
উসে জবসে জওকে শিকার থা উসে জখ্ম্ সে সরোকার থা

৩২। সেই চিন্তা করো যাতে হৃদয়ের ক্ষত ভরে যায়,
সীবন করিলে জামা, উপদেষ্টা, কিবা ফল তায়।

ওহ্ ফিক্র কর্ কে চাকে জিগর পায়ে ইলতিয়াম
নাসেহ্ জো তুনে জামহ্ সিলায়া তো ক্যা হুয়া

৩৩। থাকতে জীবন মীর সে আমায় দিলো শুধুই দাগ,
কি লাভ বলো গোরের 'পরে জ্বালালে চিরাগ।

জীতে তো মীর উন্‌নে মুঝে দাগ্ হী রখ্খা
ফির গোর পর চিরাগ্ জলায়া তো ক্যা হুয়া

৩৪। কিবা কথা বলি এর, জনশূন্য চিত্ত,
এ নগরী শতবার হয়েছে লুণ্ঠিত।

দিল্ কী বিরাণীকা ক্যা মজ়কুর হ্যায়
ইয়েহ্ নগর শও মর্তবহ্ লুটা গয়া

৩৫। গালিবের গোর যেথা আছে যাওনাকো সেথা একবার,
দুনিয়ার না জানি যা কত সহিয়াছে জুলুম-প্রহার।

টুক্ গোরে গ়রীবাঁ কী কর্ সৈর কে দুনিয়া মেঁ
ইন্ জু়ল্ম্ রসীদোঁ পর্ ক্যা ক্যা নহ্ হুয়া হোগা।

৩৬। জানিতাম তুমি কিছু নয় কিছু লিখিবেই ওহে মীর,
কিন্তু তোমার রচনাতে এলো ভরে বাসনার ভীর।

হম্‌নে জানা থা লিখেগা তু কোয়ী হরফ্ অয়ে মীর
পর্ তেরা নামহ্ তো ইক শওক় কা দফ্তর নিকলা।

৩৭। ফোঁড়ার মতো রাতটি ভরে পাকতে থাকলে দিল,
ভোর বেলা আর হাথ লাগানো হবেইতো মুসকিল।

ফোড়াসা সারী রাত জো পকতা রহেগা দিল্
তো সুব্হ তক্ তো হাথ লগায়া নহ্ জায়েগা।

৩৮। সত্য খোঁজা তোমাতে না আসে, নতুবা হে বন্ধু তুমি বলো,
দুনিয়াতো বন্ধুতেই ভরা, বন্ধু লাভ কোথা নাহি হ'লো।

হক্‌ ঢুঁড়নেকা আপকো আতা নহীঁ ওরনহ্
আলম হ্যায় সভী ইয়ার কহাঁ ইয়ার নহ্ পায়া।

৩৯। দুশমনী মোর সনে করিল হে এ জমানা,
তোর মতো নিষ্ঠাহীনে বন্ধু মোর ক'রে দিলো।
এই এ আবাস হ'লো সন্দেহের কারখানা,
কিন্তু হেথা আছে সেই বিশ্বাস যে করেছিলো।
শত প্রাণপ্রিয়াগণে আপনার দিয়ে তাপ
তোমার শিরের কেশে চমক সে প্রদানিলো।
আমি তো ফকীরদের কাজ পূর্ণ না করিনু,
সসম্ভ্রমে তোমা হ'তে প্রেম সেথা প্রসারিলো।
হে মীর, তরুতে যারে দেখিনু কাফের ঘোর
প্রেমের ধরমে সেই আপনারে সমর্পিলো।

দুশমনী হমসে কী জ.মানে নে জো অফাকার তুব.সা ইয়ার কিয়া
ইয়েহ্ তওয়াহ্হুম কা কারখা নাহ্ হ্যায় ইয়াঁ ওহী হ্যায় জো এতবার কিয়া
সদ্ রগে জাঁ কো তাব দে বাহম্ তেরী জু.ল্ফোঁ কা একতার কিয়া
হম্ ফকীরোঁসে বে অদায়ী কিয়া আন ব্যয়ঠে জো তুম্নে পেয়ার কিয়া
সখ্.ত্ কাফির থা জিস্নে পহ্লে মীর মজ.হবে ইশক. এখ.তিয়ার কিয়া

ক.তহ্ (এক বিষয়ের কবিতা)

৪০। দিল্ ও দিমাগ এবে কার আছে জিন্দগানীর ?
যেটুকু জীবন রয় আফসোস রয় জওয়ানীর।

দিল্ ও দিমাগ. হ্যায় অব্ কিসকো জি.ন্দগানী কা
জো কোয়ী দম্ হ্যায় তো অফসোস হ্যায় জওয়ানীকা

৪১। এ জীবনে দশ দিন স্তব্ধ যদি রহে ওষ্ঠাধর,
স্বল্পবাক. রবে সদা আমার এ কবিতার স্বর।

অগর চে উম্রকী দস দিন ইয়েহ্ লব্ রহে খামোশ
সুখন্ রহেগা সদা মেরী কম জ.বানী কা

৪২। সেই দিল্ খোদায়ীতে যাহার দখল ছিলো,
মূর্তিদের প্রেম তারে বেদখল করে দিলো।

বুতাঁকে ইশক.নে বে-এখ তিয়ার কর্ ডালা
ওহ্ দিল্ কে জিস্কা খু.দায়ীমেঁ এখ.তিয়ার রহা

৪৩। বিচ্ছেদ-অনল হ'তে হৃদয়েরে বাঁচানো না গেল,
সম্মুখে জ্বলিল ঘর, আমা হ'তে নেভানো না গেল।

দিল্কে তয়ীন আতিশে হিজরাঁসে বচায়া নহ্ গয়া
ঘর জলা সামনে পর, হম্সে বুঝায়া নহ্ গয়া

৪৪। ফুটেছে মানুষ নিজে তুলিয়াছে স্বল্প অবকাশে,
ধূলি মুষ্টি সেতো বটে, শির তবু তুলেছে আকাশে।

থোড়ে মেঁ দুর খীঁচে হ্যায় ক্যা আদম আপ কো
ইস মুশ্‌তে খাক কা হ্যায় দিমাগ আসমান পর্

৪৫। যাহা হতে চাও তার কাল যৌবন,
রাত কত কম আর নাট্য অগণন।

বন্ জো কুছ বন্ সকে জওয়ানী মেঁ
রাত তো থোড়ী হ্যায় বহুৎ হ্যায় সাজ্

৪৬। তুমি তো শায়ের নও, দেখিলাম তুমি যাদুকর,
দুই চার শের পড়ি সৃষ্ট করি গেছ চরাচর।

শায়ের নহীঁ জো তু হ্যায় কোয়ী সাহির
দো চার শের পড় কর্ সব কো রঝা গয়া হ্যায়

৪৭। হায় কত ক্ষীণবল ছিল মোর হৃদয় নয়ন,
শুদ্ধ প্রেম একবারো করা হায় গেল না গোপন।

ক্যা তুনক্ হওসলহ্ থে দীদহ্ ও দিল্ অপনে আহ্
এক দম রাজ মুহব্বৎ কা ছুপায়া নহ্ গয়া

৪৮। হ'লো ফাস কেঁদে মোর প্রণয় গোপন,
আমার দুশমন হ'ল আমার রোদন।

হুয়া রোনেসে রাজে দোস্তী ফাঁশ
হমারা গিরিয়হ থা দুশমন হমারা

৪৯। রচনার পর্দা আমি করেছিনু রেখতায়,
এখন আমার কলা তাতেই প্রকাশ পায়।

কিয়া থা রেখতহ্ পরদহ্ সুখন কা
সো ঠয়রা হ্যায় এহী অব ফন হমারা

৫০। দেখলাম তো কাম্য আমার লভ্য হবার কেমন আশা,
এখন খেদে ভাবছি কবে মিলবে আমার গোরের বাসা।

মক.সুদকো তো দেখেঁ কবতক্ পহুঁচতে হ্যায় হম্
বিলফেল অব ইরাদহ্ তা গোর হ্যায় হমারা

৫১। এই তো কেবল প্রেমের শুরু, এখনি কি কান্না তাহার,
আগে আগে দেখুন আরো কত কি হয় প্রেমের বাহার।

ইব্তদায়ে ইশ্ক্ হ্যায় রোতা হ্যায় ক্যা
আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যায় ক্যা

৫২। আমিই না ক'রিতাম মন্দিরের মসজিদের পথে মানা যেতে,
এখন রহিল এই কেয়ামৎতক দাবি শেখ ও ব্রাহ্মনেতে।

হম্ নহ্ কহতে থে কে মৎ দয়ের ও হর্ম্ কী রাহ্ লে
অব ইয়েহ্ দাওয়া হশর্তক শেখ্ ও বরহ্মন মেঁ রহা

৫৩। কি জানিব আয়েশের ঘর, নেহারিয়া সাকীর নয়ন,
সুরাসঙ্গ পরিত্যাগ করি করিলাম সুদূর ভ্রমণ।

ক্যা জানুঁ বজ্মে আয়েশ কে সাকী কী চশম দেখ্
ম্যয় সুহবতে শরাবসে আগে সফর কিয়া

৫৪। ভয়াল বনানী সম স্থিতি মোর জনমভুমির,
শুনি তাহা সফরেতে অস্বীকার করিল খিজির।

ওহ্ দশ্তে খওফনাক রহা হ্যায় মেরা ওতন
শুন্ কর্ জিসে খিজিরনে সফর্সে হজ্র কিয়া

৫৫। তোর হাতে ক্ষীণপ্রাণ যদি আমি মারা যাই,
সবে ক'বে, সেকি, ম'ল যার অর্ধ প্রাণই নাই!

হাথসে তেরে অগর ম্যয় নাতোয়াঁ মারা গয়া
সব কহেঙ্গে ইয়েহ্ কে ক্যা? ইক নীমজাঁ মারা গয়া

৫৬। একটি নজরে তার লোকসান বেশি কিছু নয়,
আমি যে বেচারা হায় মরিলাম ওগো দয়াময়।

এক নিগহ্‌সে বেশ কুছ নুকসান নহ্‌ আয়া উসকে তয়ীঁ
অওর ম্যয় বেচারহ্‌ তো অয়ে মেহর্‌বাঁ মারা গয়া

৫৭। প্রেমনগরীতে টানিয়া নিজেরে আনিল যে, লোভাতুর,
কামনায় ভরা যৌবনে শেষে লভে কোল মৃত্যুর।

জিস্‌নে সর খীঁচা দয়ারে ইশ্‌ক়্‌মেঁ অয়ে বুল্‌হওয়স্‌
ওহ্‌ সরাপা আজ়্‌ আখির়্‌ জওয়াঁ মারা গয়া

৫৮। অশ্রু চোখে কথন নাহি আসে? রক্ত আসে যখন তা না আসে;
যায়না তো হুশ, থাকেই তা, কিন্তু, যেই সে আসে তখন তা না আসে।
ধৈর্য ছিলো বিচ্ছেদে বন্ধু, অনেক্‌ দিবস্‌ আর তো সে না আসে,
কামনা মোর গেছে হিয়ার থেকে, কারণ বিনা কান্না নাহি আসে।
প্রেমের শর্ত তাকৎ, তা নয়তো কথার ঢং সে কাহার বা না আসে,
বন্ধু, হিয়ায় কতোই কী যে আছে, কিন্তু কাব্য ওষ্ঠে আর না আসে।

অশ্‌ক্‌ আখোঁ মেঁ কব্‌ নহীঁ আতা লহূ আতা হ্যায় জব নহীঁ আতা
হোশ জাতা নহীঁ রহা লেকিন জব্‌ ওহ্‌ আতা হ্যায় তব নহীঁ আতা
সবর্‌ থা এক মুনসে হিজরাঁ সো ওহ্‌ মুদ্দ্‌ৎসে অব নহীঁ আতা
দিল্‌সে রুখ্‌সৎ হুয়ী কোয়ী খাহিশ গিরিয়হ্‌ কুছ বে-সবব নহীঁ আতা
ইশ্‌ক়্‌ কো হওস্‌লহ্‌ হ্যায় শর্ত ওর্‌নহ্‌ বাৎকা কিস্‌কো ঢব্‌ নহীঁ আতা
জী মেঁ ক্যা ক্যা হ্যায় অপনে অয়ে হম্‌দম্‌ পর্‌ সুখ়্‌ন তা ব-লব নহীঁ আতা

৫৯। সে তো আমার ভুলই ছিল গাফিল থাকা তোমার কাছে,
বুঝিনিকো তুমিই আছো আমারি এই দেহের মাঝে।

গ়লৎ থা আপ্‌সে গ়াফিল গুজ়্‌রনা
নহ্‌ সমঝে হম্‌ কে ইস ক়ালিব মেঁ তূ থা

৬০। ফুল ও আয়না কিবা সূর্য চন্দ্র আর,
যেদিকে তাকাই দেখি প্রকাশ তোমার।

গুল ও আয়েনহ্‌ ক্যা খ্‌ুরশীদ ও মাহ্‌ ক্যা
জিধর দেখা তিধর তেরা হী রূ থা।

৬১। যদি গো স্মরণ করো কহিবে সে ছিল এক জনা,
অনেক কথার মালা করিয়াছে সে জন রচনা।

কহোগে ইয়াদ বাতেঁ তো কহোগে
কে কোয়ী রফ্‌তহ্‌-এ-বিসিয়ার গো থা

৬২। ফুল ছিল দেখো কারো প্রেমেতে দিওয়ানা,
শতস্থানে রিফু ছিল তার জামাখানা।

মগর দিওয়ানহ্‌ থা গুল ভী কস্‌ুকা
কে পয়রাহন মেঁ সও জাগহ্‌ রফু থা

৬৩। কেন নাহি হবে রেখতা খ্যাতি স্থিতি আর অর্থ হারা,
গত সে উন্মাদ মীর, আছে সওদা, মত্ত সে বেচারা।

নহ্‌ হো কেওঁ রেখ্‌তহ্‌ বে শোরশ ও কেয়ফিয়ৎ ও মানী
গয়া হো মীর দিওয়ানা রহা সওদা সো মস্তানা

৬৪। আমার হৃদয় সেই গলিতে আমায় নিয়ে গিয়ে,
আরো আমায় মাটির সনে হায় দিলো মিশিয়ে।

দিল্‌ মুঝে উস গলীমেঁ লে জা কর্‌
অওর ভী খ্‌াক মেঁ মিলা লায়া

৬৫। দেবালয় হতে মীর যাই এবে, পরে
আসিব আবার যদি খোদা ইচ্ছা করে।

অব তো জাতে হ্যাঁ বুৎকদেসে মীর
ফির মিলেংগে অগর খ্‌ুদা লায়া

৬৬। এখনো তো শক্তি কিছু আছেই বাকি শরীর মাঝার,
আসতে হয়তো এখন এসো, পরে কী আর রইবে আমার ?

এক ওহম্‌সী রহী হ্যায় অপনী নমূদ তনমেঁ
আতে হো অব তো আও ফির হমমেঁ ক্যা রহেগা

৬৭। এ জীবনে সর্বসনে ফকিরের মতো করো রীতি,
গালিও দিলেও বলো, ভালো ভাই ভালো হবে নীতি।

মায়েশত্‌ হম্‌ ফকীরোঁ কী সী এখেৎয়ানে জমাঁসে কর্‌
কোয়ী গালী ভী দে তো কহ্‌ ভলা ভাঈ ভলা হোগা

৬৮। আরামের ঘর এতো নয়, হেথাকার রং অন্য পারা,
এ বাগানে যত ফুল আছে, পাত্রপূর্ণ শোণিত তাহারা।

ইয়েহ্‌ আরেশ্‌গহ্‌ নহীঁ হ্যায় ইয়াঁ রংগ অওর কুছ হ্যায়
হর্‌ গুল হ্যায় ইস চমন্‌মেঁ সাগ়র ভরা লহুকা

৬৯। মোর অগ্রে বুলবুল করিও না গজল গৌরব,
বলিবার কিবা রীতি মোর কাছে শিক্ষা করে সব।

বুলবুল গ়জ়লসরায়ী আগে হমারে মৎ কর্‌
সব হম্‌সে সীখতে হ্যাঁ অন্দাজ গুফ্‌তগু কা

৭০। শোনাবেন তারে মজনুঁর কথা,
পর্দায় হবে আপন বাৎতা।

কহিয়েগা উস্‌সে কিস্‌সহ্‌-এ-মজনূঁ
ইয়ানী পর্দেমেঁ গ়ম শুনাইয়েগা

৭১। সেখ আর ব্রাহ্মণের সঙ্গ করি মীর
ছাড়ি যেতে হবে এবে কাবা ও মন্দির।

শিরকতে শেখ় ও বরহ্‌মন সে মীর
কাবা ও দয়ের সে ভী জায়েগা

৭২। শরাবে কাবাবে পূর্ণ দেবালয় সব,
কি আছে মসজিদে ? নাই খাদ্য বা আসব।

মামুর শরাবোঁসে কবাবোঁ সে হ্যায় সব দয়ের
মসজিদমেঁ হ্যায় ক্যা শেখ. ? পেয়ালহ্ ন নোয়ালা

৭৩। মক্কার শরীফ, শেখ, বরাবর ছিল এই মীর,
এবে সে শরাব লাগি ভেকধারী এক ভিখারীর।

শরীফে মক্কহ্ রহা হ্যায় তমাম উমর অয়ে শেখ,
ইয়েহ্ মীর অব জো গদা হ্যায় শরাবখানে কা

৭৪। মন্দির মসজিদ হ'তে ফিরিলাম আমি, এবে তো হৃদয় মোর ঘর,
এ বিপত্তি স্থলে হলো শেষ এবে মোর ভ্রমণ সফর।

দয়ের ও হরম্ সে গুজ.রে অব দিল্ হ্যায় ঘর হমারা
হ্যায় খতম ইস আবলে পর্ সয়ের ও সফর হমারা।

৭৫। জাহিদের এহরাম পোষাকে না ভোলো,
হরমে সে ছিল ঠিকই, জ্ঞাত নাহি হলো।

জামহ্-এ-এহরামে জ.াহিদ পর্ নহ্ জা
থা হরম্ মেঁ লেক না মহ্রম্ রহা

৭৬। বেঁচে ছিল যতদিন আছিল সে খুশ,
মনে হয় মীর ছিল বিমুক্ত পুরুষ।

খু.শ রহা জব তলক রহা জীতা
মীর মালুম হ্যায় ক.লন্দর থা

৭৭। বুদ্ধিতে যা নাহি আসে করে হিয়া ফির,
কতনা অবুঝ মোর ঘরের মুশীর

করতা হ্যায় কাম ওহ্ দিল্ জো অকল মেঁ নহ্ আবে
ঘরকা মুশীর কিত্না নাদান হ্যায় হমারা

৭৮। কাল বাগানেতে দেখিয়াছি ফুল,
আজ সেথা দেখি বন বিলকুল।

কল চমন্‌মেঁ গুল ও সুমন দেখা
আজ দেখা তো বাগ বন দেখা

৭৯। সে প্রিয়ের মহিমায় পরিপূর্ণ ভরা এ জগৎ,
দৃষ্টি সৃষ্টি করো আগে, পরে দেখো তাঁর কুদরৎ।

জঁহা জলওয়েসে উস মহ্‌বুবকে এক্‌সর লবালব হ্যায়
নজর প্যায়দা কর্‌ অওঅল্‌ ফির তমাশা দেখ্‌ কু.দরৎকা

৮০। কিবা হাল মোর কেবা জানিত সে কথা,
রাতের কান্নায় সবে জানিল বারতা।

কিসকো মেরে হাল্‌সে থী আগহী
নালহ্‌-এ-শব সবকো খ.বর কর্‌ গয়া

৮১। এ হিয়া খারাপ এত বোঝা নাহি যায় কভু কি তা
আছিল আবাদ কভু কিম্বা সদা জনবিরহিতা।

খ.রাবী দিল্‌কী ইস হদ হ্যায় কে ইয়েহ্‌ সমঝা নহীঁ জাতা
কে আবাদী ভী ইয়াঁ থী ইয়া কে বিরানহ্‌ থা মুদ্দৎকা

৮২। প্রেমত্ত নয়ন তার লুটাইল সব খানকায়,
আচার বিচার কিছু পড়ে আছে বিনা শৃঙ্খলায়।

নিগাহ্‌-এ-মস্ত্‌নে উস্‌কী লুটায়ী খা.নক.াহ্‌ সারী
পড়া হ্যায় বরহ্‌ম্‌ অব্‌তক কারখা.নহ্‌ জো.হ্‌দো তাক্বোকা

৮৩। এতই জোরে কাঁদলে পরে মীর,
আমরা সাথী রইব শুয়ে স্থির?
এই কাঁদুনে জগৎ চলমু ছাড়ি,
যার লাগি' মেঘ ফেলবে সদা নীর।

আমার কাজ তো প্রায়ই কান্না করা,
ধুইবে কতই অশ্রু এ মুখটির।
সজল আঁখি! তোমার বলো কি নেই?
মজাবে কতো হাল এ ধরিত্রীর?
হৃদয় আমার ছাড়লে আর্তনাদ
খোয়াবে হুশ জ্ঞানে যে সুস্থির।
প্রাণ খুলে তুই আন্‌কে দেনা গালি,
আমায় দিলে দেখবি কি হয় ফির।
হে মীর, শুধাও আঁখির পক্ষ্মপুটে,
গাঁথবে কতোই মালা এই মোতীর?

জো ইস শোর সে মীর রোতা রহেগা
তো হমসায়া কাহে কো সোতা রহেগা
মাঁয় ওহ্‌ রোনেওয়ালা জহাঁসে চলা হুঁ
জিসে অবর হর্‌ সাল রোতা রহেগা
মুঝে কাম রোনেসে অকসর হ্যায় নাসেহ
তূ কব তক মেরে মুঁহ্‌ কো ধোতা রহেগা
বস অয়ে গিরিয়হ্‌ আঁখেঁ তেরী ক্যা নহীঁ হ্যায়
জহাঁকো কহাঁ তক ডবুতা রহেগা
মেরে দিল্‌নে ওহ্‌নালহ্‌ প্যায়দহ্‌ কিয়া হ্যায়
জরস্‌কা ভী জো হোশ খোতা রহেগা
তূ ইয়ুঁ গালিয়াঁ গা.য়েরকো শওক্‌. সে দে
হমেঁ কুছ কহেগা তো হোতা রহেগা
বস্‌ অয়ে মীর মিজ.গাঁ সে পুঁছ আঁসুয়োঁকো
তূ কব তক ইয়েহ্‌ মোতী পরোতা রহেগা

৮৪। দিল্‌ ছিল সমরেতে প্রণয়ের সদা দুশমন,
এবে দাগ দেখো যেথা আগে সেথা আছিল বেদন।
দিল ইশক্‌. কা হমীশহ্‌ হরীফে নবর্দ্‌ থা
অব জিস জগহ্‌ কে দাগ. হ্যায় ইয়াঁ আগে দর্দ্‌ থা

৮৫। রেখতাই দানিল তারে আসন শীর্ষের,
কে আর বিশ্বাসী নহে শ্রেষ্ঠত্বে মীরের।

রেখ্.তহ্. রুত্.বেকো পহুঁচায়া হুয়া হ্যায় উস্.কা
মুঅতাকি.দ কওন নহীঁ মীরকী উস্তাদীকা

৮৬। সুন্দরী-প্রেমেরে আমি মীর করিলাম
কিবলা ও কাবা ও মোর নিজের ইমাম।

ইশ্.ক্. খ্.বাঁকো মীর ম্যয়ঁ অপনা
কি.ব্.লহ্. ও কাবহ্. ও ইমাম কিয়া

৮৭। মন্দিরে মসজিদে মীর কেমনে বা দাঁড়াবে পা রেখে,
এদিকে বিরূপ দেব ওদিকেতে খোদা ভার থেকে।

দয়ের ও হরম্.মেঁ কিউ কে ক.দম রখ্. সকেগা মীর
ইধর তো ইস্.সে বুৎ ফিরে উধর খুদ.া ফিরা

৮৮। সর্ব কর্ম খোদাতেই সমর্পণ করিয়াছি, তবে
ভীত আমি জিন্নতের কামনাবিহীন অনুভবে।

খু.দাকো কাম তো সঁওপে হ্যায়ঁ ম্যয়ঁনে সব লেকিন
রহে হ্যায় খ.ওফ মুঝে ওয়াঁকী বেনিয়াজ.ী কা

৮৯। কারো কথাই পারেনিকো সামনে আমার রং ফলাতে,
সবার হিয়ায় ছাপ ফেলেছে মোর কবিতার বারতাতে।

কসোকী বাত.নে আগে মেরে নহ্. পায়া রংগ
দিলোঁমেঁ নক.শ্. হ্যায় মেরী সুখ.ন্.তরাজ.ীকা

৯০। হে মীর, ভাবো মাটির সমান যত পয়মাল এই দুনিয়ার,
হিয়ায় যদি বাঞ্ছা থাকে শির আপনার উচ্চে রাখার।

বসানে খ.াক হো পামালে রাহে খ.ল্ক্. অয়ে মীর
রখে হ্যায় দিল্.মেঁ অগর ক.স্.দ্. সর্.ফরাজ.ীকা

৯১। কি কহিব. সুন্দরীরা কিবা আর রেখেছে আমার,
ওই কৃষ্ণঅক্ষিনীরা অনেকেরে রেখেছে শয্যায়।

ক্যা কহিয়ে কে খূবানে অব হম্‌মেঁ হ্যায় ক্যা রখা
উন্‌ চশ্‌মে সিয়াহোঁনে বহুতোঁকো সুলা রখা

৯২ মীর মহাশয় আমারে এই দিলেন পরোয়ানা—
সব কিছু হও তুমি, কিন্তু প্রেমিক হওয়া মানা।

ওসীয়ৎ মীরনে মুঝকো এহী কী
কে সব কুছ হোনা তূ আশিক. নহ্‌ হোনা

৯৩। মরার পরে বিশ্বাসিনী করব কি আর স্মরণ তোরে,
থাকতে জীবন কতই শত অবিশ্বাসে ঘিরল মোরে।

ক্যা বাদে মর্গ্‌ ইয়াদ করূঁগা ওফা তুঝে
সহ্‌তা রহা জফায়েঁ ম্যায়ঁ জবতক জিয়া কিয়া

৯৪। প্রাণেতে প্রাণ ঠাঁই পেলে তা বে-মজার বা কেনই হবে ?
খিজির এবং মসীহারা মরার মজা জানলো কবে ?

লজ্জ.ৎ সে নহীঁ খ.ালী জানোঁকা খপা জানা
কব খি.জ.র ও মসীহানে মরনেকা মজ.া জানা

৯৫ হে কেয়ামৎ, ঘুমের ঘোরে আমি যেন রয়েই না যাই,
এ পথ দিয়ে যাও গো যদি একটু ডেকে দিওনা ভাই।

অয় শোরে ক.য়ামৎ হম সোতে হী নহ্‌ রহ্‌ জায়েঁ
ইস রাহ্‌ সে নিকলে তো হম্‌কো ভী জগা জানা

৯৬। কাল খানকায় যেই শেরটির হ'ল বহু আলাপন,
আজ শুনে আমি জানিলাম তায় আমারি সে বিরচন।

জিস্‌ শের পর. সমাহ্‌ থা কল খ.ানক.াহ্‌ মেঁ
ওহ্‌ আজ ম্যায় সুনা তো হ্যায় মেরা কহা হুয়া

৯৭। দুঃখী মানুষ ভ্রমছে বুঝি জীবনেরি অন্বেষণে ?
বিশ্বাস কি এই খেয়ালের বাস্তবেতে রূপায়ণে'

ফিরতা হ্যায় জ़ীন্দগীকে লিয়ে আহ্-খ়ার ক্যা
ইস ওহম্ কী নুমূদ কা হ্যায় এত্-বার ক্যা

৯৮। ছিল সেও এককাল আর্তনাদ ছিল অগ্নিসম,
অনির্বাণ দগ্ধ হ'ত চারিদিকে অরণ্যানী মম।

থা ওহ্ ভী এক জ়মানহ্ জব নালে আংশী থে
চারোঁ তরফ্ সে জঙ্গল জলতা দহর দহর থা

৯৯। প্রেম হেথা আজকাল কী যে কাজ করেছে চলিত,
আঁখি সব করেছে সলিল, হিয়া সব করেছে শোণিত।

ইশ্ক নে ক্যা ক্যা তসর্রুফ ইয়াঁ কিয়ে হ্যায় আজকল
চশম্‌কো পানী কিয়া সব দিল্‌কো সব লোহু কিয়া

১০০। বিধাতার কার্যে কিছু বলা নাহি যায়, দেখ তার
করেছে আনন সুশ্রী, কিন্তু আচরণ কদাকার।

কাম্‌মেঁ কু়দরৎ কে কুছ বোলা নহীঁ জাতা হ্যায় হায়ে
খূ়ব রূ উস্‌কো কিয়া লেকিন বহুৎ বদ খূ় কিয়া

১০১। জুলুমে জর্জর এই মীর কভু আছিল জওয়ান,
কাব্যের শৈলির তরে ছিল খ্যাতি ছিল তার মান।
যাদুর সকল কথা পূর্ণ ছিল প্রতি বাক্যে তার,
হাজির গজল মুখে আছিল সে আজব বয়ান।
দিল্লীতে সে যেই পথে মৃত্ত্হিয়া চলিত কখনো,
কেয়ামতী হাঙ্গামাও সঙ্গে তার করিত প্রয়াণ।
ছিল না সে দীপ্তিহীন জলহীন মৃত্তিকা যেমন,
ছিল সে বিপদ আঁখি আছিল সে বিপ্লব সমান।
গাফিল ছিলাম আমি নিজ ক্ষত হিয়ার হালেতে,
সে নিধি আছিল এই জনশূন্য গৃহেতে নিহান।

হে মীর, যদিও তোমা জানিলনা কেউ এ ধরায়,
নিজে না রহিতে যদি রহিত না নাম ও নিশান।

ইয়েহ্ মীর সিতম্ কুশতহ্ কিসো ওক্ৎ জওয়াঁ থা
অন্দাজ্ সুখ্ন কা সবব শোর ও ফগাঁ থা
জাদুকী পুড়ী পরচহ্ অবিয়াৎ থা উসকা
মুঁহ্ তাকিয়ে গ্জল পঢ়তে অজব সেহর্বয়াঁ থা
জিস রাহ্ সে ওহ্ দিল্জদহ দিল্লীমেঁ নিকলতা
সাথ উস্কে ক্য়ামৎ কা সা হঙ্গামহ্ রওয়াঁ থা
অফ্সুর্দহ্ নহ্ থা অ্যায়সা কে জোঁ আব্জদহ খ্াক
আঁধী থা বলা থা কোয়ী আশোবে জঁহা থা
গাফিল থে হম্ অহোয়ালে দিলে খ্স্তহ্ সে অপনে
ওহ্ গঞ্জ্ ইসী গঞ্জে খ্রাবহ্ মেঁ নিহাঁ থা
গো মীর জহাঁ মেঁ কিন্হোঁনে তুঝ্কো নহ্ জানা
মওজুদ নহ্ থা তূ তো কহাঁ নাম ও নিশাঁ থা

১০২। হৃদয় দিয়ে হলাম নিরুপায়,
এই এ কাজে কি আছে মোর দায়।

দে কে দিল্ হম জো হো গয়ে মজবুর
ইস্‌মেঁ ক্যা এখ্তিয়ার হ্যায় অপনা

১০৩। অন্যদের মতো নই, কি আছে আমার ?
শহরে শহরে তবু আমার প্রচার।

কুছ নহীঁ হম মিসালে অনকা লেক
শহর শহর ইশ্তহার হ্যায় অপনা

১০৪। সদা যদি চোখে জল নাহি এসে যায়,
ভালো কাজ চলে মোর যেতো পর্দায়।
একথা সেকথা ক'বে বলেছো সে এলে,
সকলি কথার কথা, কথা না জুয়ায়।

বন্ধু হে, প্রেম যদি নয় এ তো কী এ ?
প্রাণ কেন সদা মোর লগ্ন সেথায় ?

আঁসু মেরী আঁখোঁমেঁ হর্‌দম্ জো নহ্ আ জাতা
তো কাম মেরা অচ্ছা পর্দে মেঁ চলা জাতা
কহ্‌তে তো হো ইয়ুঁ কহ্‌তে ইয়ুঁ কহতে জো ওহ্ আতা
সব কহ্‌নেকী বাতেঁ হ্যায়ঁ কুছভী নহ্ কহা জাতা
জো ইশ্‌ক্‌ নহীঁ হ্যায় তো ইয়েহ্ ক্যা হ্যায় ভলা মুঝ্‌কো
জী খুদ বখুদ অয়ে হম্‌দম্ কাহে কো খপা জাতা

১০৫। সাদা ওরে বলবে সাদাই কেহ,
ধূর্ত সে লোক আমার এ সন্দেহ।
এ কি এ প্রেম কিম্বা দেহের রোগ,
সদাই যেন আছি রুগ্ন দেহ।
নয়ন তোমার লগ্ন বুঝি কোথাও,
নজর থেকে ঝরছে যেন স্নেহ।

কোয়ী সাদহ্ হী উসকো সাদহ্ কহে
লগে হ্যায় হমেঁ তো ওহ্ অইয়ার সা
মুহব্বৎ হ্যায় ইয়া কোয়ী জী কা হ্যায় রোগ
সদা ময়ঁ তো রহতা হুঁ বীমার সা
মগর আঁখেঁ তেরী ভী চিপকী কহীঁ
টপ্‌তা হ্যায় চিত্‌ওন সে কুছ পেয়ার সা

১০৬। হতাশার দাগ সাথে গেছে ধরাতলে,
গেছে প্রাণ, যায়নি এ চিহ্ন চলে।

দাগে হিরমাঁ হ্যায় খাক মেঁ ভী সাথ
জী গয়া পর নহ্ ইয়েহ্ নিশান গয়া

১০৭। শুধালাম কাল কোথা পড়েছিল তূরের অনল,
হৃদয়ে ইশারা করি হিয়া কহে, এই অকুস্থল।

বাসনা অনল কিসে তুষানল হতে হলো কম ?
যেথায় পতিত হ'ল জ্বলে গেল সেথায় অচল ।

কল ম্যয় কহা ওহ্, তুরকা শোলহ্ কহাঁ গিরা
দিল্‌নে জিগর কী ওর ইশারৎ কী ইয়াঁ গিরা
ক্যা কম থা শোলহ্ শওক কা শোলেসে তূরকে
পত্থর ভী ওয়াঁকে জল গয়ে জাকর জহাঁ গিরা

১০৮। সরাবখানাতো নয় মসজিদের মতো,
তবু জ্ঞান সেথা লোপ পায়,
হয়েছে উভয় স্থানে আমার গমন,
গিয়েছি দু'এক বারই দুই জায়গায় ।

নহ্ হো ইয়ুঁ মরকদহ মসজিদসা পর্ ওয়াঁ হোশ জাতে হ্যায়
হুয়া হ্যায় দোনোঁ জাগহ্ এক দো বারী গুজার অপনা

১০৯। মীরও কেমন বলছে কথা দেবস্থানের লোকের মতো,
বলতো কিছু খোদার কথা মুসলমান সে যদিই হ'তো ।

মীর ভী দয়ের কে লোগোঁ হী কী সী কহনে লগা
কুছ খুদা লগতী ভী কহ্তা জো মুসলমাঁ হোতা

১১০। মৃত্যুর জঞ্জাল হওয়া হে মানুষ অমোঘ নিয়তি,
কেবা জানে ধীরে হয় সম্পদের তোমার কি গতি ।
পীত আভা মুখাকৃতি শরীরেতে কিছু দুর্বলতা,
হে মীর, প্রেমেতে তব একি হায় হ'ল পরিণতি ।

পহলা কদম হ্যায় ইনসাঁ পামালে মর্গ হোনা
ক্যা জানে রফ্তহ্ রফ্তহ্ ক্যা হো মাল তেরা
কুছ জর্দ জর্দ চেহরহ্ কুছ লাগরী বদন মেঁ
ক্যা ইশ্‌ক্ মেঁ হুয়া হ্যায় অয়ে মীর হাল তেরা

১১১। আমারে না কবি কহ মীর, আমি হই সেই একজনা
কত দুঃখ ব্যথা করি জমা করেছে যে দিওয়ান রচনা।

মুঝ্‌কো শায়ের নহ্‌ কহো মীর কে সাহব ম্যয় নে
দর্দ্‌ ও গ.ম কিতনে কিয়ে জমা তো দিওয়ান কিয়া

১১২। সত্যানুসন্ধানে আমি সত্যপথ জিজ্ঞাসিব কারে ?
খিজির কহিছে বারি মূসা অগ্নি কহিয়াছে যারে।

তহকীক. করূঁ কিস্‌সে হকীক.ৎ কে নশেকো
খি.জ.র আব উসে কহ্‌তা হ্যায় আতিশ কহে মূসা

১১৩। দোস্তী করে হলাম পরেশান,
চাওয়ার ছিল বহুৎ আরমান।

পরেশাঁ হুয়া দোস্তী কর্‌কে ম্যয়
বহোৎ মুঝকো অরমান থা চাহ্‌ কা

১১৪। মেঘ আছে আর ফুল মেলা, চলো সুফী ছাড়ি খানকায়,
আনন্দ রহিয়াছে কিছু বাতাবেতে সরাব খানায়।

অবর অওর জোশে গুল হ্যায় চল্‌ খানকাহ্‌ সে সুফী
হ্যায় লুৎফ্‌ মযকাদে মেঁ ওহ্‌ চন্দ্‌ উস হওয়া কা

১১৫। অজানা বনেছি গাফিল হয়েছি চলেছি ধীরে,
মুশকিল কাজে ধরেছি খোদার ভরোসাটিরে।
উত্তাপ আর আসে নাকো এই দুঃখী দিল্‌-এ,
ধৈর্য ধরেছি সহ্য করেছি আমি তো ফিরে।
গজলের জমি হয়েছে আমার যেন মুলুক,
তসরুফ আমি করেছি পুরো এ কতাহ্‌টিরে।
সত্য কি মোর মীর সে কথাতো গেলোনা বোঝা,
খুঁজে তারে আমি ফিরেছি রজনী দিবস ঘিরে।

তআহুল তগ.ফুল তসাহুল কিয়া
হুয়া কাম মুশকিল তওয়কুল কিয়া
নহী তাব লাতা দিলে আর অব
বহোৎ হম্‌নে সবর ও তহম্মুল কিয়া
জ.মি'ন গ.জ.ল মিল্কসী হো গয়ী
ইয়েহ ক.তহ তসর্‌রুফ ম্যয় বিলকুল কিয়া
হক.ীক.ৎ নহ্‌ মীর অপনী সমঝী গয়ী
শব্‌ ও রোজ. হম্‌নে তাআম্মুল কিয়া

১১৬। মক্কা গেলাম মদীনা গেলাম কারবালাও গেলাম,
যেমনি গেলাম চলে ফিরে তেমনি ফিরে এলাম।
আসা যাওয়ায় যদি কিছু দেখলাম তো বলি,
হারিয়ে গেলাম নিজেই যবে কথার গুহা পেলাম।

মক্কে গয়া মদীনে গয়া করবলা গয়া
জ্যয়সা গয়া থা ওয়্‌সাহী চল্‌ফিরকে আ গয়া
দেখা হো কুছ ইস আমদ্‌ ও শুদ্‌মেঁ তো ম্যয় কহুঁ
খু.দ গুম হুয়া হুঁ বাৎকী তহ্‌কো জো পা গয়া

১১৭। করিয়াছ ভালো তুমি, দয়াবানদের করুণার করোনি খেয়াল,
আমি নিজে হইলাম ফকীর যখন বিসর্জন করিনু সওয়াল।

খু.ব কিয়া জো অহলে করম্‌কে জুদ্‌ কা কুছ নহ্‌ খ.য়াল কিয়া
হম্‌ জো ফক.ীর হুয়ে তো হম্‌নে পহ্‌লে তর্ক সওয়াল কিয়া

১১৮। হুলুস্থূল পড়তে পারে হেন,
প্রতি পাতায় একটি আছে শের।
কেয়ামতের আসার দিনটি তবুই
রইবে জীবন আমার দিওয়ানের।

হর ওয়রক. হর সফ্‌হে মেঁ এক শের শোর্‌ অংগেজ. হ্যায়
অর্‌সহ্‌-এ মহশরকা অর্‌সহ্‌ হ্যায় মেরে দিওয়ান কা

১১৯। গীত যবে আসে তবে দিল্-এ ওঠে উচ্চকিত স্বর,
বুলবুলের কাছে কেউ শিখে নিক কাব্যের খবর।

জব্ জ.ম্ জ.মহ্ করতী হ্যায় সদা চুভতী হ্যায় দিল্ মেঁ
বুলবুলসে কোঈ সীখ্ লে অন্দাজ. সুখ.ন্ কা

১২০। স্মরণেতে রেখো মোর বাণী, হেন বাণী শুনিবেনা ফিরে,
অপরের মুখে শুনি দেবে বহুক্ষণ করাঘাত শিরে।
প্রচেষ্টা ও খোঁজ হবে বহু এই ঢংয়ে কাব্য রচনার,
প্রশংসিবে পড়ি' পড়ি' যেয়ে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ মেলা মন্দিরে।

বাতেঁ হমারী ইয়াদ রহেঁ ফির বাতেঁ অ্যায়সী নহ্ সুনিয়েগা
পঢ়তে কসোকো সুনিয়ে গা তো দের তলক সর্ ধুনিয়ে গা
সয়ী ও তলাশ বহোৎসী রহেগী ইস অন্দাজ.কে কহ্নে কী
সোহ্বৎ মেঁ উলমা ফুজ লা কী জাকর পঢ়িয়ে শুনিয়েগা

১২১। ছায়াতে রাখিয়া মোরে বাঁধিয়াছে কয়েদ করিয়া,
ব্যাধের কৃপায় ফাঁদ হয়ে গেল আমার আশিয়াঁ।

সায়েমেঁ তাক্ কে মুঝে রখা অসীর কর্
সইয়াদ কে করম্ সে ক.ফস্ আশিয়াঁ হুয়া

১২২। সে তো আসি চলি গেল ফিরে মোর ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,
বে-ঠিকানা-দিল্-আসবার হইলাম সকল হারিয়ে।

ওয়ে তো খড়ে খড়ে মেরে ঘর আকে ফির গয়ে
মায় বে দয়ার ও বেদিল্ ও বেখ.ানমাঁ হুয়া

১২৩। মজলিসে হালে হ'ল দেরি, বদ হাল হ'ল যে সূফীর,
শুনেছে সে গায়কের গান মোর হাল শের পংক্তির।

রহে বদ্হাল সূফী হাল করতে দের মজলিস মেঁ
মুগ.নীসে সুনা মিসরহ্ জো মেরে শের হালী কা

১২৪। মোর কবিতার লাগি দুনিয়ার বহু রাঙ্গা মনে,
অনেক করিবে খেদ এ দুনিয়া আমার বিহনে।
পড়িবে আমার শের কেঁদে কেঁদে জনগণ বসি,
রহিবে আমার লাগি বহু কাল সবে বিলাপনে।
মানুষের শেষ আবাস এ মৃত্তিকা নাহি হয় যদি,
কোথা যাবে আমার এ সুবর্কিম শরীর শয়নে?
নিচেতে জমিন আর আসমান রয়েছে উপরে,
কম নয় মোর রোল, যেন তাহা কেয়ামৎ ক্ষণে।
হে মীর, কাহারো শিরে নেহারিয়া বিপর্যস্ত কেশ,
আমার হিয়ার কাজ বিপর্যিস প্রবল কম্পনে।

সুখ ন মুশ্তাক. হ্যায় আলম হমারা
শহোং আলম করেগা গ.ম হমারা
পঢ়েঙ্গে শের রো রো লোগ বাযঠে
রহেগা দের তক মাতম্ হমারা
নহী হ্যায় মর্জহ্-এ-আদম অগর খ.াক
কিধর জাতা হ্যায় ক.দে খ.ম হমারা
জ.মীন ও আসমাঁ জে.র ও জ.বর হ্যায়
নহী কম হশর্ সে উধম হমারা
কসোকে বাল দর্হম্ দেখতে মীর
হুআ হ্যায় কামে দিল্ বর্হম্ হমারা

১২৫। নিশীথে সে বাহিরিল খাইয়া শরাব,
জানিল সে বাহিরিল নভে আফতাব।
মদিরার পেয়ালায় হলো কোরবান,
তাহাতেই উঠে গেল তোমার হেজাব।
আমা বিনা পান করি শরাব তোমার
চোখে খুন বাহিরিল হলো এই ভাব।
মদিরার মত্ততায় দেখিলাম আমি,
তামাম দুনিয়া যেন একটি খোয়াব।

ধীরে ধীরে পানশালে আসিল তো শেখ,
কিন্তু যবে বাহিরিল বহুৎ খারাপ।
ওয়ায়েজ এক ঢোক সুরা করি পান,
তাবে সব খুলে গেল বিদ্রোহের বাধ।

শব্‌ কো ওহ্ পীয়ে শরাব নিকলা
জানা ইয়েহ্ কে আফতাব নিকলা
কু রবান পেয়ালহ্-এ-ময়ে নাব
জিস্ সে কে তেরা হেজাব নিকলা
মুঝ বিন জো পিয়া থা কত্ত ময়ে কা
আঁখোঁসে হো খুনে নাব নিকলা
মস্তী মেঁ শরাব কী জো দেখা
আলম ইয়েহ্ তমাম খাব নিকলা
শেখ আতে তো ময়কদে মেঁ আয়া
পর হোকে বহোৎ খরাব নিকলা
এক জুরা শরাব হী মেঁ ওয়ায়েজ
হর মস্‌খরগী কা বাব নিকলা

১২৬। নাহক নালিশ মীর সারাদিন গেল যে বৃথায়,
অথবা তামাম রাত দিল্‌-এ হাল আলুথালু প্রায়।
কে আর ধরায় দিন সব ক'টি কাটালো খুশিতে,
কাহার কাটিল কবে সব রাত বিনা বেদনায়!

শিকোয়হ্ অবস হ্যায় মীর কে কুঢ়তে হ্যায় সারে দিন
ইয়া দিল্‌ কা হাল রহ্‌তা হ্যায় দর্‌হম্ তমাম শব
গুজ্‌রা কিসে জহাঁমেঁ খুশীসে তমাম রোজ
কিস্‌ কী কটী জমানে মেঁ বে-গম তমাম শব

১২৭। জলভরা অশ্রু, এবে পক্ষ্ম হ'তে যেওনা পতনে,
বৃথাই ঝরাবে তব জলবিন্দু মোতীর রতনে!

কিছু নয়, এ জীবন-সাগর–তরঙ্গে নাহি ভোলো,
আসলে এ মরীচিকা, নদী ভ্রম দূর-দরশনে।

মৎ চলক্ মিজ.গা সে অব তূ অয়ে সর্.শকে আবদার
মুফ.ত্ মেঁ জাতী রহেগী তেরী মোতী কী সী আব
কুছ নহীঁ বহরে জহাঁ কী মওজ পর মৎ ভোল মীর
দূরসে দরিয়া নজ.র আতা হ্যায় লেকিন হ্যায় সরাব

১২৮। হে ঈশ্বর, কোথা গেল যারা ছিল শিষ্ট লোক সব,
উজার দেখি যে এবে শহর নগর গ্রাম সব।
জ্ঞান আর কাব্য সনে সম্বন্ধিত বার্তা হেথা নাই,
পেয়াদারা, অশ্বারোহী, আর দেখি যত ভৃত্য সব।
দুনিয়ার জনগণ চিত্রবৎ দেখে এ ধরারে,
বাহ্যত নয়ন মেলা কিন্তু আছে বে-খবর সব।
হে মীর, এ খারাপেতে কিবা বাস করিবে বা কেহ,
দরোজা দেওয়াল পড়া, জনহীন পড়ে গৃহ সব।

ইয়া রব কিধর গয়ে ওয়ে জো আদমী রওইশ থে
উজড় দিখাযী দে হ্যায় শহর ও দহ্ ও নগ.র সব
হুফ' ও সুখ.ন সে মুৎলক্. ইয়াঁ গুফ্তগু নহীঁ হ্যায়
পেয়াদে সওয়ার হমকো আয়ে নজ.র নফর সব
আলমকে লোগোঁকা হ্যায় তস্বীরকা সা আলম
জাহির খুলী হ্যায় আঁখেঁ লেকিন হ্যায় বে-খ.বর সব
মীর ইস খ.রাবে মেঁ ক্যা আবাদ হোয়ে কোয়ী
দিওয়ার ও দর গিরে হ্যায় বীরাঁ পড়ে হ্যায় ঘর সব

১২৯। শিরেতে শুভ্রতা এল, চলে গেল তোমার যৌবন,
যা কিছু করার তুমি দ্রুত করে নাও এইক্ষণ।
প্রেমে মন্দ হ'নু আমি ভালো হ'নু ফের শতবার,
অবশেষে জানিলাম এবে আমি রবো মন্দ জন।

মারক প্রেমিকদের পীড়নেতে পুণ্য যদি হয়,
তবে তো হয়েছে তব কত [illegible] পুণ্য অগণন।

আয়া হ্যায় শেব সর্‌পে গয়া হ্যায় শবাব অব
করনা জো কুছ হো তুমকো সো কর্‌লো শতাব অব
বিগড়া বনা হুঁ ইশ্‌ক্‌ সে সওবার আক্‌বৎ
পায়া ক্‌রার ইয়েহ্‌ কে রহুঁ ম্যয় খ্‌রাব অব
খূঁ রেজী আশিকোঁ কী হ্যায় জ্‌ালিম অগর শোয়াব
তও তো হুয়া হ্যায় তুঝকো বহোৎ সা শোয়াব অব

১৩০। সব জিনিসের চাওয়ার মানুষ মেলে ধরার এই বাজারে,
কিন্তু হায়রে মিললো নাকো ভালোবাসার খরিদ্দারে।
যাবৎ জীবন বাঁচে রেখো সেই কথাটি প্রাণে গোপন,
দিওনাকো কক্ষনোই তোমার প্রেমের এজাহারে।

হর্‌ জিনস কে খ্‌রীদার মিলে বাজ্‌ারে জহাঁ মেঁ
লেকিন্ নহ্‌ মিলা কোয়ী খ্‌রীদারে মুহব্বৎ
উস্‌ রাজ্‌ কো রখ্‌ জী হী মেঁ তা জী বচে তেরা
জি নহার জো করতা হো তূ এজ্‌হারে মুহব্বৎ

১৩১। কামনার মুখ এখন হয়েছে মূক,
খুলবে রসনা যখন খোলে খুলুক।
বোলো না প্রাচীন সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা,
সেই কথা কথা হাল কথা যে বলুক।
হেথায় কাহার কাব্যের কথা নাই ?
নজরে আমার রয়েছে সবার মুখ।
জুলুম আর ক্রোধ হয়, হয় কেয়ামৎ,
ক্রোধে যে কথাই তাহার মুখে ফুলুক।
লোকে বলে আগে ছিল প্রেমিকার দয়া,
খোদা জানে ছিল এটা কবেকার ভুক।

অগ্নিবচন আছিল মীর তো আগে,
এখন বলুন গেছে সে আগের সুখ।

অব তো চুপ লগ গয়ী হ্যায় হসরৎ সে
ফির খুলেগী জ.বান জব কী বাৎ
মুক্তহ. দানানে রফ্তহ. কী নহ্ কহো
বাৎ ওহ্ হ্যায় জো হোয়ে অব কী বাৎ
কিস্কা রূয়ে সুখ.ন নহীঁ উধর
হ্যায় নজ.রমেঁ হমারী সব কী বাৎ
জু.ল্ম্ হ্যায় ক.হর হ্যায় ক.যামৎ হ্যায়
গুস্সে মেঁ উসকী জে.রে লব কী বাৎ
কহ্তে হ্যায় আগে থা বুতোঁমেঁ রহম
হ্যায় খু.দা জানিয়ে ইয়েহ্ কব কী বাৎ
গো কে আতিশ জ.বাঁ থে আগে মীর,
অব কী কহিয়ে গয়ী ওহ্ তব কী বাৎ

১৩২। বলতে তুমি দেখা হলে বলবে তারে কতই কথা,
এলো যখন কিন্তু তখন স্তব্ধ তোমার বাচালতা।
এখন আমি জেনে গেছি কেমন তোমার ব্যাপার স্যাপার,
সেথায় তুমি বললে কিছু হেথায় আমি জানলাম তা।
বুলবুলেরি বোলে আছে বলার সকল কায়দা আমার,
উড়ছে যে বাৎ তাহার কি আর রয় কখনো গোপনতা?
(সংক্ষেপিত)

কহতে থে উস্সে মিলিয়ে তো ক্যা ক্যা নহ্ কহিয়ে লেক
ওহ্ আগয়া তো সামনে উসকে নহ্ আয়ী বাৎ
অব তো হুয়ে হ্যায় হম্ভী তেরে ঢবসে আশনা
ওয়াঁ তূ নে কুছ কহা কে ইধর হম্নে পায়ী বাৎ
বুলবুলকে বোলনে মেঁ সব অন্দাজ. হ্যাঁ মেরে
পোশীদহ্ কব রহী হ্যায় কসোকী উড়ায়ী বাৎ

১০৩। শেরের আড়ালে আমি দুঃখ কথা শোনালাম বহু,
মর্সিয়া হিয়ার মোর বহুজনে কাঁদাইল বহু।
বসতি ও বিজনেতে ফিরি আমি ব্যাকুল বিলাপে,
শহরের দয়ালুরা হায় মোরে কাঁদাইল বহু।
খোলেনাকো কিছুতেই প্রেমলগ্ন হৃদয় তো আর,
বাহিরেতে দুঃখী তার খুশী থাকা হইল যে বহু।

শের কে পর্দে মেঁ ম্যয়নে গ.ম সুনায়া হ্যায় বহোৎ
মর্শিয়ে নে দিল্ কে মেরে ভী রুলায়া হ্যায় বহোৎ
ওয়াদী ও কোহসার মেঁ রোতা হুঁ ডাঁঢ়ী মার মার
দিল্‌বরানে শহর নে মুঝকো রুলায়া হ্যায় বহোৎ
ওয়া নহীঁ হোতা কিসীসে দিল্ গিরফ্‌তহ্ ইশক.কা
জ.াহিরা গ.মগীঁ উসে রহনা খু.শ আয়া হ্যায় বহোৎ

১০৪। জানিওনা তুমি এই নামাজীরা ধর্মের ইমারতে এক এক সামান,
একটি ইটের তরে করে এরা মসজিদেরে মৃত্তিকাতে ধূলি
পরিমাণ।
জমানার দুঃখ হতে মুক্ত সদা রয় পূর্ণ বিনষ্ট সম্পদ,
জুন্নার আবাস ঐ আকাশের কিনারাতে হায় আছে আছে
জয়গান।

মৎ ইন নমাজ.ীয়োঁ কো খ.ানহ্‌সাজে দীঁ জানো
কে এক ঈঁট কী খ.াতির ইয়েহ্ ঢাতে হেঙ্গে মসীৎ
গ.মে জ.মানহ্ সে ফারিগ. হ্যায় মায়া বাখ.ত্‌গাঁ
কু.মারখ.ানহ্-এ-আফাক. মেঁ হ্যায় হার ভী জীত।

১০৫। রুদ্ধবাক মীর মোর বাক্য রেখো স্মরণে ইয়ার,
সরাইখানায় এই থেকো বন্ধু খুব হুশিয়ার।

মুঝ বে-নোয়া কী ইয়াদ রহে মীর ইয়েহ্ সদা
ইস ময়কদে মেঁ রহিও বহোৎ হোশিয়ার দোস্ত্

১০৬। প্রেম ব্যাপারে হে চিকিৎসক একটু ভেবে দেখো,
মধ্যে আছে শঙ্কা প্রাণের, একটু ভেবে দেখো।
ধরার থেকে ওহে গাফিল মামুলি মাৎ যাও,
কোথায় তুমি রাখবে চরণ একটু ভেবে দেখো।
কেনই তুমি হেথায় এত ছড়িয়ে গেছো বলো,
আগের তারা কোথায় গেলো একটু ভেবে দেখো।
না বুঝে তুই ওষ্ঠ আপন খুলিস নাকো ওরে,
খুলবে যখন ওষ্ঠ আপন একটু ভেবে দেখো।
কুসুম ও রং আর সে বাহার আর পর্দার পিছে,
সব প্রকাশে গুপ্ত সে তো, একটু ভেবে দেখো।
ফয়দা আছে বার্ধক্যের ভুলুণ্ঠিত শিরে,
জরার আগে ওহে জোয়ান একটু ভেবে দেখো।

ইশ্‌ক্‌ মেঁ অয়ে তবীব হাঁ টুক সোচ্‌
পায়ে জাঁ দর্মিয়াঁ হ্যায় ইয়াঁ, টুক সোচ্‌
সরসরী মৎ জহাঁ সে জা গাফিল
পাওঁ তেরা পড়ে জহাঁ, টুক সোচ্‌
ফয়েল ইত্‌না পড়া হ্যায় তু কেওঁ ইয়াঁ
ইয়ার অগলে গয়ে কহাঁ, টুক সোচ্‌
হোঁট অপনা হিলা নহ্‌ সমঝে বিন
ইয়ানে জব খোলে তু জ-বাঁ, টুক সোচ্‌
গুল ও রঙ্গ ও বহার পর্দে মেঁ
হর্‌অয়াঁ মেঁ হ্যায় ওহ্‌ নিহাঁ, টুক সোচ
ফায়েদহ্‌ সর্‌ঝুকে কা শেব্‌ মেঁ মীর
পীরী সে আগে অয়ে জওয়াঁ, টুক সোচ্‌

১০৭। দিল্‌ই তো তা এই দুনিয়ায় দিল্‌ই কহে যারে,
না যদি এই আপদ হতো মানব দেহে, হারে।

দিল্ মেরী হ্যায় জিসকো দিল্ কহ্তে হ্যায়ঁ ইস আলম্
কে বীচ
কাশ ইয়েহ্ আফৎ নহ্ হোতী ক়ালবে আদম্ কে বীচ

১৩৮। মোর কবরের প্রস্তরে ফরহাদ
কুঠার রাখি বলেো' হে ওস্তাদ,
চিন্তা কিছুই ক'রো না তৈরির,
এই জীবনের কী আর বুনিয়াদ।
মৃত্তিকাও মাথায় দিতে নাই,
কী খারাপে হলাম হে আবাদ।
শুনছো শোনো, আমার পরে আর,
শুনবে না এ আর্তি ফরিয়াদ।
সব দিকেতে বন্ধু কয়েদখানা,
বাগান তব ঘর যদি হে ব্যাধ,
মোর মরণের অর্থ কবে কোথা
জীবন কয়েদ হইতে হই আজাদ।

মেরে সঙ্গে মজ়ার পর্ ফরহাদ
রখকে তীশহ্ কহে হ্যায় ইয়া উস্তাদ
ফিকরে তামীর মেঁ নহ্ রহ্ মুনেয়াম
জ়িন্দগানী কী কুছভী হ্যায় বুনিয়াদ
খ়াকভী সরপে ডালনে কো নহীঁ
কিস খ়রাবে মেঁ হম হুয়ে আবাদ
সুনতে হো টুক সুনো কে ফির মুঝ বাদ
নহ্ সুনোগে ইয়েহ্ নালহ্ ও ফরিয়াদ
হর তরফ হ্যায়ঁ অসীর হমআওয়াজ়
বাগ় হ্যায় ঘর তেরা তো অয়ে সাইয়াদ
হমকো মরনা ইয়েহ্ হ্যায় কে কব হোঁ কহীঁ
অপনী ক়য়েদে হায়াৎ সে আজ়াদ

১৩৯। যেখানেই ছুঁই এই দেহ সেখানেই ব্যথা ও বেদন,
দিল্-এ কভু লাগে যদি হাত হয়ে যাই হলুদ যেমন।
এখন তো সেই বাসনায় ছাড়িয়াছি আর্তনাদ করা,
হঠাৎ কখনো শ্বাস ওঠে ওষ্ঠাগত শীতল কেমন।

তন্ কো জিস জাগহ্ সে ছেড়ুঁ. হুঁ ওহাঁ হ্যায় দদ্ দদ্
হাথ লগাতে দিল্ কে হো জাতা হুঁ কুছ ম্যায় জ.র্দ্ জ.দ্
অব তো ওহ্ হস্রৎ সে আহ্ ও নালহ্ভী কর্না গয়া
কোয়ী দম হোঁটোঁ তক্ আ জাতা হ্যায় গাহে সদ্ সদ্

১৪০ : রক্ত বন্ধ হয়ে সিক্ত আঁখি বন্ধ নয়,
জখমে করেছে বন্ধ নয়ন উভয়।
চলে গেছে সে তো তাই দিল্ নাহি খোলে,
বন্ধ পড়ে এই ঘর বহুৎ সময়।
বিস্ফারিত চোখে দেখা গেছে সেই দিন,
দু'তিন প্রহর আঁখি এবে বন্ধ রয়।

নহী খুঁ, বস্তগী সে চশমে তর্ বন্দ্
জরাহৎনে কিয়ে হ্যায় চশম পর বন্দ্
গয়া হ্যায় ওহ্ সো দিল্ খুলতা নহীঁ হ্যায়
পড়া হ্যায় এক মুদ্দৎ সে ইয়েহ্ ঘর বন্দ্
গয়ে দিন্ টিক্টকীকে বান্ধ্নে কে
অব আঁখেঁ রহ্তী হ্যায় দো দো পহর বন্দ্

১৪১। হে মীর সাহেব, এই কাল সঙ্গীন,
দু'হাতে পাগড়ি নিজ সামলিয়ে নিন।
সরল জীবনে এই কর্মের ফেরে,
কঠিনতা আপনার উপরে না দিন।
চারটি দিনের এই দ্বন্দ্ববিবাদ,
সবাসনে আচরণ হোক দ্বেষহীন।

সেথাকার দুনিয়াটি মাটির সমান,
সাত আকাশের মতো জুলুম কঠিন।
করেছি হিয়ার কাছে এই আবেদন,
রোজা ও নমাজ দুই দরকারহীন।
মসজিদ দ্বারপরে বৃক্ষের ঝাঝায়ে
নেশার স্থানেতে তুমি রহো সমাসীন।
প্রাণে যা আসে তা তুমি করিও হে প্রিয়,
কেবল দিওনা কারে বেদনা কঠিন।
উভয় জগৎ লাভ একাক্ষর কথা,
শুধু যদি তুমি হও মোর মালকিন।
দিল্ সে নগর নয় ফের আবাদ হবে,
পস্তাবে তুমি এরে করি জনহীন।
দাও গো আরাম, থাকি বসে পা গুটিয়ে.
হে ঈশ্বর, পথ খুঁজি ফিরি কত দিন ?
প্রাণে শক্তি দেবে বুঝি এই শক্তিহীনে !
কুটোকে দেখাবে ক্ষণে পাহাড় প্রবীণ।

মীর সাহব' জমানহ্ নাজু.ক হ্যায়
দোনো হাথোঁসে থামিয়ে দস্তার
সহলসী জিদ.গী পে কামবে তয়ীন
অপনে ওপর নহ কীজিয়ে দুশওার
চার দিন কা হ্যায় মুজহিলহ ইয়েহ সব
সবসে রাখিয়ে স্বলুক্হী নাচার।
ওহাঁ জহাঁ খাক কে বরাবর হ্যায়
ক.দরে হফৎ আসমানে জু.ল্ম শিয়ার
এহী দরখাস্ত পাস দিল কী হ্যায়
নহীঁ রোজ.হনমাজ. কুছ দরকার
দরে মসজিদ পে হল্কহ্ জ.ন হো তুম
কে রহো বয়েই খ.নহ্-এ-খু.ম্মার
জী মেঁ আওয়ে সো কীজিও প্যারে।

এক হো জো নহ্ দরপায়ে আজ.ার
হাসিলে দো জহান হ্যায় এক হরফ
হো মেরী জান আগে তুম মুখতার
দিল্ ওহ্ নগর নহীঁ কে ফির আবাদ হে সকে
পছতাওগে সুনো হো ইয়েহ্ বস্তী উজাড় কর্
ইয়া রব্ হ্-এ-তলব মেঁ কোঈ কব তলক ফিরে
তসকীন দে কে বয়েঠ রহুঁ পাওঁ গাড় কর্
গ.ালিব কে দেওয়ে কুঅৎ-এ-দিল্ ইস জায়েকো
তিনকে কো জো দিখাওয়ে হ্যায় পল মেঁ পহাড় কর।

১৪২। মনে ছিল তার সনে দেখা হলে কত কত কহিবে হে মীর।
হ'ল যবে দেখা তবে চাহি তুমি তার পানে হয়ে গেলে যেমন স্থবির

জীমেঁ থা উসসে মিলে তো ক্যা ক্যানহ্ কহিয়ে মীর
পর্ জব মিলে তো রহ্গয়ে নাচার দেখ কর

১৪৩। পূর্ণ এ ধরারে নাহি দেখো করি স্তিমিত নজর,
শতেক আকার নাশি রূপ পায় হেথা এক ঘর।

দেখো নহ্ চশমে কম সে মামূরহ-এ-জহাঁ কো
বনতা হ্যায় এক ঘর ইঁয়া সও সূরতেঁ বিগড় কর্।

১৪৪। শেখীর উৎকর্ষ হয় এবে আর কিছু,
এবে হাল আর কিছু কথা আর কিছু।
সহজ ভেবো না এই দুনিয়ার জাহ্,
হেথায় হরেক ঠাঁই চিন্তা আর কিছু।
না মিলিলে মরে যাবে তাহার বিহনে,
প্রেমিক মিলন হয় এবে আর কিছু।
শেখের কূটেতে কভু প'ড়ো নাকো তুমি,
এতেও রয়েছে আরো সন্দেহ কিছু।

শেখ.ীকা অব্ কমাল হ্যায় কুছ অওর
হাল হ্যায় অওর ক.াল হ্যায় কুছ অওর

সহল মৎ বুঝ্ ইয়েহ্ তিলিসমেঁ জহাঁ
হর্ জগহ্ ইয়াঁ খ্য়াল হ্যায় কুছ অওর
নহ্ মিলেঁ গো কে হিজর মেঁ মর জায়েঁ
আশিকোঁকা বিসাল হ্যায় কুছ অওর
কুজ পশতী পে শেখ কী মৎ জাও
ইসপে ভী এহ্‌তমাল হ্যায় কুছ অওর

১৪৫। দুর্বল মোদেরে পায়ে কোরো না দলন,
সৌন্দর্য সম্পদ 'পরে করো' না গৌরব।
বসেছে বসেন তিনি আরশের 'পরে,
ময়লা ও কীট পাছে উঠে পড়ে সব।
এখন থেকেই মীর ফোস্কার নালিশ?
দিল্লী এখনো দূর ওহে বান্ধব।

হম্ জায়েফোঁকো পায়েমাল নহ্ কর্
দওলতে হুস্‌ন্ পর নহ্ হো মগ্‌রুর
আরশ পর বায়ঠ্‌তা হ্যায় কহ্‌তে হ্যায়
গর উঠে হ্যায় গুবারে খাতির মূর
শিকোঅহ্-এ-আবলহ্ অভী সে মীর
হ্যায় পেয়ারে হনোজ দিল্লী দূর

১৪৬। মৃত্যু দুর্বলের এক বিশ্রামের স্থান,
দম নিয়ে পুনর্বার হ'বে আগুয়ান।

মর্গ ইক মান্দগীকা ওক্‌ফহ্ হ্যায়
ইয়ানী আগে চলেঙ্গে দম্ লে কর্

১৪৭। প্রতিদ্বন্দ্বী ধূলিমুষ্টি মানব সবের,
নয়তো কে প্রতিস্পর্ধা করিল নভের?

ইয়েহ্ মুশ্‌তে খাক ইয়ানী ইন্‌সান হী হ্যায় রু কশ্
ওরনহ্ উঠায়ী কিন্‌নে ইয়েহ্ আসমাঁ কী টক্কর

১৪৮। স্বর্গের প্রাসাদ আমি দেখি নাই তাই কি করিব তাহার বয়ান,
মনে হয় আমাদের এই ভূমি 'পরে দিল্ সম নাহিকো মকান

ক.সরে জনাঁ তো হম্ নে দেখা নহীঁ জো কহিয়ে
শায়েদ নহ্ হোয়ে দিল্সা কোয়ী মকাঁ জ.মীঁ পর

১৪৯ হে মলয়, যদি হও নগরের সঙ্গী অবিচ্ছেদ,
কহিও মরুর বন্দী আমাদের শেষ হাল খেদ।
দিল্লীর মাটির থেকে ছিন্ন সবে করিল এবার,
বিধাতার অসন্তোষ, তাই ক্রোধে ঘটালো বিচ্ছেদ।
বহুকাল রহিয়াছি খিদমতে আলীর গোলাম,
হজরতে দিয়ে জান তাহাতেই লভিনু নির্বেদ।
ধীরে ধীরে এবে মোর শ্বেত বর্ণ হ'ল দুই আঁখি,
ইয়ার বান্ধবদের পত্র লাগি তাই মোর খেদ।
লেখে যদি দু' অক্ষর মাঝে মধ্যে আনন্দ মিশাল,
শীতল দুর্বল দিল্-এ অস্বস্তিতে তবে পড়ে ছেদ।
দু' হরফ লেখাও তো নাহি আসে তাহাদের থেকে,
যাহারা স্বীকৃত বন্ধু যারা মোর আওয়াজ অভেদ।
চিঠিপত্রে এ কহিত ভুলিবনা তোমারে কখনো,
বার বার আসিব হে ঘর বা'র খবরে অভেদ।
বিস্মরণে গেনু যবে, কার ঘর, কেন পাশে আসা,
জমানার বীরগণ, বাহ্ বাহ্ বলি অবিচ্ছেদ।
আসিবে মুখে যে কাব্য মিলিত তা হৃদয়ের খুনে,
কেননা বেদানা সম বান্ধবের সনে দিল্-এ ভেদ।
আজ থেকে বেহিসাবী অত্যাচারীদের কেহ নই,
দিল্দার এরি লাগি পেলো সদা সীমাহীন খেদ।
বাস্ মীর, রাখো লেখা, যেতে দাও এই এ হরফ,
তৃণের চাওয়ায় নগে নাহি হয় শক্তির প্রভেদ।

অয়ে সবা গর্ শহর কে লোগোঁ মেঁ হো তেরা গুজ.ার
কহিও হম্সহরা নওঅরদোঁ কা তমামী হালে জ.ার
খ.াকে দেহ্লী সে জুদা হম্ কো কিয়া এক বারগী
আসমাঁ কো থী কদূরৎ সো নিকালা ইয়ুঁ গু.বার
বন্দগী হ্যায় খি.দমতে আলী মেঁ হম্ কো দের সে
কর্ রখী হ্যায় জান অপনী হম্ নে হজ.রৎ পর নিসার

রফ্তহ্ রফ্তহ্ হো গয়ী আঁখে ভী অব মেরী সফেদ
বস্ কে নামেকা কিয়া ইয়ারোঁকে ম্যয়নে ইন্তজ়ার
লিখতে গর্ দো হরফ্ লুৎফ আমেজ বাদ অজ় চন্দ্ রোজ়
তো ভী হোতা ইস দিল্–এ–বতাব ও তাক়াৎ ক়া ক়রার
সো তো এক নহ্ নাবিশ্ত্হ্ কাগ়জ়্ভী নহ্ আয়া মেরে পাস
উন্ হমআওয়াজোঁসে ক্ষিনকা ম্যয় কিয়া রবৎ আশ্কার
খ়ৎ কিতাবৎ সে ইয়েহ্ কহ্তে থে নহ্ ভুলেঙ্গে তুঝে
আওয়েঙ্গ ঘরবারকী তেরে খ়বর কো বারবার
যব গয়া ম্যাঁয় ইয়াদ্সে তব কিসকা ঘর কাহেকা পাস
আফ্রীঁ সদ্ আফ্রীঁ অয়ে মর্দমানে রোজ়গার
মুহ্ঁ পর আওয়েঙ্গে সুখ়ন আলুদহ্-এ-খূনে জিগর
কেওঁকে ইয়ারানে জমাঁসে চাক হ্যায় দিল্ জুঁ অনার
আজ সে কুছ বেহিসাবী জওরকুন মহ্র্ম নহীঁ
ইনসে অহ্লে দিল্ সদা খীঁচে হ্যায়ঁ রঞ্জ় বেসুমার
বস্ ক্লম রখ্ হাথসে জানে ভী দে ইয়েহ্ হর্ফ্ মীর
কাহ্কে চাহে নহীঁ কোহ্সার হোতে বে ওকার।

(সংক্ষেপিত)

১৫০। রূপের পূজা হয় না তো হে প্রেমের মানে,
প্রেমিকাদের প্রেমে অমার অর্থ আছে অন্যখানে।
সুরৎ পরস্ত্ হোতে নহীঁ মানী আশনা
হ্যায় ইশ্ক্সে বুতোঁ কে মেরা মুদ্দোআ কুছ অন্তর

১৫১। তার তরে ভ্রান্তি থেদে উপস্থিত যেন কেয়ামৎ,
ওষ্ঠ পরে আসি রাতে চলে গেল জিগর ফেরৎ।
ক়য়ামৎ রহা অজ়তয়াব উন্কে গম় মেঁ
জিগর ফির গয়া রাত হোটোঁ পে আকর

১৫২। প্রেম করা ওহে মীর মোবারক হউক তোমার,
আমি তো লাগিয়ে দিল্ পস্তালাম বহু বহু বার।
মুবারক তুমহেঁ মীর হো ইশ্ক় করনা
বহোৎ হম্তো পছতায়ে দিল্কো লগা কর্

১৫৩। প্রেমিকার মিলনের কথা কিবা হেথা কহিব খবর,
পতঙ্গ যে মেলে শমা সনে সেও শুধু মরণের পর।
মাশুক. কা ক্যা বসল অরে অ্যায়সা ধরা হ্যায়
তা শমহ্ পতঙ্গা ভী জো পহুঁচে হ্যায় তো মর্ কর্

১৫৪। রেখতার বদলে আর কোন্ পেশা হইত আমার,
হায় মীর পস্তালাম এই কাজ করি বার বার।

কসব্ অওর ক্যা হোতা এওজে. রেখ্‌তহ্ কে কাশ
পচতা'য় ব'হাৎ মীর হুম্ ইস কামকো কর্ কর

১৫৫। প্রেমে মুহব্বতে আছে মজা, বন্ধ করো তারে যদি পারো,
বক্ষপটে ব্যথা শৈল, তবু আহ্ ও আর্তনাদ না পুকারো।

ইশক. মুহব্বৎ ইয়ারী মেঁ ইকলুৎফ্ রখে হ্যায় করনা জ.ব্ৎ
ছাতী পর্ জো হো কোহ্ অল্‌ম্ কা তো ভী নালহ ও আহ্
নহ্ কর

১৫৬। খোদার কাছে আশ্রয় চাও্ দিল, লাগানো আপদ ব ন্দা
প্রেম করো না কভু, ছাড়ো কসম খেয়ে প্রেমের ধান্দা।

মাঙ্গ্ পনাহ্ খু.দাসে বন্দে দিল্ লগনা ইক্ আফৎ হ্যায়
ইশ্‌ক্ নহ্ কর্ জিন্‌হ'র নহ্ কর্ ওয়াল্লহ্ নহ্ কর্
বি অল্লাহ্ নহ্ কর্।

১৫৭। এতে মুশকিল ওতে মুশকিল হেন,
শির ঝুকিয়ে চলব তবে কেন ?

ইয়ুঁ ভী মুশকিল হ্যায় উয়োঁ ভী মুশকিল হ্যায়
সর্ ঝুকায়ে গুজর করেঁ কিউঁ কর।

১৫৮। আমার এ দিল. মীর দরদী তো নয়,
কেমনে বা আর্তনাদে ফল সেথা নয় ?

দিল্ নহী দর্দ্‌মন্দ্ অপনা মীর
আহ্ ও নালে অসর করেঁ কিউঁ কর্

১৫৯ মানুষ সৃষ্টি জমিন থেকেই হয়,
দিমাগ.তাহার আসমানেতে রয়।

গর্‌চে ইন্‌সান হ্যায় জ.মীঁসে ওলে
হ্যায় দিমাগ. উনকে আসমানোঁ পর্‌

১৬০। দিল্‌ ও আরশ উভে রয় উচ্চস্থানে,
জীবনের লক্ষ্য সেও এ দুই মকানে।

অরশ্‌ ও দিল্‌ দোনোঁ কা হ্যায় পায়াহ্‌ বুলন্দ্‌
সয়েরে হস্তী হ্যায় ইন মকানোঁ পর্‌

১৬১। মানায় কোথায় মজা না মানার মতো?
বাসনা প্রবল হয় তার না না যতো।

এক.রার মেঁ কহঁা হ্যায় ইনকার কী সী খু.বী
হোতা হ্যায় শওক. গ.ালিব উসকী নহীঁ নহীঁ পর্‌

১৬২। কি আর কাঁদিবে শমা পতঙ্গের তরে,
তাহারো তো নিশি ভোর এল দ্বারপরে।

ক্যা পতঙ্গে কো শম্মহ রোয়ে মীর
উসকী শব কো ভী হ্যায় সহর দরপেশ

১৬৩। জীবনের মজা যদি রয় সে পাশে,
বয়সের মজা যবে জওয়ানী আসে।

জো ওহ্‌ হ্যায় তো হ্যায় জি.ন্দগানী সে হজ.
মজ.া উমর্‌কা হ্যায়ঃজওয়ানী সে হজ,

১৬৪। হুঁশের কর্ণ একটু খোল,
শোন দুনিয়ার গণ্ডগোল;
সব আওয়াজের পর্দা মাঝে
বচনবাগীশ এক বিরাজে।
গোশকো হোসকে টুক খোলকে সুন শেরে জহাঁ
সবকী আওয়াজ.কে পর্দে মেঁ সুখ.ন্‌সাজ. হ্যায় এক

১৬৫। দেখিলাম যারে রাতে আগুনের মতো জ্বলে,
ভোরে ফের দেখি তারে মিশে গেছে ধরাতলে।

জিসে শব আগ সা দেখা সুলগ্‌তে
উসে ফির খ়াক হী পায়া সহর তক

১৬৬। বান্দা হ'তে হে মীর কবে কাম্য জিনিশ পাই ?
চাওয়ার থাকে খোদার কাছে মাঁগ না যা তোর চাই।

মীর বন্দোঁসে কাম কব্‌ নিকলা
মাঙ্গনা হো জো কুছ খু়দা সে মাঙ্গ্‌

১৬৭। মৃত্যুপথ কথা বলি কেন ভয় প্রদর্শায় মোকে ?
ওদিকের পানে দেখি যায় তো হে কত কত লোকে।

রহ্‌-এ-মর্গসে কিউঁ ডরাতে হ্যায়ঁ লোগ
বহোৎ উস তরফ্‌কো তো জাতে হ্যায়ঁ লোগ

১৬৮। জানিলাম এই আমি জ নিনিকো কিছু,
একটি জীবন গেল এ জানারি পিছু।

এহী জানা কে কুছ নহ্‌ জানা হায়
সো ভী ইক উমর মেঁ হুয়া মালুম

১৬৯। হে মীর, কেবলি হিন্দে লোক নয় আমাতে উন্মাদ,
দিওয়ানা দক্ষিণে সব পেয়ে মোর কবিতার স্বাদ।

কুছ হিন্দ্‌হী মেঁ মীর নহীঁ লোগ জেব চাক
হ্যায় মেরে রেখ়তোঁ কা দিওয়ানা দকন তমাম

১৭০। লাগাতার কেঁদে যদি যাও নেভে তবে হিয়ার আগুন,
দু' এক অশ্রুর বিন্দু অগ্নি জ্বালে আরো বহু গুণ।

মুত্তস্‌সিল রোত্তে হী রহিয়ে তো বুঝে আতিশে দিল্‌
এক দো আসূঁতো অওর আগ লগা জাতে হ্যায়ঁ

১৭১। ভেবোনা সহজ মোদেরে, আকাশ বহুকাল যায় ঘুরে,
তবে বাহিরায় একটি মানুষ মাটির পর্দা ফুড়ে।

মৎ সহল হমেঁ জানো ফিরতা হ্যায় ফলক বরসোঁ।
তব্‌ খ়াক কে পর্দে সে ইনসান নিকল্‌তে হ্যায়ঁ

১৭২। শহরের ভালো মীর দেখিলাম ঢের,
চলন কোথাও নাই দিল্‌, জিনিসের।

শহরে খু.বাঁকো খু.ব দেখা মীর
জিনস্‌-এ-দিল্‌.কা কহীঁ রিওয়াজ্‌ নহীঁ

১৭৩। পড়ে ফিরবেন গলিতে গলিতে লোকে মোর রেখতায়,
বহু কাল হেথা রাখিবে স্মরণে আমার যত কথায়।

পঢ়তে ফিরেঙ্গে গলিয়োঁ মেঁ ইন রেখ.তোঁ কো লোগ
মুদ্দৎ রহেঙ্গী ইয়াদ ইয়েহ্‌ বাতেঁ হমা রয়াঁ।

১৭৪। বন্ধুরা আগে বাসনা আমার রেখেছে খারাপ করি,
নয়তো রেখতা সুন্দর বহু করেছি পরাণ ভরি।

দাওয়ে কো ইয়ার আগে মাইয়ুব কর্‌ চুকে হ্যায়
ইস রেখ.তে কো ওরনহ্‌ হম খু ব কর্‌ চুকে হ্যায়

১৭৫। পর্দা থেকে বাইরে আমায় আনলো টানি শখ আমারি,
নয়তো আমি রয়েছি সেই নির্জনতায় গোপনচারী।

লায়া হ্যায় মেরা শওক মুঝে পর্দে সে বাহর
ম্যায় ওরনহ্‌ ওহী খি.লওতী-এ-রাজ.-এ-নিহাঁ হুঁ

১৭৬। দেখিল আমারে যারা হয়ে গেল সবে তারা আমাতে উন্মাদ,
আমি এই দুনিয়ার মগজের উদ্বেগের যেন বুনিয়াদ।

দেখা হ্যায় মুঝে জিননে সো দিওয়ানহ্‌ হ্যায় মেরা
ম্যায় বায়স-এ আশুফ্‌তগী-এ--তবহ্‌- এ জহাঁ হুঁ

১৭৭। হায়রে, ক'রো না ক্লেশ মোর ওষ্ঠ প্রকম্পন লাগি',
শত বচনেরে আমি রক্তসনে মিলায়েছি জিহ্বাতলে রাখি।

তকলিফ নহ্‌ কর্‌ আহ্‌ মুঝে জুম্বিশে লব কী
ম্যায় সদ সুখ.ন আগস্তহ্‌ বখু.ন জে.রে জ.বা হুঁ

১৭৮। হনু পীত আমি দুঃখে বাগিচার ভাঙা বৃক্ষদের,
হেমন্তের বাগে আমি পত্রগুচ্ছ হই হেমন্তের।

হুঁ জ.র্দ গ.মে তাজ.হ্ নিহ্যালানে চমন সে
ইস বাগে. খি জঁ.া দীদহ্ মেঁ ম্যয় বর্গে খি.জঁ.া হুঁ

১৭৯। রেখতা খুব তো বলে ন্যায় করো সবে,
গুরু করা মীরে চাই কবিদের ভবে।

রেখ.তহ্ খু.বহী কহ্.তা হ্যায় জো ইনসাফ করো
চাহিয়ে অহলে সুখ.ন মীরকো উস্তাদ করেঁ

১৮০। মীর ও মির্জ.া রফীহ্ আর খবাজা মীর,
কতই একতা এই জোয়ান ত্রয়ীর।

মীর ও মির্জ.া রফীহ্ ও খ.াজ.হ্ মীর
কিতনে ইক ইয়েহ্ জওয়ান হোতে হ্যায়ঁ

১৮১। দিওয়ানা হলেই শেষে মীর তুমি রেখতা বলি বলি,
আমি না বলেছি তোমা ভালো নয় এই বার্তাবলী!

দিওয়ানহ্ হো গয়া তূ মীর আখি.র রেখ.তহ্ কহ্ কহ্
নহ্ কহ্.তা থা ম্যয়ঁ অয়ে জ.ালিম কে ইয়েহ্ বাতেঁ নহঁী ভলিয়াঁ।

১৮২। অত্যাশ্চর্য এই কবিগণ, ভালোবাসি আমি এই দলে,
বেধড়ক ভরা মজলিশে গুপ্তকথা দেয় এরা ব'লে।

অজব হোতে হ্যায়ঁ শায়র ভী ম্যয়ঁ ইস ফির্কে.কা অ শিক, হুঁ
কে বে ধড়কে ভড়ী মজ.লিসমেঁ ইয়েহ্ অসরার কহ্তে হ্যায়ঁ

১৮৩। খুলিয়া দিওয়ান মোর শক্তি দেখো মোর নাবিশের,
যদিও নবীন যুবা, গুরু আমি যতো কবিদের।

খোল কর্ দিওয়ান মেরা দেখ্ কু.দরৎ মুদ্দায়ী
গরচহ্ ম্যয়ঁ হুঁ নওজওয়াঁ পর্ শায়রোঁ কা পীর হুঁ

১৮৪। আবার সাহেব মীর করিছে পেয়ার,
যুবক সে, পেয়ারের আছে অধিকার।

ফির ভী করতে হ্যায় মীর সাহব ইশ্‌ক.
হ্যায় জওয়াঁ। এখ.তিয়ার রখতে হ্যায়

১৮৫। আগেতে দরিয়া ছিল অক্ষি জলময়,
এবে দেখো মীর মরু হয়েছে উভয়।

আগে দরিয়া থে দীদহ-এ-তর্‌ মীর
অব জো দেখো সোরাব হ্যায় দোনোঁ

১৮৬। অভিযোক্তা খাড়া মোরে সাফ মন্দ কয়,
বসে চুপ শোনো তুমি, কিবা এরে কয়?
রম্যানন হেরি হিয়া নাহি রহে ঠিক,
লোকে যাহা নাহি কহে তাই সত্য কয়।
সৌন্দর্য তো রয়েছেই, বাক্য রম্য করো,
দেখোনা মীরকে, তারে সবে ভালো কয়।

মুদ্দায়ী মুঝকো খড়ে সাফ বুরা কহতে হ্যায়
চুপকে তুম সুনতে হো ব্যয়ঠে ইসে ক্যা কহতে হ্যায়
দেখে খু.বাঁ কে বজা দিল্‌ নহী রহ্‌তা হরগিজ.
লোগ জো কুছ নহীঁ কহতে হ্যায় বজা কহতে হ্যায়
হুসন্‌ তো হ্যায় হী করো লুৎফ-এ-জ.বাঁ পয়দা
মীর কো দেখো কে সব লোগ ভলা কহতে হ্যায়

১৮৭। মন্দির মসজিদ হ'তে বেরোলে তো কিছু তপ্ত ঢঙ্গ,
হাঙ্গামা হতেছে এবে শেখদের বিপ্রদের সঙ্গে।

দয়ের ও হরম সে তূ তো টুক গর্ম্‌ নাজ. নিকলা
হঙ্গামহ্‌ হো রহা হ্যায় অব শেখ.ও বর্‌হমন মেঁ

১৮৮। না জানি মীরের শের কেন করে প্রাণমন জয়,
শৈলী কিছু নাহি হেন, ব্যঙ্গার্থও কিছু নাহি হয়।

ক্যা জানূ দিল্‌কো খীঁচে হ্যায় কিউঁ শের মীরকে
কুছ তর্জ. অ্যায়সী ভী নহীঁ এহ্‌াম ভী নহীঁ

১৮৯। কাবায় যাওয়ার লাগি তত কিছু বাঞ্ছা মোর নাই,
বলে দেও সেই পথ অপরের দিল্‌-এ ঠাঁই পাই।

কাবে জানে সে নহীঁ কুছ মুঝ কো ইতনা শওক. হ্যায়
চাল ওহ্‌ বতলা যায় দিল্‌মেঁ কিসোকে জা করূঁ

১৯০। আপন অস্তিত্ব হ'ল পর্দা এক মাঝে,
আমি যদি নাহি রই পর্দা কিবা কাজে।

হস্তী অপনী হ্যায় বীচ মেঁ পর্দহ্‌
হম্‌ নহ্‌ হোয়ে তে ফির হেজাব কহঁা

১৯১। ভোর কবে হয়নিকো হ'লে পরে রাত ?
হে বন্ধুবিচ্ছেদ, নাই তোমারি প্রভাত ?

কব শব হুয়ী জ.মানে মেঁ জো ফির হুয়া নহ্‌ রোজ.
ক্যা অয়ে ফিরাকে. ইয়ার তুঝীকো সহর নহীঁ

১৯২। যেথান থেকে খুশী দেখুন গোল লাগানো বেরোবে শের,
কেয়ামতের মতন রোলে ভরা শরীর মোর দিওয়ানের।

জহাঁ সে দেখিয়ে ইক শেরে শোর অঙ্গেজ. নিকলে হ্যায়
ক.য়ামৎ কা সা হঙ্গামহ্‌ হ্যায় হরজা মেরে দিওয়ান মেঁ

১৯৩। লক্ষ্ণৌর চেয়ে বহু ভালো ছিলো শূন্য দিল্লীর ভবন,
পরেশান নাহি আসিতাম হ'লে সেথা আমার মরণ।

খ.রাবহ্‌ দেহ্‌লীকা দেহ্‌ চন্দ্‌ বেহ্‌তর লক্ষ্ণৌ সে থা
ওহীঁ মায় কাশ মর্‌ জাতা সরা সীমা নহ্‌ আতা ইয়ঁা

১৯৪। কভু দিবা হয়ে যায় বড় কভু বড় হয়ে যায় রাত,
থাকেনাকো কভু একমতো রাত্রি দিবা দুই একসাথ।
দিন হ্যায় বড়ে কভোকে রাতেঁ বড়ী কভোকী
রহ্‌তে নহীঁ হ্যায় একসা লয়েল ও নহার দোনোঁ

১৯৫। খাই তার গালি হাস্য কৌতুকের ছলে,
খুশী আসে মোরে যবে মন্দ কথা বলে।

ম্যয় আপ ছেড় ছাড় কে খাতা হুঁ গালিয়া
খুশ আগয়ী হ্যায় উস্‌কী মুঝে বদ জ়বানিয়াঁ।

১৯৬। বিজলী নই যে, আমি জ্বলে নিভিয়াছি,
আমি যে সজল মেঘ, তাই ছেয়ে আছি।

বর্ক্‌ তো ম্যয় নহ্‌ থা কে জল বুঝতা
অবরে তর্‌ হুঁ কে ছা রহা হুঁ

১৯৭। মত্ত আমি শতবার কাবাতেই গ্রেপ্তার হলাম,
এও মোর ভালো জানা কেন মোর হল বদনাম।

সও বার মস্ত্‌ কাবে মেঁ পকড়ে গয়ে হ্যায় হম্‌
রুসোয়ায়ী কে তরীক সে কুছ না বল্‌দ্‌ নহী

১৯৮। হে মীর, বার্ধক্যে জেনো কাব্যানন্দ নাহি রহে আর,
শের এবে কহি বটে, ধুন্ধুমার নাহিকো তাঁহার।

লুৎফ্‌-এ-সুখ্‌ন ভী পীরী মেঁ রহতা নহীঁ হ্যায় মীর
অব শের হম্‌ পঢ়ে হ্যায় তো ওহ্‌ শদ্দ্‌ ও মদ্দ্‌ নহীঁ

১৯৯। বাসনা রয়েছে, আছে দুঃখে অধীরতা,
আহা কিবা বলিব কাহারে,
আমি নিজে হায় সুধু আপন হিয়ায়
ক্লিষ্ট করিয়াছি রোগভারে।

শওক্‌ হ্যায় গ়ম্‌ মেঁ বে সবরী হ্যায়
আহ্‌ কিসকো ক্যা কহিয়ে
অচ্ছে অপনে দিল্‌কো হম্‌নে
আপ হী রোগ লগায়ে হ্যায়

২০০। ফুল হ'ক চাঁদ হ'ক আয়না কি হ'ক সে তপন,
আমার তো সেই প্রিয় আছে যার অভিনয় ধন।

গুল হো মেহতাব হো আয়েনহ্ হো খুরশীদ হো মীর
অপনা মেহবূব ওহী হ্যায় জো অদা রখতা হো

২০১। মসজিদে থাকো কিম্বা থাকো খানকায়,
একটি উষা তো সন্ধ্যা করো বাগিচায়।

আহ্ তা চন্দ রহো খানকাহ ও মসজিদ মেঁ
এক তো সুব্‌হ গুলিস্তান মেঁভী শাম করো

২০২। কাব্যের শৈলীতে মীর বরবাদ হ'ল বহুকাল,
এখন হয়েছো বৃদ্ধ, ত্যাগ করো এসব খেয়াল।

বস্ বহোৎ ওয়ক্ত্ কিয়া শের কেফন মেঁ জায়েহ্
মীর অব পীর হুয়ে তর্কে খেয়ালাৎ করো

২০৩। হবে কোনো প্রাচীরের ছায়াতলে পড়ে আছে মীর,
কিবা কাজ মুহব্বতে আছে সেই সুখসন্ধানীর!

হোগা কিসো দিওয়ার কে সায়েমেঁ পড়া মীর
ক্যা কাম মুহব্বৎ সে উস আরামতলব কো

২০৪। আমি উন্মাদ নেড়ো না মোর শিকল,
কি জানি ফের না উঠে পড়ে কোলাহল।

মুঝ দিওয়ানে কী মৎ হিলা জঞ্জীর
কহীঁ আয়সা নহ্ হো কে ফির গুল হো

২০৫। করিওনা লোপ মীরের কবর স্থান,
থাকিতে দাওহ গরিবের এ নিশান।

মৎ তুর্বতে মীর কো মিটাও
রহনে দো গরীব কা নিশাঁ তো।

২০৬। মানুষ এনেছে টানি বহু বহু দূরেতে আপনা,
পর্দার আড়ালে ভাবো আছে কিনা খোদা একজনা।

খীঁচা হ্যায় আদমী নে বহোৎ দূর আপ কো
ইস পর্দে মেঁ খ্‌য়াল তো কর্‌ টুক খুদা নহ্‌ হো

২০৭। মস্তানন্দ মেঘাগমে, তাও দেখো নসীব, যখন
হস্তে ধৃত সুরাপাত্র, আকাশেতে উদয় তপন।

লুৎফ্‌-এ-শরাব অবরে সে হ্যায় সো নসীব দেখ্‌
জব লেওয়ে জাম হাথ মেঁ তব আফতাব হো

২০৮। বচন রচনা নহে তো সহজ, এখানে সবাই লেখে তো শের,
উচু চিন্তার একটি গজল বলো না লিখিতে ইয়ারদের।

বাৎ বনানা মুশকিল সা হ্যায় শের সভী ইয়াঁ কহ্‌তে হ্যায়ঁ
ফিকর-এ-বুলন্দ্‌ সে ইয়ারোঁ কো ইক অ্যায়সী গ.জ.ল কহ্‌না নদো

২০৯। শয়নের স্থান এতো নয়, রহ তুমি জাগরিত,
আমি তো তোমায় দিলাম খবর, হও তুমি অবহিত।

ইয়েহ্‌ সরা সোনে কী জাগহ্‌ নহীঁ বেদার রহো
হমনে কর্‌ দী হ্যায় খ.বর তুমকো খবরদার রহো

২১০। যতদিন রহ পৃথিবীতে দুঃখে কিম্বা আহ্লাদিত মনে,
হেন কর্ম করে যাও কিছু বহুদিন রহিবে স্মরণে।

বারে দুনিয়া মেঁ রহো গ.মজ.দহ্‌ ইয়া শাদ্‌ রহো
অ্যায়সা কুছ কর্‌কে চলো ইয়াঁ কে বহোৎ ইয়াদ রহো

২১১। কে কহিল মীর তুমি কাঁদো নির্দ্বিধায় ?
কাঁদো হেন ক্রন্দনে না হাসি উপজায়।

কহ্‌তা হ্যায় কওন মীর কে বে এখ.তিয়ার রো
অ্যায়সা তু রো কে রোনে পে তেরে হঁসী নহ্‌ হো

২১২। উজাড় এ সব বসতিতে লাগে না আর মন,
থাকতে সে চায় সেথায় যেয়ে যে স্থান নির্জন।

ইন উজড়ী হুয়ী বস্তীয়োঁ মেঁ দিল, নহীঁ লগতা,
হ্যায় জী মেঁ ওহীঁ জা বসেঁ বিরানহ্ জহাঁ হো।

২১৩। জ্ঞানীদের সাহচর্যে ঘৃণা মীর উপজিল ঢের,
এখন থাকিব যেয়ে যেথা বাস কোনো উন্মাদের।

ওহশৎ হ্যায় খি.রদ্ মন্দোঁ কী সুহবৎ সে মুঝে মীর
অব জা রহূঁগা ওয়াঁ কোয়ী দিওয়ানহ্ জহাঁ হো'

২১৪। অস্থির সৌন্দর্য পরে আপনার গর্বিত না রও,
আজ পাশে যাহাদের কাল তারা ক'বে দূর হও।

অপনে হুসন-এ-রফতনী পর আজ মৎ মগ.রূর হো
পাস তূ হ্যায় জিনকে ওহী কাল কহেঙ্গে দূর হো

২১৫। মেঘের মৌসুম হবে, হবে সুরাধার,
ফুল আর বাগ হবে, তুমি হবে আর।

মওসম অবর হো সুবু ভী হো
গুল হো গুলশন হো অওর তূ ভী হো

২১৬। কতকাল ঐরূপ হেরিবে দর্পণ?
এদিকে ফেরাও মুখ কখনো সখন।

কব তক আয়েনে কা ইয়েহ্ হুসন্ ক.বুল
মুঁহ তেরা ইস তরফ কভো ভী হো

২১৭। হয় যদি হোক ফুলে রং তোমা সম,
হেন গন্ধ হলে প্রেম উপজিবে মম।

হো জো তেরা সা রঙ্গ্ গুল কা হ্যায়
বেঝেঁ হম্ তব জব অ্যায়সী ব্ ভী হো

২১৮। শুরু থেকে প্রেমে হাল আগুন আমার,
এখন যা শেষে আছে সবই ভস্মসার।

আগ থে ইশ.ক. মেঁ ইব.তদা সে হম.
অব জো হ্যায় খ.াক ইন্তহা হ্যায় ইয়েহ.

২১৯। মানুষের অস্তিত্ব তো শিশিরের প্রায়,
পরিণত ক্ষণান্তরে হয় সে হাওয়ায়।

বূদ-এ আদম নুমুদ-এ-শবনম হ্যায়
এক দো দম মেঁ ফির হওয়া হ্যায় ইয়েহ.

২২০। কেন না মানুষ মীরে রাখিবে মনে?
আগেতে সে জন ছিল লোকেরি সনে।

মীর কো কিউঁ নহ. মুগ.তনম জানে
অগলে লোগোঁ মেঁ ইক রহা হ্যায় ইয়েহ.

২২১। অস্তিত্ব সে চিত্র যেন, যেন প্রতিরূপ,
দেহ সে যেনগো এক বিশ্বাস স্বরূপ।

বূদ নক.শ ও নিগার সা হ্যায় কুছ
সূরৎ ইক এৎবার সা হ্যায় কুছ

২২২। এই অবসর যারে কহে আয়ুষ্কাল,
প্রতীক্ষা এ যেন, যদি করগো খেয়াল।

ইয়েহ. জো মুহলৎ জিসে কহেঁ হ্যায়ঁ উমর
দেখো তো ইন্তজ.ার সা হ্যায় কুছ

২২৩। বার্ধক্যের দৌর্বল্যে জীবন ব্যাপার
আপন স্কন্ধের পরে হয় যেন ভার।

জে.াফে পীরী মেঁ জিন্দগানী ভী
দোশ পর অপনে বার সা হ্যায় কুছ

২২৪। কেমনে স্বীকার করি বন্ধুদের খেদ হাহাকার?
এদের মুখেতে এক মনে অন্য কথা প্রার্থনার।

ইয়ারোঁ কী আহ. ও জ.ারী হোয়ে ক.বুল কিউঁ কে
ইন কী জ.বাঁ মেঁ কুছ হ্যায় দিল. মেঁ হ্যায় কুছ তুম্মা কুছ

২২৫ করিয়াছে বান্দা মোরে পুরোপুরি বাসনারা মিলে,
নয়তো হতাম খোদা মতলব না রহিলে দিল্-এ।

সরাপা আর্জু. হোনে নে বন্দহ্ কর্ দিয়া হম কো
ওগরনহ্ হম খু.দা থে গর্ দিল্-এবে মুদ্দোয়া হোতে

২২৬। বে-ইনসাফ খঞ্জরেরে বার বার কি দেখিছ তুমি ?
ন্যায়ের দৃষ্টিতে চাহি দেখে নাও মোর বক্ষভূমি।

খ.ঞ্জরে বেদাদ কো ক্যা দেখতে হো তুম দম বদম
চশম সে ইন্সাফ কী সীনে হমারে দেখিয়ে

২২৭। দুনিয়ারে যুক্ত করো অস্থায়িত্ব সনে,
অজ্ঞ, এতো পথ, যারে গৃহ ভাবো মনে।

জহাঁ সে তূ রখ.তে ইক.ামৎ কো বাঁধ
ইয়েহ্ মঞ্জি.ল নহীঁ বে খ.বর রাহ্ হ্যায়

২২৮। অস্তিত্ব আপন যেন বুদ্বুদ গঠন,
মরীচিকা হেন যেন এই প্রদর্শন।

হস্তী অপনী হেবাব কী সী হ্যায়
ইয়েহ্ নুমায়েশ সরাব কী সী হ্যায়

২২৯। দেখো ঐ আধখোলা চক্ষুতে মীর
ছেয়ে আছে সারা ভাব সুরা মস্তীর।

মীর উন্ নীমবাজ. আঁখো মেঁ
সারী মস্তী শরাব কী সী হ্যায়

২৩০। এবেও যে যৌবনের বাঞ্ছা আছে, জানি
চলমান জীবনের সেই তো নিশানি।

অব জো এক হস্রৎ-এ-জওয়ানী হ্যায়
উম্রে রফতহ্ কী ইয়েহ্ নিশানী হ্যায়

২৩১। হিয়ার পূর্ণতা লাগি চিন্তা নাহি করো, সময়ের আছে প্রয়োজন,
অবকাশ চাহি এই শূন্যতারে ভরি করিবারে বসতি করণ।

দিল্ কী মামুরী কী মৎ কর্ ফিকর ফুর্সৎ চাহিয়ে
অ্যায়সে বিরানে কে অব বসনে কো মুদ্দৎ চাহিয়ে

২৩২। মিলনে ও বিচ্ছেদেতে প্রণয়েতে কথা কিছু নাই,
নৈকট্য ও ব্যবধান একই এতে, ভালোবাসা চাই।

ইশ্ক্ মে ওস্ল্ ও জুদায়ী সে নহীঁ কুছ্ গুফতগু
কুর্ব্ ও বোয়াদ ইস জা বরাবর হ্যায় মুহব্বৎ চাহিয়ে

২৩৩। রেখতার জগৎ মাঝে আমি এক শ্রেষ্ঠ কলাকার,
মীর যদি দেয় মন সবি হয় কলার সম্ভার।

সন্নাহ্ – এ তর্ফ্ হ্যায়ঁ হম্ আলম মেঁ রেখ্তে কে
জো মীর জী লগেগা তো সব হুনর করেঙ্গে

২৩৪। যখন র'ব না আমি বহু খেদ করিবে সকলে,
সমাদর পা'য় লোকে নয়নের অন্তরাল হ'লে।

পছতাওগে বহোৎ জো গয়ে হম্ জহান সে
আদম কী ক্দর হোতী হ্যায় জ্াহির জুদা হুয়ে

২৩৫। তব নাম লব যবে দুই আঁখি আসিবে ভরিয়া,
যাপিতে জীবন হেন কোথা হতে নিবে আসি হিয়া ?

জব নাম তেরা লীজিয়ে তব চশম ভর আওয়ে
ইস জিন্দগী করনে কো কহাঁ সে জিগর লাওয়ে

২৩৬। পৃথিবীর সুখে দুঃখে অনেক প্রভেদ,
একদিন ঈদে হেসে দশ দিন মহররমে খেদ।

শাদী ও গ্ম মেঁ জহাঁ কী এক সে দস কা হ্যায় ফর্ক্
ঈদ কে দিন হঁসিয়ে তো দশ দিন মুহর্রম রোইয়ে

২৩৭। মসজিদে যাও কিম্বা থাকো তুমি দেবতা মন্দিরে,
তাঁর খোঁজে এক হিয়া কোথা কোথা নেবে ফিরে ফিরে ?

হরম কো জাইয়ে ইয়া দয়ের মেঁ বসর করিয়ে
তেরী তলাশ মেঁ ইক দিল্ কিধর কিধর করিয়ে

২৩৮। কত কাল কাটে আয়ু দেখো তুমি এ আশা করলে,
লেবে তুমি তাঁর নাম আঁখি তব ভেসে যাবে জলে।

কাট হ্যায় দেখিয়ে ইয়ুঁ উমর কব তলক অপনী
কে সুনিয়ে নাম তেরা অওর চশম তর্ করিয়ে

২৩৯। হ'লে দিন বিচ্ছেদের শত তাপ সহি হবে সাঁঝ,
বিচ্ছেদ রজনী তবে ভোর হবে কি আশার মাঝ?

হুয়া হ্যায় দিন তো জুদায়ী কা সও তাব সে শাম
শবে ফিরাক. কিস উমীদ পর সহর করিয়ে।

২৪০। এখন ভুলিয়ে মোরে করিবে গো দুঃখেতে মগন,
কিন্তু যবে নাহি র'ব বহু বহু করিবে স্মরণ।

অব কর্কে ফরামোশ তো নাশাদ করোগেঁ
পর্ হম্ জো নহ্ হোঙ্গে তো বহোৎ ইয়াদ করোগে

২৪১। দেখো যদি ভালো ক'রে কবিতার শৈলী তার, তবে
হে সাহিত্য প্রেমী, মীরে গুরু তব করিবারে হবে।

গর্ দেখোগে তুম তর্জে, কলাম উস কী নজ.র কর্
অয়ে অহলে সুখ.ন মীর কো উস্তাদ করোগে

২৪২। আমিও ভ্রমেছি কাননে নসীম, কিন্তু দেখো আবার
আশিয়ার থেকে উঠতেই আমি হয়ে গেনু গ্রেপ্তার।

হম্নে ভী সয়ের কী থী চমন কী, পর্ অয়ে নসীম
উঠতে হী আশিয়াঁ সে গিরফতার হো গয়ে

২৪৩। হে ইজ্জৎ প্রেমী, আজ শিরে তাজ যার,
দেখো কাল তাজ নেই, শিরও নেই তার।

অয়ে ছুবৈব জাহ্ওয়ালো জো আজ তাজওয়র হ্যায়
কল্ উসকো দেখিও তুম নয়ে তাজ হ্যায় নহ্ সর হ্যায়

২৪৪। প্রতি পদক্ষেপে হেথা হও সাবধান,
এই ঠাঁই সবি ভাই কাচের দোকান।

হর দম ক.দম কো অপনে রখ্, হে তিয়াৎ সে ইয়াঁ
ইয়েহ্ কারগাহ্ সারী দুকানে শীশহ্গর হ্যায়

২৪৫। সেই তো বুঝিবে মর্ম শেরের আমার
মীরের মতন আছে কামাল যাহার।

সমঝে অন্দাজে শের কো মেরে
মীর কা সা অগর কমাল রখে

২৪৬। গলিপথ দিল্লীতে না ছিল, ছিল যা তা শিল্পীর বৈভব,
যাহা কিছু আসিত নজরে চিত্রকল্প ছিল তারা সব।

দিল্লী কে নহ্ থে কু.চ অওরাকে. মুসওঅর থে
জো শকল নজ.র আয়ী তসবীর নজ.র আয়ী

২৪৭ পেয়ার করার লাগি মোরে দোষ লাগাইছে ভারি,
তারে তো শুধাও কেন হইল সে এতেক পিয়ারী।

পেয়ার করনে কা জো খু.বাঁ হম পে রখতে হ্যায় গুনাহ্
উন্ সে ভী তো পূছিয়ে তুম ইতনে কিউঁ পেয়ারে হুয়ে

২৪৮। রেখতায় আমার সনে বার্তা না করিও,
আমারী জবান এ যে, হে বন্ধু হে প্রিয়।

গুফ্তগু রেখ.তে মেঁ হম সে নহ্ কর্
ইয়েহ্ হমারী জ.বান হ্যায় পেয়ারে

২৪৯। একাক্ষর অবসর আমারে না দানিল মরণ,
কত কিছু ছিল প্রাণে, হইল না কিছুই কথন।
এক হরফ কী ভী মুহলৎ হমকো নহ্ দী অজল নে
থা জী মেঁ আহ্ ক্যা ক্যা পর কুছ নহ্ কহনে পায়ে

২৫০। মন্দির উদ্দেশ নয়, নয় তা কাবায়,
তোমারে যে খোঁজে বলো যায় সে কোথায়।

নহ্ বুৎকদহ্ হ্যায় মঞ্জিলে মক.সুদ নহ্ কাবহ্
জো কোয়ী তলাশী হো তেরা আহ্ কিধর জায়ে

২৫১। তুমি তো বেচারা ফকির হে মীর, তোমার কি পরিচয়,
মিশে গেছে হেথা মৃত্তিকা সনে কত কত মহাশয়।

তূ হ্যায় বেচারহ্ গদাহ্, মীর তেরা ক্যা মজ়কুর
মিল গয়ে খাক মেঁ ইয়াঁ সাহবে অফসর কিতনে

২৫২। পকেট আর আস্তিনেতে কাঁদিবার কাজ গেল চলে,
এখন নির্যাস সব আসিতেছে চলিয়া আঁচলে।

জেব অওর আস্তীঁ সে রোনে কা কাম গুজ়রা
সারা নিচোড় অব তো দামন পে আ রহা হ্যায়

২৫৩। হিয়াকে রেখতার শের কেন নাহি করিবে মোহিত,
কলায় এ লিপিকারে করিয়াছি আমি অলঙ্কৃত।

দিল্ কিস তরহ্ নহ্ খীঁচেঁ অশআর রেখতে কে
বেহতর কিয়া হ্যায়ঁ ম্যয়ঁ নে ইস অয়েব কো হুনর্ সে

২৫৪। তোমার মসজিদ মোর শৌণ্ডিক আপণ,
হে উপদেশক, ভাগা আপন আপন।

তুঝ কো মসজিদ হ্যায় মুঝ কো ময়খানহ্
ওয়ায়েজা অপনী অপনী কিসমৎ হ্যায়

২৫৫। মীরের সমাধি পার্শ্বে সমাগত যত বিদ্বজ্জন,
চতুর্দিকে কাব্য কথা কাহিনী কথন।

তুর্বতে মীর পর হ্যায়ঁ অহলে সুখন
হর তরফ হরফ হ্যায় হিকায়েৎ হ্যায়

২৫৬। প্রতিদিন আসা পরে নাহি হয় প্রেমের নির্ভর,
একটি সাক্ষাতে চলে যতদিন থাকয়ে উমর।

রোজ় আনে পে নহীঁ নিসবৎ ইশক কী মওকুফ
উমর ভর এক মুলাকাৎ চলী জাতী হ্যায়

২৫৭। করো নাকো মর্জি তুমি খানকার নাশের,
ঠাঁই মাত্র আছে এই মুসলমানের।

খানক.হ্ কা.তূ নহ্ কর্ ক.সদ্ টুক অয়ে খা.নহ্ খ.রাব
এহী ইক রহ্ গয়ী হ্যায় বস্তী মুসলমানোঁ কী

২৫৮। জীবন ব্যপিনু আমি গজলের দ্যোতন চিন্তায়,
তাই তো হে চলিতেছি ক্রম-উচ্চে স্থাপি এ কলায়।

গয়ী উমর দর্ বন্দে ফিকরে গ.জ.ল
সো ইস্ ফন্ কো অ্যায়সা বড়া কর্ চলে

২৫৯। কি কহিব ওহে মীর কেহ যদি জিজ্ঞাসে আমায়.
এসেছিলে ধরণীতে, কি করিয়া চলিলে হেথায় ?

কহেঁ ক্যা জো পূছে কোয়ী হম সে মীর
জহাঁ মেঁ তুম আয়ে থে ক্যা কর্ চলে

২৬০। মীরের শিয়রে ওহে ধীরে কথা কও, হায়, সেতো
কেঁদে কেঁদে এই মাত্র একটুকু হল নিদ্রাগত।

সিরহানে মীর কে আহিস্তহ্ বোলো
অভী টুক রোতে রোতে সো গয়া হ্যায়

২৬১ ওহে মীর, সদা তব এত কেন মেজাজ খারাপ,
বনে নাকো পৃথ্বী সনে, নভো সনে কলহ-সন্তাপ।

ইতনী ভী বদমিজা.জী হর্ লহ.জহ্ মীর তুম কো
উলঝাও হ্যায় জ.মীঁ সে ঝগড়া হ্যায় আসমাঁ সে

২৬২। খাস লোক শের মোর ভালবাসে মনে.
বাৎচিৎ কিন্তু মোর সাধারণ সনে।

শের মেরে হ্যায়ঁ সব খে.ওয়াস পসন্দ্
পর মুঝে গুফ্তগু অওয়াম সে হ্যায়

২৬৩। কারে বলে কুফর ইসলাম মর্ম্ম আমি নাহি জানি তার,
মন্দির বা কাবা যাই হোক আমি চাই তোমার দুয়ার।

কিস কো কহ্তে হ্যায়ঁ নহীঁ ম্যাঁয় জানতা ইসলাম ও কুফর
দয়ের হো ইয়া কাবহ্ মতলব মুঝ কো তেরে দর সে হ্যায়

২৬৪। হে মীর সাহেব, তুমি সবে ছাড়ি একা একা যাও,
মনে হয় আজকাল দিল্ তব লেগেছে কোথাও।

ফিরতে হো মীর সাহব সব সে জুদে জুদে তুম
শায়েদ কহীঁ তুম্হারা দিল্ ইন্ দিনোঁ লগা হ্যায়

২৬৫। পূর্ণ কোন্ মনস্কাম যদি তুমি যাওও কাবায়,
চেষ্টালব্ধ কিবা হয় যতক্ষণ খোদা নাহি চায়?

কাবে গয়ে ক্যা কোয়ী মক্সদ কো পহুঁচতা হ্যায়
ক্যা সয়ী সে হোতা হ্যায় যব তক নহ্ খুদা চাহে

২৬৬। দারিদ্র্যেও মীর ছিল একটু রঙীন,
জাফরানী রাঙা ছিল তার কৌপীন।

ফক্র পর ভী থা মীর কে ইক রঙ্
কফনী পহনী সো জা'ফরা'নী থী

২৬৭। কাবা ও মন্দির এই উভয়েতে ডাকে বন্ধুজন,
দেখি এবে মীর তব কোন দিকে হয় হে গমন।

ইয়ারানে দয়ের ও কাবহ্ দোনোঁ বুলা রহে হ্যায়
অব দেখেঁ মীর অপনা জানা কিধর বনে হ্যায়

২৬৮ মেজাজে আমার ছেয়ে গিয়েছে হতাশা,
না আছে মরনে খেদ না জীবনে আশা।

মিজ্াজোঁ মেঁ ইয়াস আ গয়ী হ্যায় হমারে
নহ্ মরনে কা গ়ম হ্যায় নহ্ জীনে কী শাদী

২৬৯। বকলাম যবে পাগলের প্রায় সকলে পেয়ার করলো আমায়,
যেই বললাম জ্ঞানের বাণী, কি বেকুবি হলো কিছু না জানি

বাওলে সে জব তলক বকতে থে সব করতে থে প্যার
অক্ল কী বাতেঁ কিয়াঁ ক্যা হম সে নাদানী হুয়ী

২৭০। যথাশক্তি করি তো দমন কিন্তু হায় কি করিতে পারি,
মুখ থেকে হয়ই বাহির এক দুই বচন পেয়ারী।

মক.দূর তক তো জ.ব্ত্ কর্ূঁ হুঁ পে ক্যা কর্ঁ
মুহ্ঁ.সে নিকল হি জাতী হ্যায় ইক বাৎ প্যার কী

২৭১। দুর্বলতা নাহি হ'ত না হ'লে কামনা,
মোরে প্রাণে মারিয়াছে তোমার বাসনা।

জো খ.াহিশ নহ্ হোতী তো কাহিশ নহ্ হোতী
হমেঁ জী সে মারা তেরী আজু. নে

২৭২। আমিও কখনো বাগানেতে ভ্রমিতাম,
জলের প্রবাহ সম গতি চরিতাম।
প্রেম দুশমনী কখনো আপদ ছিলো,
অল্প খেদেই বিশ্বাস ত্যজিতাম।
লোকে সহজেই প্রেমের দাওয়া করে,
দিল্ রোগে খুব খাতির তো লভিতাম।
যতদিন তার ছিল চাপল্যে লাজ,
আমিও কঠোর চোখে লাজ করিতাম।
যৌবনে খুব কুফরেতে ঝুঁকেছিনু,
মসজিদে মন্দিরে খুব রহিতাম।
এবে অশান্ত হিয়াতো বসিয়ে দিলো,
প্রেমের বেদনা আগে খুব বহিতাম।
উঠে গেলে মোর তাকিয়ারে কবে মীর,
যেনগো কাহিনী ব্যথাতুর কহিতাম।

বাগ. মেঁ সয়ের কভো হম্ভী কিয়া করতে থে
রোইশে আবে রওয়াঁ ফয়লে ফিরা করতে থে
গ.য়রতে ইশ্ক. কসো ওয়ক্ত্ বলা থী হম্ কো
থোড়ী আজু. র্দগী মেঁ তর্কে ওফা করতে থে
দিল্কী বিমারী সে খ.াতির তো হমারী থী জন্ম্হ্
লোগ কুছ ইয়ূঁ হী মুহব্বৎ সে দওয়া করতে থে

জব তলক শর্ম, রহী মানহ্-এ শোখী উস কী
তব তলক হম ভী সিতম দীদহ্ হয়া করতে থে
মাবেলে কুফর জওয়ানী মেঁ বহোৎ থে হম লোগ
দহের মেঁ মসজিদোঁ মেঁ দের রহা করতে থে
অব তো বেতাবী-এ-দিল্ নে হমেঁ বিঠলা হী দিয়া
আগে রঞ্জ্ ও তাবে ইশ্ক. উঠা করতে থে
উঠ গয়ে পর মেরে তাকিয়ে কো কহেঙ্গে ইয়াঁ মীর
দর্দ্ দিল্ বয়ঠে কহানী সী কহা করতে থে

২৭৩। মজনূঁ ও ফরহাদ গেছে, শোর গোল এখন আমার,
সকলেই দিন দুই করি গেয়ে গেছে পালা আপনার।

ফর্হাদ ও কাঁস গুজ.রে অব শোর হ্যায় হমারা
হর্ কোয়ী অপনী নওবৎ দো দিন বজা গয়া হ্যায়

২৭৪। ওহে মীর, শের লেখা কিবা আর কামাল নরের,
খেয়ালের মতো এও সমাদরে এসেছে সবের।

অয়ে মীর শের কহনা ক্যা হ্যায় কমালে ইনসাঁ
ইয়েহ্ ভী খ.য়াল সা কুছ খা.তির মেঁ আ গয়া হ্যায়,

২৭৫। তুমি তো শায়ের নও, দেখিলাম তুমি জাদুকর,
দুই চার শের পড়ি মুগ্ধ করি গেছ চরাচর।

শায়র নহীঁ জো দেখা তো তূ হ্যায় কোয়ী সাহির
দো চার শের পঢ় কর্ সব-কো রঝা গয়া হ্যায়

২৭৬। ফুলের সুগন্ধ ছিল আরো ছিল বুলবুলের স্বর,
হায় কত দ্রুত শেষ হয়ে গেল আমার উমর।

বুয়ে গুল ইয়া নওয়ায়ে বুলবুল থী
উমর আফসোস ক্যা শতাব গয়ী

২৭৭। চোখের দিকে কানের দ্বারে নজর আছে কড়া,
বঁধুর আসার খবর কিছু আছে গরম করা।

আঁখোঁ কী তরফ গোশ কী দর পর দহ্‌ নজ.র হ্যায়
কুছ ইয়ার কে আনে কী মগর গরম খ.বর হ্যায়

২৭৮। ভেবেছিনু সুদ আছে প্রণয়ের কারবারে,
এবে দেখি হায় এ যে একেবারে প্রাণে মারে।

সোচে থে কে সওদা-এ মুহব্বৎ মেঁ হ্যায় কুছ সূদ
অব দেখতে হ্যায়ঁ ইস মেঁ তো জী হী কা জ.রর হ্যায়

২৭৯। প্রতিটি পংক্তিতে তব বার্তা তুমি করেছো কি মীর ?
আরো কিছু শের বলো মণিগাথা গজল শরীর।

হর্‌ বয়েৎ মেঁ ক্যা মীর তেরী বাতেঁ গঠী হ্যায়ঁ
কুছ অওর সুখ ন কর্‌ কে গ.জ.ল সিল্কে গোহর হ্যায়

২৮০। বরবাদীর কিবা ভয় কেনই বা বিপন্ন হাল ?
এক কোণে ঘর মোর, তাও যেন মাকড়সা জাল।

ক্যা খ.ানহ্‌ খ.রাবী কা হমেঁ খ.ওফ ও খ.তর হ্যায়
ঘর হ্যায় কিসো গোশে মেঁ তো মকড়ী কা সা ঘর হ্যায়

২৮১। জীবন সলিল তারেই বলে খিজির সিকন্দর যাহার লাগি দিত
আপন প্রাণ.
সেই স্রোতেরে মৃত্তিকাতে দিলাম রুদ্ধ করি, দেখছো আমি
কেমন শক্তিমান।

আবে হায়াৎ ওহী নহ্‌ জিস্‌ পর্‌ খি.জ.র ও সিকন্দর
মরতে রহে
খ.াক সে হম্‌নে ভরা ওহ্‌ চশমহ্‌ ইয়েহ্‌ ভী হমারী হিম্মৎ হ্যায়

২৮২। বাগিচার দুই পাল্লা একই ঢংয়ে ভরে,
হেথায় বসন্তে আর হোথা জলধরে।

গুলিস্তাঁ কে হ্যায় দোনোঁ পল্লে ভরে
বহার ইস তরফ উস তরফ অব্‌র্‌ হ্যায়

২৮৩। কাবার দুয়ারে বসি মীর মিয়া বকিছে কুফর,
মুসলমান তো নয়, আগুনের পূজক এ নর।

দরে কাবহ্ পর কুফর্ বকতা হ্যায় মীর
মুসলমাঁ নহী ওহ্ কহী গবর হ্যায়

২৮৪। মন্দির-অরণ্যে ভ্রমে ভ্রমিয়াছি আমি কত বার,
খিজির আসিয়া মোরে বলে যাক কি পথ কাবার।

হম দয়ের কে জঙ্গল মেঁ ভূলে ফিরে হ্যায় কব তক
কাবে কা হমেঁ রস্তহ্ খি.জ.র আ কে বতা জাওয়ে

২৮৫। প্রেমের বেদনা সে তো আনন্দ ছাড়া কিছু নয়,
এ আকাঙ্ক্ষা আছে যার মজা তারি উপলব্ধি হয়।

নহী ইশ্ক. কা দদ্ লজ্জ.ৎ সে খা.লী
জিসে জ.ওক. হ্যায় ওহ মজ.া জানতা হ্যায়

২৮৬। তুমি তো হিয়ায় থাকো, তাই তুমি জানো ভালো ক'রে
যাহা কিছু মতলব থাকে মোর হিয়ার ভিতরে।

মেরে দিল্ মেঁ রহতা হ্যায় তূ হী তভী তো
জো কুছ দিল্ কা হ্যায় মুদ্দোয়া জানতা হ্যায়

২৮৭। কাব্য প্রেমিকের মুখ সবি মোর গজলের দিকে,
শের তো অভ্যাস মোর, দেখুন তা কতদিন টিঁকে।

রুয়ে সুখ.ন সব কা হ্যায় মেরী গ.জ.ল কী তরফ
শের হ্যায় মেরা শোয়ার দেখিয়ে কব তক রহে

২৮৮। বালকের মতো বানালাম দুনিয়ায় ঘর আপনার,
যবে চাই দিয়েছি মিটায়ে, বুনিয়াদ কি আছে ধরার।

হ্যায় ঘর জহাঁ মেঁ অপনে লড়কোঁ কে সে বনায়ে
জব চাহা তব মিটায়া বুনিয়াদ ক্যা জহাঁ কী

২৮৯। হাথ 'পরে রাখি হাত বেখবর কেন বসে পড়া ?
কারোয়াঁ তো চলোন্মুখ, এখন তো চাই কিছু করা।

হাথ রখে হাথ পর, বয়ঠে হো ক্যা বে খ.বর
চলনে কো হ্ য় কারোয়াঁ, কুছ তো কিয়া চাহিয়ে

২৯০। কি করি দিল্ কে মারি কিম্বা লই শেরেই আশ্রয়.
এখনো বচন চলে. কোনো কিছু করিতে তো হয়।

ক্যা করুঁ দিল্ খুঁ করূ, শেরহী মওজুঁ করূঁ
চলতী হ্যায় অব তক জ.বাঁ, কুছ তো কিয়া চাহিয়ে

২৯১। নমাজ না হয় যদি হৃদয়ের প্রতি করো আশ,
কাল গেলে কি করিবে, কিছু করা চাই তো প্রয়াস।

হো নহ্ সকে গর্ নমাজ. দিল কী তরফ্ কর নিয়াজ.
ওয়ক্ত. গয়া ফির কহাঁ, কুছতো কিয়া চাহিয়ে

২৯২। ভেবে দেখো দুঃখে খেদে হাল মোর বাকি নাহি আর,
যাতে কিছু আশা ছিলো ধৈর্যে তাপে দিলো তারা ছাড়।
কেয়ামৎ গাঢ় হ'লো, হিয়া গেলো, গেলো দিল্ ও চাল,
দেখিলে নিবিড় চক্ষে দেখা দেবে ক্ষত সমাহার।
আঁখি মোর প্রবাহিত এত যেন সিন্ধু পৃথ্বীঘেরা,
হেথা হোথা যারা আছে বসে আছে ধরিয়া কিনার।
কেন কার তরে চিন্তা, আমি সদা বেখুদ বেহুশ,
দিল্ থেকে শক্তি গেছে, অনাগত হৃদয়ো আমার।
নাই লাভ নিবেদনে, যার তার সময় এখন,
কভু শিরে আতি অসি, কভু হৃদে ব্যথা তীক্ষ্ণধার।
কোথাকার অগ্নি ভরা ছিল হৃদে, মধ্যরাতে, খোদা,
কাঁদিনু যখন, নহে অশ্রু, সে তো ঝরিল অঙ্গার।
হামেশা তো দিনু দেখা, করিলনা কেহ সম্ভাষণ,
করিলাম এত প্রেম, মীর. হনু পাত্র তামাশার।

করো তামুল কে হাল হম মেঁ রহা নহীঁ হ্যায়, গ.মো কে মারে
জো কুছ ভরোসা জিন্হোঁ পে থা সো শকীব ও তাব ও তওয়াঁ সিধারে

হুয়ে হ্যায় গা,য়ের ক.য়ামৎ অব তো গয়ে জিগর তক গয়ে হ্যায় দিল্ তক
জো টুক ভী দেখ ওহ্, গ.ওর সে তো জরাহৎ উসকো দিখা দী সারে
হমারী আঁখে বহী হ্যায় ইতনী কে অব হ্যায় দরিয়া মুহিতে আলম
কহী কহী জো রহে হ্যায় মহ্‌রুম সো বয়ঠে হ্যায় ওয়ে কিরে কিনারে
করে তান্মুল সো কাহে পর হম মুদাম বেখু.দ হমীশহ্ গ.শ হ্যায়
গয়ী হ্যায় তাক.ৎ দিলোঁ সে শায়েদ নহীঁ হ্যায় আয়া জিগর হমারে
কভো সরোঁ পর হ্যায় তেগে. নালহ্ কভো সনানে ফর্গা,া জিগর পর
কিসো সে কহনে কা কুছ ভী হাসিল গয়ে হ্যায় জোঁ তোঁ কে ওয়ক্ত. বারে
ভরী থী আতিস কহুঁ। কী ইয়া রব দিল্ ও জিগর মেঁ কে নিস্‌য শব কো
লগা জো রোনে তো জায়ে অঁসূ মেরী মিজ.া সে গিরে শরারে
ক.বুল ইশক. ও মুহব্বৎ ইতনা হুয়া হ্যায় অয়ে মীর সয়েরে কা.বিল
মদাম জাতে দিখায়ী দুঁ হুঁ কভো নহ্ উন্‌নে কহা কে আরে

ফর্দ্

১। দিল্ গেছে বেঁচে গেছি, পেয়ে গেছি পাড়ানির কড়ি,
আমার 'পরেও হ'লো কত কিছু দু'দিনের এ জীবন ভরি।

দিল্ গয়া রুসোয়া হুয়ে আখি.র কো সওদা হো গয়া
ইস্ দো রোজ.হ জীস্ত্ মেঁ হম্ পর ভী ক্যা ক্যা হো গয়া

২। খ্যাত যদি দুনিয়ায় কিবা হ'ল তাতে, আছি ওহে আমি কোন্ ঠাঁই ?
কথা এই কেহ মোরে ত্যক্ত নাহি করে, জেনো যেন আমি আর নাই।

মশহুর হ্যায় আলম মেঁ তো ক্যা হ্যায় ভী কহীঁ হম্
অল্ কি.স্‌সহ্ নহ্ দর পে হো হমারে কে নহীঁ হম

৩। চলে যাও হে নসীম, মোর কাছে থ.কো নাকো আর,
রয়ে গেছি আমি যেন নেভা এক প্রদীপ আঁধার।

বস্ নহ. লগ্ চল. নসীম মুঝসে কে মায়
রহ্ গয়া হুঁ চিরাগ্ সা বুঝ কর.

রুবাঈ

১। মন্দির থেকে হৃদয় আপন উঠানো গেলো না হায়,
কাবার দিকেতে মেজাজ আপন লওয়া তো গেলো না হায় ;
রীতি নীতি কতো মসাজদে আছে বিপ্র কি জানে তার,
সারাটি জীবন হেথা মোর আসা যাওয়া তো হলো না হায়।

বুৎখানে সে দিল্ অপনে উঠায়ে নহ্ গয়ে
কাবে কী তরফ মিজাজ লায়ে নহ্ গয়ে
তওরে মসজিদ কো বর্হমন ক্যা জানে
ইয়াঁ মুদ্দতে উমর মেঁ হম আয়ে নহ্ গয়ে

২। হৃদয় যাদের ঠিক তাদেরি স্বপ্ন আসে,
আরাম আসে স্ফূর্তি আসে স্বপ্ন আসে।
দুঃখী আমি, দিনের তরে কাঁদবো কি আর ?
স্বপ্ন আমার পালায় যখন রাত্রি আসে।

দিল্ জিনকে বজা হ্যায়ঁ উন কো আতী হ্যায় খাব
আরাম খুশ আতা হ্যায় সহাতী হ্যায় খাব
ম্যায়ঁ গম্জদহ ক্যা অপনে দিনোঁ কো রোউঁ
মেরা তো জহাঁ শব হুয়ী জাতী হ্যায় খাব

৩। মীরকে আমি বলি ওহে কেঁদো নাকো তুমি,
হেসে খেলে একটু সুখে ঘুমিয়ে নাও তুমি।
ঐ সে মোতী পাওয়ার তো নয় অনেক ভারি দামী,
দুঃখে খেদে প্রাণকে বৃথাই খুইও নাকো তুমি।

হম মীর সে কহতে হ্যায় নহ্ তূ রোয়া কর্
হঁস খেল কে টুক্ চয়েন সে ভী সোয়া কর্
পায়া নহীঁ জানে কা ওহ্ দুরে নায়াব
কুঢ় কুঢ় কে অবস জান কো মৎ খোয়া কর্

৪। দেখো তুমি দাস্য করি হয়ে গেছ পীর,
শোনো কথা, ফলহীন এসব ফিকর ;
তসবীহ্ বা মালা জপি কি হইবে কাজ
গুটির মতন দিল্ না ফেরালে মীর ?

হুর্ চন্দ্ কে তায়ৎ মেঁ হুয়া হ্যায় তূ পীর
পর্ বাৎ মেরী খুন্ কে নহী হ্যায় তাসীর
তসবীহ্ বকফ্ ফিরনে সে ক্যা কাম চলে
মনকে কী তর্হ দিল্ নহ্ ফিরে জব তক মীর

৫। স্বপ্নের মতো মীর এসব মিলন,
কাল হলে উঠে যাবে সভাসীন জন ;
চোখ কি খুলেছ, খোলো একটু তো কান,
পলকে মজলিস যেন কাহিনী কথন।

কুছ খ়াব সী হ্যায় মীর ইয়েহ্ সুহবৎদারী
উঠ জায়েঙ্গে ইয়েহ্ বয়ঠে হুয়ে এক বারী
ক্যা আঁখোঁ কো খোলা হ্যায় তনিক গোশ কো খোল্
অফ্সানহ্ হ্যায় পল মারতে মজলিস সারী

৬। তার সনে মেলো মেশো যে হয় আদম,
আপন উৎকর্ষে যার গর্ব খুব কম ;
লেখায় গরম হলে পাশে রবে সব,
নীরব রহিলে হবে নিজেই আলম।

মিলিয়ে উস্ শখ়্ছ সে জো আদম হোয়ে
নাজ় উসকো কমাল পর বহুৎ কম হোয়ে
হো গরমে সুখ়ন তো গির্দ্ আওয়ে এক খ়লক়
খ়ামোশ রহে তো এক আলম হোয়ে

৭। প্রতিটি প্রভাত দুঃখে করিয়াছি শাম,
পুত রক্ত সদা পান করিয়াছিলাম ;
এই স্বল্প কালে যারে বয়স বলে
মরে মরে কামনারে শেষ করিলাম।

হর্ সুব্হ গ়মোঁ মেঁ শাম কী হ্যায় হম্ নে
খূঁ নাবহ্কশী মদাম কী হ্যায় হম্ নে
ইয়েহ্ মুহলতে কম কে জিস কো কহতে হ্যায় উমর
মর্ মর্ কে গ়রজ় তমাম কী হ্যায় হম্ নে

৮। র'বে চুপ মীর মনে না দাও স্থানো,
বোল চাল দাও. কথা আমার মানো ;
যাওয়ার বেলায় একো চলবে না বোল.
বচন যে চলে তাই অনেক জানো।

চুপকে রহনা নহ্, মীর দিল্ মেঁ ঠানো
বোলো চালো কহা হমারা মানো।
ইক হর্ফ্ নহ্, কহ সকোগে ওয়ক্তে., রফতন
চলনে কো জ.বান কে গ.নীমৎ জানো।

৯। বন্ধুজন সনে মোর বনে নাকো আর ;
যে দিন দুনিয়া আমি কব্বি যাবো পার,
সে দিন সকলে সাফ জানিবে এ কথা
এ সভা উজ্জল ছিল স্থিতিতে আমার।

ইয়ারোঁ কো কদূরতেঁ হ্যায় অব তো হম সে
জিস রোজ. কে হম জায়েঙ্গে ইস আলম সে
উস রোজ. খুলেগী সাফ সব পর ইয়েহ্ বাত
ইস বজ.ম্ কী রওনক. থী হমারী দম সে

১০। হে দিল্, তোমার খেদ রয়েছে নিশ্চয়
কভু কম হবে কি না তব খাদ্য ভয় ;
দিয়েছে তোমারে খাদ্য আজ খোদা, ফের
দেবে কালও যদি কাল প্রাণ তব রয়।

তেরা অয়ে দিল্ ইয়েহ্ গ.ম ফরো ভী হোগা
অন্দেশহ্-এ-রিজ.ক.্ কম কভো ভী হোগা
খানেকো দিয়া হ্যায় আজ হক.নে তুঝ কো
কল ভী দেওয়েগা কল জো তূ ভী হোগা।

১১। খেদের তাহার কোনো ধ্বনি নাহি শুনি,
কখনো তাহার কোনো কাহিনী না শুনি ;
মীর ধীর কৃতজ্ঞ আজব ফকির,
আমি তো কখনো তার নালিশ না শুনি।

রঞ্জিশ কী কোয়ী উসকী রাওয়ায়েৎ নহ্ সুনী
যে সব্ ফহ্ কসো ওয়ক্ত্ হিকায়েৎ নহ্ সুনী
থা মীর অজব ফকীর সাবির শাকির
হম নে উস সে কভো শিকায়েৎ নহ সুনী

মুস্তজ়াদ

দিল্লীতে বড়ই শক্ত এবে দিন চলা, দিল্ হোক কঠিন,
না রহিল লজ্জা আশা গবে কিছু বলা, হনু মামহীন।
বন্ধু কেহ নাহি যার আছে মানবতা, গৃহ ও উজাড়,
চোখের সম্মুখে সাফ ময়দান চলা, সময় সঙ্গীন।

দিল্লী মেঁ বহোৎ সখ্ৎ কী অব কে গুজ়রান দিল্ কো কর্ সঙ্গ্
গ়য়রৎ নহ্ রহী আক়বৎকার নহ্ শাম খাঁচা ইয়েহ্ নঙ্গ্
ইয়ারো মেঁ নহ্ থা কায়ী মুরওয়ৎ জো করে উজড়ে থে ঘর
তা মদ্দে নজ়র সাফ পড়ে থে ময়দান অস্র্ থা তঙ্গ্

মুখ্ম্মস

খুঁজিয়া শহর থেকে মোরে হেথা নিয়ে এল, ধন্যবাদ তার,
আসিয়া হেথায় মোর দিন চলা হ'লো এক আজব ব্যাপার।
কারো কাছে যাচ্ঞা করি পিনু পানী, পিনু আমি যত পেয় আর ;
হায় হায় এর আগে আবির্ভূত হতো যদি মরণ আমার,
সুনিশ্চিত পন্থা মোর তবে হ'তো দৈন্যে মান রক্ষা পাওয়ার।

করিলাম বহুদিন যাহাদের সঙ্গ আমি, হেরি মন্দ হাল,
জানিয়া বুঝিয়া তা'রা সকলেই করে দিলো মোরে পয়মাল,
অবশেষে মোর আর তাহাদের মাঝে খেদ জন্মিল ভয়াল,
সহনীয় এ জীবন হ'লো হায় যেন মোর প্রাণের উবাল,
এই জন-সমাহারে কাহাকেও নাহি পেনু সহায় ইয়ার।

যাওয়া যেথা নাহি ছিল শতবার সেই ঠাঁই করিনু গমন,
শরীর দুর্বল মোর, তবু সেথা গেনু লয়ে হস্ত প্রকম্পন,
দারিদ্র্যের নিপীড়নে যেতে হ'লো, কাজ মোর রুটির মাগন,
নাচার গেলাম সেথা, নাহি ছিল কোনো মোর উপায় তখন,
আমি তো দুর্ব্বল প্রাণ, আমার কি শক্তি আছে সবুর করার !

প্রতিটি নীচের দ্বারে ফিরিলাম করি আমি খোশামোদ কতো,
কতো কতো আযাগোর সঙ্গ কার করিলাম যোগ্যতারে হত,
হায় হায় অকারণ মর্যাদার গর্ব মোর হলো অবনত,
সকলে এমনি মোরে ফিরাইল শক্তি মোর হ'লো অপগত,
এ শহরে খ্যাতি মান ছিল, এবে মূল্য মোর বাঁকি নাহি আর।

আগাগোড়া এ আমার নস্ট দিল্, কিবা আর করি নিরমান,
বানাইব কিবা আমি, হায় হায় হাল মোর হ'লো পরেশান,
রক্ত ঝরা দু' আঁখির হায় হায় কিবা আমি করি ব্যখ্যান,
কি আর লিখিব আমি, হরিদ্রাভ হলো হায় আমার বয়ান,
এনু যবে বাগে শুরু পাতা ঝরা, অবসান হ'লো যে বাহার।

এখন তো হাল এই দুঃখ খেদ নাহি আর ছাড়ে মোর লাগ,
অন্তরের জ্বলনেতে জ্বলিতেছে দিল্ মোর যেমন চিরাগ,
সারা মোর বক্ষস্থল দীর্ণ এবে সারা মোর দিল্-এ ভরা দাগ,
শহরের যত সত মজলিসে নাম মোর মীর বে-দিমাগ,
শেষ বেশ হলো এই মোর নাম বে-দিমাগ পাইল প্রচার।

(সংক্ষেপিত)

শুকর মেঁ মুঝ কো শহর সে লায়া পে তলাশ
ইয়াঁ আকে গুজরী মেরী অজব তওর সে মাশ

পানী কিসোসে মাঁগ পিয়া যায় কিসোসে আশ
ইস ওয়াক.যে সে আগে অজল পহুঁচী হোতী কাশ
নামোস রহতী ফক.র কী, জাতা বা এতবার

মুদ্দৎ রহা থা সাথ জিন্হোঁ কে খ.রাব হাল
দানিস্তহ্ উন সভোঁ নে কিয়া মুঝ কো পায়েমাল
আখি.র কো আয়া মুঝ মেঁ উন্হোঁ মেঁ নিপট মলাল
ইয়েহ্ জি.ন্দগী সহল হুঈ জান কী ওবাল
ইস জমহ্ মেঁ কিসো কো নহ্ পায়া ম্যয়ঁ দস্ত্ইয়ার্

জানা জহাঁ নহ্ থা মুঝে সও বার ওয়াঁ গয়া
জু.য়াফে কে.ায়া সে দস্ত্ বদিওয়ার ওয়াঁ গয়া
মুহ্তাজ হোকে নাঁ কা তলবগার ওয়াঁ গয়া
চারহ্ নহ্ দেখা মুজ.তর ও নাচার ওয়াঁ গয়া
ইস জানে নাতোয়াঁ পে ক্যা সবর এখ.তয়ার

দরপর হর ইক দনী কে সমাজৎ মেরী গয়ী
নালায়েকে.া সে মিলতে লিয়াক.ৎ মেরী গয়ী
ক্যা মুফ.ৎ হায়ে শানে শরাফৎ মেরী গয়ী
অ্যায়সা ফিরায়া উন্নে কে তাক.ৎ মেরী গয়ী
মশহূরে শহর অবহূঁ সবকসার ও বে ওক.ার

দিল্ সর্বসর খ.রাব হ্যায় তামীর ক্যা করূঁ
আশুফ্তগী-এ-হাল কী তামীর ক্যা করূঁ
খূ নাব হায়ে চশম্ কী তক.রীর ক্যা করূঁ
জ.র্দী-এ রঙ্ চেহ্রহ্ কী তহরীর ক্যা করূঁ
আয়া জো ম্যয়ঁ চমন মেঁ খি.জ.াঁ হো গয়ী বহার

হালৎ তো ইয়েহ্ কে মুঝ কো গ.মোঁ সে নহীঁ ফিরাগ.
দিল্ সোজি.শ-এ-দুরুনী সে জলতা হ্যায় জোঁ চিরাগ.
সীনহ্ তমাম চাক হ্যায় সারা জিগর হ্যায় দাগ.
হ্যায় নাম মজলিসোঁ মেঁ মেরা মীর বে দিমাগ্
অজ. বস: কে বে দিমাগী নে পায়া হ্যায় ইশ্তহার

মসনোবী

ঘরের হাল

কি আর কহিব মীর স্বগৃহের হাল,
ঘরের খারাপে আমি হনু পয়মাল।
গলির ঢেউয়েতে কিবা আঙ্গিনার দশা,
ঘর যেন জল 'পরে বুদ্বুদ বসা।
চারটি দেওয়াল, তারা বাঁকা শত ঠাঁই,
জল হলে কম তবে আমরা শুকাই।
লেগে লেগে নোনা গেছে ঝরে ঝরে মাটি,
হায়রে জীবন কতো বেসহায় কাটি।
থামিবে কি জল, ছাত চালুনি সমান,
ছাতলগ্ন আছে সদা উভয় নয়ান।
এই এ ব্যাধির কিবা করিবে ইলাজ,
ছাই দিয়ে হবে কতো খাদ ভরা কাজ।
প্রাণ নাহি চায় বসে থাকি ছাদ তলে,
তামাম মহল বন্দি হয়ে আছে জলে।
দিনরাত ছাতে যেন হয়ে আছে ঝাড়,
পাতার সমান চার ঘরের দিওয়ার।
চলিলে বাতাস তারা কাঁপে থর থর,
কেমনে তাদের 'পরে রাখিবে চাদর?
কোনো ঠাঁই ছিদ্র আছে, ফাটা কোনো ঠাঁই,
ঝরে ঝরে মাটি কোথা হ'য়ে আছে ঢাই।
কোথাও খুঁড়েছে মাটি খেঁড়েরা, কোথাও
নেংটিরা বা'র করে রেখেছে মাথাও।
কোনো ঠাঁই রহিয়াছে ছুঁচোদের ঘর,
প্রতিটি কোনায় গোল করিছে মচ্ছর।
কোণাগুলি ভেঙ্গে গেছে, ফুটো সব তাক,
পাথর আপন স্থানে হয়ে আছে ফাঁক।

কোথাও খসিছে ইঁট চুন কোনো খান,
এই এ ঠাঁইয়েতে ঘুরে ফিরিছে পরাণ।
আকার তো নিজ নিজ, খোদার তা দান,
এক এক ডাঁস হেথা মাছির সমান।
এ স্থানের আগে আছে একটি মহল,
সেথা এই নিন্দিতের থাকিবার স্থল।
কড়ি তক্তা সব তার ধোঁয়ায় মলিন,
ছাতে তার দৃষ্টি লগ্ন বিচ্ছেদ বিহীন।
ঘর থেকে তক্তা কোনো পড়িয়াছে টুটে,
কোনো খানে ডাসা এক রহিয়াছে ছুটে।
সদা মনে চাপা পড়ে মরিবার ডর,
ঘর কোথা, এতো সাফ মরণের ঘর।
দরজার আগে পড়ি' ইঁট মাটি স্তূপ,
ধীরেতে দেওয়াল ভেঙে পড়ে ঝাপঝুপ।
শ্রাবণ কেমনে কাটি বলো এইবার,
কম্পিত ভ্রমর যেন কাঁপে দিওয়ার।
কিবা আর বলি, হলো হাল যে এমন,
বড়ই দুর্ভর হলো জীবন যাপন।
ঘরেতে রহিলে দ্বার বন্ধ করে রাখি,
আমি যদি ঘরে নাই, কি কদর বাকি!
ঘর যে কেমন বলা হল সে বারতা,
এ শহর জানে মোর দুর্দশার কথা।
জিজ্ঞাসিবে যারে সেই ক্রুদ্ধ তোমা ক'বে,
এটিই খারাপ সারা মহল্লায় হবে।
এ দিল্লী শহরে আছে একটি ছপ্পর,
তুলনা যাহার শেখ চিল্লীর কবর।
হেথা যদি জল পড়ে হোথা তুমি সরো,
হেথা যদি ভেজে তবে হোথা হও জড়ো।

কোথাও সানকি মাথা পেয়ালা কোথাও,
হাঁড়ির টুকরো আনি কোথাও বসাও।
খারাপ রংয়ের জল কোনো খানে পড়ে,
কাপড় চোপড় মোর কতো রং ধরে।
খেলিয়াছি হোলি বুঝি কেউ মনে জানে,
খুলেছে বাহার কেউ বোঝে অনুমানে।
করিয়াছে ছারপোকা কালো খাটিয়ায়,
স্বস্তি নাহিকো কভু রাতের শোয়ায়।
পতঙ্গ কীট আছে মাকড়সা আর,
সন্ধ্যা হতেই সরে ভোজনে তৈয়ার।
দু'দিকেই রহিয়াছে কুকুরের পথ,
হায়, যদি বনে হ'তো আমার বসত!
দলে দলে আসে তারা দলে দলে যায়,
দলে দলে চীৎকারে যেন মাথা খায়।
ইট ও পাথর ছিলো আর ছিলো মাটি,
মাটিতে মিশিয়া গেলো প্রকোষ্ঠ বাটি।
এখন সেথাই মোর দীনহীন ঘর,
দীনহীন আমি করি সেথায় বসর।
দিনে কড়া রোদ রাতে হিমের পতন,
শত ক্রোশ হেথা হ'তে স্বস্তির স্বপন।
সংক্ষেপে কথা এই, দিনটি খোয়াই,
রাত্রিটি আপনার ঘরেই গোয়াই।
ঘর বা দোরের কিছু নাহি পরিণাম,
এ আবার ঘর কোথা? এতো শুধু নাম।

(সংক্ষেপিত)

ক্যা লিখুঁ মীর অপনে ঘর কা হাল
ইস খ.রাবে মেঁ ম্যয় হুয়া পামাল
কোচহ্-এ মওজ সে হ্যায় আঙ্গন তঙ্গ্
কোঠরী কে হেবাব কে সে ঢঙ্গ্

চার দিওয়ারী সও জগহ্ সে খ.ম
ভর তনিক হো তো সুখতে হ্যাঁ হম
লুনী লগ্ লগ্ কে ঝড়তী হ্যায় মাটী
আহ্ ক্যা উমর্ বে মজ্.হ্ কাটী
ক্যা থমে মেঁহ্ সক.ফ্ ছলনী তমাম
ছৎ সে আঁখেঁ লগী রহে হ্যায়ঁ মদাম
ইস চকশ কা ইলাজ ক্যা করিয়ে
খাথ্ সে কব্ তলক্ গঢ়ে ভরিয়ে
জা নহীঁ বয়েঠনে কো মেহ্ঁকে নীচ
হ্যায় চকশ সে তমাম অ্যাওরাঁ পীচ
ঝাড় বান্ধা হ্যায় মেঁহ্ নে দিন রাৎ
ঘর কী দিওয়ারেঁ হেন্সী জায়সে পাৎ
বাও মেঁ কাঁপতে হ্যায়ঁ জো থর থর
উন পে রদ্দা রখে কোয়ী কেওঁ কর.
কহীঁ সুরাখ. হ্যায় কহীঁ হ্যায় চাক
কহীঁ ঝড় ঝড় কে ঢেড় সী হ্যায় খ.াক
কহীঁ মূসোঁ নে খোদ ডালা হ্যায়
কহীঁ চূহে নে সর নিকালা হ্যায়
কহীঁ ঘর হ্যায় কসো ছুছুন্দর কা
শোর হর কোনে মেঁ হ্যায় মচ্ছর কা
কোনে টুটে হ্যাঁয় তাক. ফুটে হ্যায়ঁ
পথর অপনী জগহ্ সে ছুটে হ্যায়ঁ
ঈঁট চুনা কহীঁ সে গিরতা হ্যায়
জী ইসী হুজরে হী মেঁ ফিরতা হ্যায়
পয়েকর অপনী খু.দা নে রখথী হ্যায়
ডাঁস এক এক জ্যারসী মখ্খী হ্যায়
আগে ইস হুজ.রে কে হ্যায় এক অ্যাওয়াঁ
ওহী ইস নজ্ খস্ক. ক্যা হ্যায় মকাঁ

কড়ী তখ.তে সভী ধূঁয়েঁ সে সিয়াহ.
উস কী ছৎ কী তরফ হমীশহ. নিগাহ.
কোয়ী তখ.তহ. মকান সে টূটা হ্যায়
কোয়ী দাসহ. মকান সে ছূটা হ্যায়
দব. কে মরনা হমীশহ. মদ্দে নজ.র
ঘর কহা সাফ মওৎ হী কা ঘর
ঈঁট মিট্টিকা দর কে আগে ঢের
গিরতী জাতী হ্যায় হোলে হোলে মণ্ডের
কেওঁ কে সাওন কটেগা অব কী বার
থরথরাওয়ে ভঁভেরী সী দিওয়ার
হো গয়া হ্যায় জো ইত্তফাক. অ্যায়সা
শাক. গুজ.রে হ্যায় ক্যা কহূঁ ক্যায়সা
বন্দ. রখতা হূঁ দর. জো ঘর মেঁ রহূঁ
ক.দর ক্যা ঘর কী জব কে ম্যয়ঁ হী নহ. হূঁ
ঘর ভী ফির অ্যায়সা জ্যায়সা হ্যায় মজ.কুর
হ্যায় খ.রাবী সে শহর মেঁ মশ.হুর
জিসসে পূছো উসে বতাওয়ে শতাব
সারী বস্তী মেঁ হ্যায় ইয়েহী তো খ.রাব
এক ছপ্পর হ্যায় শহর দিল্লী কা
জ্যায়সে ঘোজ.হ. হো শেখ. চিল্লীকা
ওয়াঁপে টপকা তো ইয়াঁ সরক ব্যয়ঠা
ইঁয়া জো ভীগা তো ওয়াঁ তনিক ব্যয়ঠা
কহীঁ সহনক. রখূঁ কহীঁ পেয়ালা
কহীঁ হাণ্ডী কে ঠেকরে লা লা
বস কে বদ রঙ্গ টপকে হ্যায় পানী
কপড়ে রহতে হ্যায় মেরে অফ.শানী
কোয়ী জানে কে হোলী খেলা হূঁ
কোয়ী সমঝে হ্যায় ইয়েহ. কে খয়লা হূঁ

খটমলোঁ সে সিয়াহ্ হ্যায় সো ভী
চয়েন পড়তা নহীঁ হ্যায় শব কো ভ
কীড়া ইক এক ফির মকোড়া হ্যায়
সাঁঝ সে খানে হী কো দওড়া হ্যায়
দো তরফ সে থা কুত্তোঁ কা রস্তা
কাশ জঙ্গল মেঁ জাকে ম্যায় বসতা
চার জাতে হ্যায় চার আতে হ্যায়
চার অফ অফ সে মগজ খাতে হ্যায়
ঈঁট পত্থর থে মিট্টি থী এক সর
খাক মেঁ মিল গয়া থা ঘর কা ঘর
অব ওহী ঘর হ্যায় বে সর ও সামাহ্
অওর ম্যায় হুঁ ওহী ফরোমায়াহ
দিন কো হ্যায় ধূপ রাত কো হ্যায় ওস
খাবে রাহৎ হ্যায় ইয়াঁ সে সও সও কোস
কিসমত কে তহ্ দিন অপনে খোতা হুঁ
রাত কে ওক্ত ঘর মে হোতা হুঁ
নহ্ অসর বাম কা নহ্ কুছ দর কা
ঘর হ্যায় কাহেকা নাম হ্যায় ঘর কা

টীকা

(জীবন)

মীরের পরিবারের ভারতে আগমন—সম্ভবত মীরের প্রপিতামহ অকবরাবাদে (আগ্রায়) বসতি স্থাপন করেন। মীরের জন্ম কালের হিসাবে তিনি ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আগ্রায় আসেন। আরব থেকে প্রধানত দক্ষিণ ভারতের কেরালায় আরবরা আসত। মনে হয় মীরের পরিবারও কেরালায়ই এসেছিল। সেখান থেকে গুজরাত হয়ে আগ্রায় আসতে এই পরিবারের দীর্ঘকাল লাগার কথা নয়। এই হিসাবে সম্ভবত ১৭শ শতাব্দীর প্রথমে মীরের পরিবার ভারতে এসেছিল। মীরের জন্ম—মীরের মৃত্যু তারিখ (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮১০ :) সম্বন্ধে মতভেদ নেই, কিন্তু জন্ম তারিখ সম্বন্ধে আছে। ডঃ সৈয়দ মহীউদ্দীন কাদরী জোর তাঁর উর্দূ সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মীরের জন্ম সাল ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ লিখেছেন। শ্রীঈশকুমার তাঁর ইংরাজি গ্রন্থ মীর তকী মীর-এ লিখেছেন ১৭১২ খ্রীস্টাব্দ। ডঃ অব্দুল হক তৎ—সম্পাদিত উর্দূ গ্রন্থ 'মীরের নির্বাচিত রচনায়' মীরের জন্ম তারিখের উল্লেখ করেন নি কিন্তু তিনি লিখেছেন যে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মীর যখন লক্ষ্ণৌ যান তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট বৎসর। এই হিসাবে মীরের জন্ম হয়েছিল ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে। জিকরে মীর' গ্রন্থের ভূমিকায় অবশ্য তিনি মীরের জন্ম সাল ১১৩৭ হিজরী বলে নির্দেশ করেছেন। ড: সৈয়দ অবদুল্লাহ্ তাঁর উর্দূ গ্রন্থ 'নকদে মীর'-এ এই সাল সমর্থন করেছেন এবং জানিয়েছেন যে মৌলানা অব্দুল বারীর গণনায় মীরের হিজরী জন্ম সালে এক বছরের তফাৎ আছে। ইসলামী চান্দ্রমাস গণনায় বৎসরের দিনগুলি সরে সরে যায়। একন্য খ্রীষ্টাব্দ ও হিজরী এই দুটি সালের মধ্যে পার্থক্য বরাবর এক থাকে না। হজরৎ মুহম্মদ যখন ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মারা যান তখন সেটা ছিল ১১ হিজরী, অর্থাৎ উভয় সালের মধ্যে তখন পার্থক্য ছিল ৬২১ বৎসর। ডঃ অব্দুল হকের পূর্বোক্ত গ্রন্থে হিজরী সনের খ্রীস্টাব্দে পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ আছে। সেখানে এই পার্থক্য বিভিন্ন রকম দেখানো আছে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন এবং দিল্লীর কাছে

কর্ণালে মোগল বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তিনি দিল্লী লুণ্ঠন করেছিলেন। এই সালটিকে ডঃ হক ১১৫১ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে এক্ষেত্রে উভয় সালের মধ্যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে ৫৮৮ বৎসর। মীরের লক্ষ্ণৌ গমনের সাল ডঃ হক, ১১৯৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে এর খ্রীষ্টাব্দটিও ১৭৮২ লিখেছেন। এক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য ৫৮৫ বৎসর। আবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন গিলক্রাইষ্টের নির্দেশে মির্জা আলী লুৎফ যে বছর আলী ইব্রাহিমের ফার্সী গ্রন্থ গুলজারে ইব্রাহিমের 'গুলশনে হিন্দ' নামে উর্দু অনুবাদ করেন প্রকাশ সেই বৎসরটি ১২২৫ হিজরী বলে উল্লেখ করে ডঃ হক তার খ্রীষ্টাব্দটি ১৮০১ বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য ৫৭৬ বৎসর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হজরত মুহম্মদের মৃত্যুকালে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যেখানে ছিল ৬২১ বৎসর সেখানে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিজরী ও খ্রীস্টাব্দে তফাৎ ছিল ৫৮৮ বৎসর ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে এই তফাৎ কমে দাঁড়িয়েছে ৫৮৫ বৎসর। আবার ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে এই পার্থক্য আরো কমে হয়েছে ৫৭৬ বৎসর। পার্থক্য ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তনের হারও একরকম নয়। ১৭৩৯-৮২ অর্থাৎ ৪৩ বৎসরে পার্থক্য মাত্র তিন বৎসর, কিন্তু ১৭৮২-১৮০১ অর্থাৎ ১৯ বৎসরে পার্থক্য ন' বৎসর। হিজরীকে সঠিকভাবে খ্রীস্টাব্দে রূপান্তরিত করা বেশ দক্ষতা সাপেক্ষ।

যে ক'টি ফার্সী গ্রন্থে মীরের জীবন কথার উপাদান লিপিবদ্ধ আছে, ইসলামী রীতি অনুযায়ী তাতে সর্ব্বদা হিজরী সালের উল্লেখ আছে। মীরের সময়ে দিল্লী অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি জেনারেল লেক কর্তৃক দিল্লীর সম্রাট ২য় শাহ আলমের প্রধান সেনাপতি ও রিজেন্ট দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনাপ্রধান পেরোঁকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে আলিগড়ের নিকটবর্তী কৈল-এর যুদ্ধে ও সেপ্টেম্বরে আলিগড়ের যুদ্ধে এবং পেরোঁর অধীনস্থ ফরাসী সেনাপতি বুর্কুইয়েনকে দিল্লীর নিকটবর্তী পটপারগঞ্জের যুদ্ধে পরাজয়ের পর এ অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা হয় এবং হিজরীর স্থলে খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ শুরু হয়। মির্জা গালিবের সময়ে (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রীঃ) দিল্লী অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং হিজরীকে

অপসৃত করে খ্রীষ্টাব্দ স্থান করে নিয়েছে। গালিবের চিঠিপত্র তাই খ্রীস্টাব্দ, এমন কি খ্রীস্ট মাসের উল্লেখ হিজরীর তুলনায় বেশি।

এক্তমাদুদ্দৌল্লাহ্ কমরুদ্দীন খাঁ—শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকারের মতে ইনি দীর্ঘকাল উজীরত্ব করলেও অত্যন্ত অকর্মণ্য ছিলেন। আচার্য যদুনাথ এ কালের দিল্লীর উজীরদের মধ্যে অহমদ শাহ্-র উজীর গাজীউদ্দীন ইমাদুল্ মুল্ক্-কেই সর্বাধিক অপদার্থ বলেছেন।

দৈনিক একটাকা ভাতা—১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক এক টাকা ভাতা কম ছিল না। অর্ধশতাব্দী পরে সম্রাট ২য় শাহ্ আলম প্রাক্তন সম্রাটদের পুত্রপৌত্রদের দৈনিক এক টাকা হারে ভাতা দিতেন। এ সময়ে দিল্লী যখন শত্রু সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত বা অবরুদ্ধ হ'ত এবং বাইরে থেকে দিল্লীতে খাদ্য শস্য আসা বন্ধ হ'ত তখন দিল্লীর বাজারে টাকায় দু' সের করে খাদ্য শস্য বিক্রি হ'ত। সাধারণ সময়ে নিশ্চয়ই এর দু'তিন গুণ খাদ্য শস্য এক টাকায় পাওয়া যেত। এক শ' বছর পরে মির্জা গালিব দিল্লী শহরেই দৈনিক হিসাবে দু'টাকা (মাসিক ৬২.৫০ টাকা) ভাতায় অসুবিধা হলেও উত্তম মদ্যপান এবং স্টাইলে জীবনযাপন চালিয়ে যেতে পারতেন। মীর দিল্লী এলেন—মীর যখন দ্বিতীয় বার দিল্লী আসেন সেটা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ। ডঃ হক বলেছেন যে মীরের বয়স তখন ১৫ বছর। কিন্তু তৎপ্রদত্ত পূর্বোক্ত হিসাবে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মীরের জন্ম হলে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স ১৭ বৎসর হয়।

কবি সাহিত্যিক কেউ মারা যাননি—দিল্লীর উপর দিয়ে এত যুদ্ধ বিগ্রহ ও দুর্দৈব গেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দিল্লীর কোনো কবি-সাহিত্যিক এতে মারা যাননি। কেবলমাত্র ১৮৫৭-র মহাঅভ্যুত্থানে ইমাম বখশ সহবায়ী মারা যান। ইনি দিল্লী কলেজের অধ্যাপক এবং উর্দু গদ্যের লেখক ছিলেন। কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করেন—এ সময়ে গ্রন্থসকল সম্ভবত হস্তলিখিত ছিল এবং সেজন্য সহজলভ্য ছিলনা। গ্রন্থগুলিও আরবী-ফারসী হওয়ার কথা, কেননা তখন পাঠযোগ্য উর্দু গ্রন্থ বিশেষ ছিলনা এবং বিশেষ করে শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানগণ আরবী ফারসীই অধ্যয়ন করতেন। মীরের সময়ে এদেশে উর্দু মুদ্রণ প্রচলিত হয়েছিল

কিনা সন্দেহ। মীর যখন লক্ষ্ণৌ যান (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে) তখন মুসায়রায় আগত শ্রোতারা মীরের শেরগুলি লিখে বা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। অবশ্য মীরের শেরের উৎকর্ষজনিত তাৎক্ষণিক আবেদনও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই এদেশে ফার্সী মুদ্রণ শুরু হয়, কেননা ঐ বৎসরে রাজা রামমোহন রায় তাঁর ফার্সী পত্রিকা মির-আৎ-উল অখ,বার প্রকাশ করেন। (কথাটির অর্থ সংবাদ বা সমাচার দর্পণ। সমাচার দর্পণ নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যশুয়া মার্শম্যানের সম্পাদকতায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। রামমোহন মির-আৎ-উল অখ.বারের নামকরণে এই নাম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

রামমোহন রায়ের মির-আৎ-উল অখ,বারই প্রথম ফার্সী সংবাদপত্র, ছাপা হয়েছিল কলকাতা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রথম ফার্সী সংবাদপত্রের ন্যায় প্রথম হিন্দী সংবাদপত্রও কলকাতায় প্রকাশিত হয়। হিন্দীর এই প্রথম সংবাদপত্রের নাম উদন্ত মার্তণ্ড, প্রকাশিত হয় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। পরে কলকাতায়ই ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আর একটি বিখ্যাত হিন্দী সংবাদ পত্র প্রজামিত্র। হিন্দীর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র সমাচারসুধাবর্ষণও কলকাতায়ই প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন এক বাঙালী, নাম শ্যামসুন্দর সেন। ফার্সী ও হিন্দীর ন্যায় উর্দুর প্রথম সংবাদপত্র ও এই শহরেই প্রকাশিত হয় ১৮২২-এর মার্চে। স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন এক বাঙালী, হরিহর দত্ত। সংবাদপত্রটির নাম জামে জহাঁনুমা (অর্থ, যে পেয়ালায় পৃথিবীকে দেখা যায়)। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কিন্তু এই শহরে প্রকাশিত হয় নি। তা প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। দু'টি সংবাদপত্র তাঁরা প্রকাশ করেন—পূর্বোক্ত সমাচারদর্পণ ও দিগদর্শন। দেশী ভাষায় সর্বপ্রথম বাংলায়ই সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর হয় উর্দু ও এক মাস পরে

ফার্সী ভাষায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এবং সর্বশেষে হিন্দীতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

সংবাদপত্র প্রকাশনার ব্যাপারে কলকাতার একটি অনন্য গৌরব আছে। সে গৌরব এই যে এই শহরে বাইরের তিনটি প্রধান ভাষার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর গৌরবও এর সঙ্গে যুক্ত আছে। সে গৌরব এই যে এই তিনটি সংবাদপত্রেরই সম্পাদক ছিলেন বাঙ্গালী। পৃথিবীর অন্য কোনো শহরের এবং অন্য কেনো ভাষাভাষী লোকদের অনুরূপ গৌরব আছে কিনা সন্দেহ।

কৌতুকের ব্যাপার এই যে বাঙ্গালীরা অন্য তিনটি ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের ভাষার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন অন্য দেশের লোক। কলকাতার ব্যাপারেও একই কথা। এই শহর বাইরের তিনটি ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করল, কিন্তু এই শহরের নিজের ভাষা বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করল এক মফস্বল শহর শ্রীরামপুর।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী বলছেন যে চার্লস উইলকিন্স সম্ভবত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ফার্সী ও বাংলা টাইপ তৈয়ার করেন। অঙ্গরেজী অহদ মেঁ হিন্দোস্তান কে তমদ্দুন কী তারিখ (ইংরেজ আমলের ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস) গ্রন্থে তিনি এ কথা লিখেছেন। শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর উর্দূ গ্রন্থ বঙ্গালী হিন্দুয়োঁ কী উর্দূ খিদমাৎ (বাঙ্গালী হিন্দুদের উর্দূ সেবা) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ভালো লিথোগ্রাফ ছাপার উদ্ভাবন করেন দুই ফরাসী শিল্পী। ঐ বছর ২৬শে ডিসেম্বরের কলকাতা গেজেট পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। (ঐ গ্রন্থেই গার্সাঁ দ তাঁসী প্রদত্ত এক সংবাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে দিল্লীতে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লিথো প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়)। এর ৩০/৩১ বৎসর পরে কাশীতে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র তাঁর পিতা গোপালচন্দ্রের রচনা লিথো প্রেসে মুদ্রিত করেছিলেন। সুতরাং কলকাতায় ১৮২২-এর ডিসেম্বরে বা কাছাকাছি সময়ে লিথো ছাপার প্রবর্তন হয়। কিন্তু রামমোহনের মিরআৎ-উল-অখ্‌বার প্রকাশিত হয় ঐ বছরেই আট মাস পূর্বে ১২ এপ্রিল। তাহলে নিশ্চয়ই রামমোহনের মিরআৎ-উল-অখ্‌বার টাইপে মুদ্রিত হয়েছিল। শান্তিবাবুর গ্রন্থে রামমোহনের ফার্সী গ্রন্থ তোহ্‌ফাতুল মোয়াহিদ্দীন -এর মুখপত্রের যে ছবি মুদ্রিত হয়েছে, তা টাইপেই ছাপা, লিথোয় নয়।

যদিও তখন লিথো ছাপার প্রবর্তন হয়ে গিয়েছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তবুও রামমোহনের পত্রিকা ও পুস্তক টাইপেই ছাপা হ'ত। জামে জহাঁনুমা ও যে টাইপে ছাপা হ'ত, একথা গার্সাঁ দ তাঁসী লিখে গেছেন। সুতরাং একথা প্রণিধানযোগ্য যে এদেশে দীর্ঘকাল লিথোতে ফার্সী-উর্দু ছাপার কাজ প্রচলিত থাকলেও দুই সব ভাষায় প্রথম ছাপা টাইপেই শুরু হয়েছিল, কেননা ফার্সী মিরআৎ-উল-অখ্‌বার যেমন কলকাতায় লিথো পদ্ধতি উদ্ভাবনের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, জামে জহাঁনুমাও তাই। শান্তিবাবু ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকা (জুলাই, ১৮১৮খ্রীঃ) থেকে আমাদের দেশে টাইপ তৈরার ক্ষেত্রে পিতৃতুল্য পুরুষ শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকারের সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন, যাতে দেখা যায় যে ১৮০৪/০৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাননের মৃত্যুর পর তাঁর কর্ম্মশিষ্য-জামাতা মনোহর ও অপর কর্মশিষ্যরা আঠারো বৎসরে চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষায় হরফ (টাইপ) তৈয়ার করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৮০৪/০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আঠারো বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮২২/২৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাৎ চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষায় টাইপ তৈয়ার হয়ে যায়। ইতি পূর্বে বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ সম্পর্কিত আমাদের আলোচনার সঙ্গে এই তথ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলা টাইপ স্বল্পপরিমাণে হলেও ১৭৭৮-এর পূর্বে নিশ্চয়ই তৈয়ার হয়েছিল, কেননা হ্যালহেডের ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যকরণ গ্রন্থে ঐ টাইপ কিছু ব্যবহার হয়। এই টাইপ চার্লস উইলকিনস্ তৈয়ার করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারী উইলিয়ম কেরির বাংলা বাইবেল সম্পুর্ন বাংলা টাইপেই ছাপা হয়। সুতরাং শ্রীরামপুরে বাংলা টাইপ যথেষ্ট পরিমাণে ১৮০১-এর পূর্বেই তৈয়ার হয়েছিল। হিন্দীর দেবনাগরী টাইপও যে ১৮০৪-এ তৈয়ারী হয়েছিল তার উল্লেখ আছে।

উর্দু মুদ্রণ গালিবের সময়ে (১৭৯৭-১৮৬৯খ্রী) সুপ্রচলিত হয়েছিল। তাঁর দিওয়ানের গজল সংগ্রহ মুদ্রণ পরিসংখ্যান থেকে একথা জানতে পারা যায়। গালিবের উর্দু দিওয়ান প্রথম ছাপা হয় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে। পরে ১৮৪৭, ১৮৬১ ও ১৮৬৩তে ঐ দিওয়ান পুণমুদ্রিত হয়। তাঁর ফার্সী দিওয়ান ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ১৮৬৩তে। দিল্লীর লালকেল্লায় একটি বাদশাহী মুদ্রণালয় ছিল। গালিব মুঘল সম্রাট ২য় বাহাদুর

শা'র নির্দেশে মুঘল বংশের যে ইতিহাস মেহরে নিমরোজ, নামে ফার্সীতে রচনা করেন, তার প্রথম খণ্ডটি ঐ মুদ্রণালয়ে ১৮৫৪-তে মুদ্রিত হয়। সুতরাং লালকেল্লার মুদ্রণালয়ে ফার্সী ভাষায় ছাপার কাজ হ'তো। অনুমান করার কারণ আছে যে ঐ সঙ্গে সম্ভবত উর্দুতেও মুদ্রণের কাজ হ'ত। গালিবের ফার্সী ও উর্দু দিওয়ান প্রথমে দিল্লীতেই ছাপা হয়। পরে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরেও তা ছাপা হয়। কানপুরে উর্দু দিওয়ানের ১৮৬২'র সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং ফার্সী দিওয়ানের দ্বিতীয় সংস্করণ লক্ষ্ণৌতে মুদ্রিত হয় ১৮৬৩-তে। কানপুরের নিজামী প্রেসের তখন সুখ্যাতি ছিল গালিবের গ্রন্থ এখানেই মুদ্রিত হয়।

বুরহান ই-কাতি নামক একটি বিখ্যাত ফার্সী অভিধানের সমালোচনা ক'রে গালিব 'কাতি বুরহান' নামক একটি গ্রন্থ ১৮৬২-তে প্রকাশ করেন। এই সমালোচনা নিয়ে প্রচণ্ড বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। সব বাদানুবাদই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে ঐ সময়ে ফার্সী ও উর্দু মুদ্রণের যে যথেষ্ট প্রচলন ছিল তা বুঝতে পারা যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে বাংলা মুদ্রণের সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী হ্যালহেড 'দি গ্রামার অফ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ নামে বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন ইংরেজিতে, কিন্তু এই গ্রন্থে কাঠের টাইপে বাংলা অক্ষর সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। এর পর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীরা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা অক্ষরে বাইবেল মুদ্রিত করেন।

পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর কর্মশিষ্যরা শ্রীরামপুরে ভারতীয় ভাষার টাইপ তৈয়ার করেন। এর মধ্যে নিশ্চয়ই বাংলা, হিন্দী ও উর্দু টাইপ ছিল। টাইপ তৈয়ারের পর গ্রন্থ রচনা। বাংলায় প্রথম যে সব গ্রন্থ রচিত হয় তা হ'ল কেরির পূর্বোক্ত বাইবেল, কথোপকথন ও ইতিহাসমালা, রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও লিপিমালা এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন ও রাজাবলী। এ সব গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যতম কর্তাব্যক্তি উইলিয়ম কেরির নেতৃত্বে রচিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর এক কর্তা 'জন গিলক্রাইষ্টের নেতৃত্বে রচিত হয় উর্দুতে গিলক্রাইষ্টের নিজের উর্দু অভিধান, মির্জা আলি লুৎফের গুলশনে হিন্দ (অর্থ, হিন্দুস্থানের বাগান;

এটি আলি ইব্রাহিমের ফার্সী পুস্তক গুলজারে ইব্রাহিমের অনুবাদ), মীর অম্মনের বাগো বাহার ও চার দরবেশ, হায়দর বখ্‌শ হায়দরীর তোতা কাহিনী, আরাইশ মহফিল (হাতিম তাঈর কাহিনী), লয়লা-মজনুঁর কাহিনী প্রভৃতি। প্রায় পনেরো ষোলজন লেখক গিলক্রাইষ্টের নেতৃত্বে উর্দু গ্রন্থ রচনার কাজ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে (উর্দুতে স্বভাবতই সেকালের বিখ্যাত কবি মীরের যোগ দেওয়ার কথা। বস্তুত তিনি যোগও দিতেন, কিন্তু অতিবার্ধক্যের জন্য মীরের পক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। মীরের বয়স তখন প্রায় আশি বছর। অবশ্য যোগ দিলেও মীরের ন্যায় স্বাধীনচেতা পুরুষ তাঁর অপেক্ষা কম যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির অধীনে কাজ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। বাংলার কাজ করেন মুখ্যত মাত্র পূর্বোক্ত তিন জন। বাংলার চেয়ে বেশি গ্রন্থ রচিত হয় হিন্দীতে, কিন্তু গিলক্রাইষ্টের নেতৃত্বে উর্দুতেই সর্ব্বাধিক গ্রন্থ রচিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেবল হিন্দী, উর্দু বা বাংলা নয়, ভারতীয় বহু ভাষায় বহিরাগত ও স্থানীয় ইংরেজদের শিক্ষা দেওয়া হত, যাতে তাঁরা শাসন কার্য ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারেন। এখানে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী, উর্দু ও হিন্দী (হিন্দুস্তানী নামে পরিচিত), তেলেগু, তামিল, কনড়ী, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে কলেজের উদ্বোধন হয়। পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকার জন্য শিক্ষকদের গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে পুরস্কার দেওয়া হত। এ থেকে পূর্বোক্ত হিন্দী, বাংলা ও উর্দুতে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক গদ্য পুস্তক রচনা প্রেরণা পায়। কলেজ খোলার এক বছর পরে ৭ই জুলাই, ১৮০১ তারিখ এই সিদ্ধান্ত হয়। প্রায় আশী জন শিক্ষক কলেজে নিযুক্ত হন। সকল ইয়োরোপীয় শিক্ষকের বেতনই ভারতীয় শিক্ষকের চেয়ে শুধু ইয়োরোপীয় হওয়ার জন্যই বেশী হ'ত, যদিও দেশী শিক্ষকেরা উপযুক্ততর ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এখানে প্রধান পণ্ডিত পদে যোগ দেন। বিদ্যাবত্তা না দেখে গাত্রবর্ণ অনুসারেই ইয়োরোপীয়দের বিভাগীয় প্রধানের পদ দেওয়া হ'ত। তদনুসারে হিন্দুস্তানী (উর্দু ও হিন্দী) বিভাগের কর্তা হয়েছিলেন গিলক্রাইস্ট এবং বাংলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হ'ন কেরি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর যেখানে সংস্কৃত কলেজের প্রধান রূপে বেতন পেতেন মাসিক ২০০

টাকা মাত্র, সেখানে আটচল্লিশ বৎসর আগে ১৮০৭খ্রীষ্টাব্দে কেরির বেতন ছিল মাসিক এক হাজার টাকা। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর সঙ্গে সরকারী অনুবাদকরূপে তিনি আরো মাসিক ৩০০ টাকা করে পেতেন। এ বাবদে তিনি মোট ২৪,৬০০ টাকা অতিরিক্ত পান। এতদতিরিক্ত তিনি পরে মাসিক ৫০০ টাকা পেনসনও পান। কেরি মোট পেয়েছিলেন ৩,৬০,১০০ টাকা। দেশীয় পণ্ডিত যত বিদ্বান হ'ন না কেন, এ থেকে তাঁদের বঞ্চনার হিসাব পাওয়া যায়। জর্জ স্মিথ লিখিত কেরির জীবনী গ্রন্থে কেরির বিষয়ে আরো অনেক খবর জানা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সম্বন্ধে বাংলার তুলনায় উর্দুতে রচিত গ্রন্থের গুরুত্ব প্রণিধানযোগ্য। উর্দুতে এ বিষয়ে অন্তত দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ দু'টি হ'ল পূর্বোক্ত আবদুল্লাহ্ ইয়ুসুফ আলি রচিত অঙ্গরেজি অহদ মেঁ হিন্দোস্তান কে তমদ্দুন কী তারিখ. ও ডঃ আব্দুল ওহীদের কারোয়ান অদব (সাহিত্যের মিছিল)।

এ সময়ে হিন্দীতে যে সব গ্রন্থ মুদ্রিত হয় তাদের নাম এরূপঃ নাসিকেতো-পাখ্যান, রামচরিত্র, প্রেমসাগর, লালচন্দ্রিকা টীকা, ভাষা কায়দা, সিংহাসন বত্তীসী, বৈতাল পচ্চীসী, ভক্তমাল টীকা ও হাতিমতাঈ-র অনুবাদ। শ্রীরামপুর মিশন ও কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক গ্রন্থাদির রচনা ও মুদ্রণ হয়। হিন্দী ও উর্দু রচনা ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে কলকাতার অবদানের কিছু কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। হিন্দী, উর্দু ও ফার্সীর প্রথম সংবাদপত্র যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। হিন্দীর প্রথম তিনটি সংবাদপত্রও কলকাতা থেকেই বেরোয়, চতুর্থটি বেরোয় কাশী থেকে তৃতীয়টির এগারো বছর পরে। কলকাতায় প্রকাশিত হিন্দীর প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রটি বহুদিন পর্যন্ত হিন্দীর একমাত্র দৈনিক ছিল (অন্তত ১৮৬৭খ্রীঃ পর্যন্ত)। হিন্দীর পূর্বোক্ত প্রথম তিনটি সংবাদপত্র সহ মোট পাঁচটি সংবাদপত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এগুলি নিম্নরূপ :—

১) উদন্ত মার্তণ্ড (সাপ্তাহিক, ১৮২৬), ২) বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক, ১৮২৯), ৩) প্রজামিত্র (সাপ্তাহিক, ১৮৩৪), ৪) মার্তণ্ড (সাপ্তাহিক, ১৮৪৬) এবং ৫) সমাচার সুধাবর্ষণ (দৈনিক, ১৮৫৪)। ১৮৯০'র মধ্যে আরো পাঁচটি

সাপ্তাহিক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়: ১৮৭১-এ সুলভ হিন্দী সমাচার, ১৮৭৮-এ উচিত বক্তা, ১৮৭৯-তে সার সুধানিধি, ১৮৮৭-তে আর্যাবর্ত এবং ১৮৯০-তে হিন্দী বঙ্গবাসী।

উদুর্র ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাপ্তাহিক জামে জহাঁনুমা ছাড়া তখন আরো তিনটি সংবাদপত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত হ'তো। এদের সম্পাদকও ছিলেন বাঙ্গালী। এই তিনটি সংবাদপত্র হ'ল মথুরামোহন মিত্র সম্পাদিত শমসুল অখ.বার (১৮২৩), দুর্লভচন্দ্র চ্যাটার্জী সম্পাদিত সও রাজেন্দর (১৮৩১) এবং ত্রিলোক নাথ দত্ত সম্পাদিত মজ.হরুল অজায়েব। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে একদা হিন্দী ও উদুর্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কলকাতার কি প্রকার মুখ্য ভূমিকা ছিল।

গার্সাঁ দ তাসীর কথানুসারে দিল্লীতে লিথোর প্রবর্তন হয় কলকাতার পনেরো বছর পরে (১৮৩৭)। ফার্সী ও উদুর্ টাইপও কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে সময় লেগেছিল। আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলির কথামতো ১৭৭৮-এ ফার্সী টাইপ এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথমে উদুর্ টাইপ কলকাতা বা শ্রীরামপুরে তৈয়ার হয়ে থাকলেও তা দিল্লী যেয়ে স্থিতি লাভ করতেও সময় লেগেছিল। হয়তো এর পূর্বেই মীর দিল্লী ত্যাগ করেন (১৭৮২) এবং পরে তাঁর মৃত্যুও হয় (১৮১০)। সুতরাং ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে মীরকে হস্তলিখিত পুঁথিই অধ্যয়ন করতে হয়েছিল।

কলকাতা তখন ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। তাই স্বভাবতই স্থানমাহাত্ম্যে মুদ্রণ, প্রকাশনা ও অন্যান্য ব্যাপারে কলকাতা গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী পর্যন্ত ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সুতরাং বাংলার বাইরে দিল্লী পর্যন্ত যে বিরাট এলাকায় হিন্দুস্তানী নামে পরিচিত হিন্দী ও উদুর্ ভাষা প্রচলিত ছিল, শাসক ব্রিটিশদের নিজ স্বার্থে সেই দুই ভাষার উপর বাংলা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। এই কারণেই বিদেশী সরকারী কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হিন্দী ও উদুর্ ভাষা প্রাধান্য পেয়েছে। ঐ দুই ভাষায় অধিকতর পুস্তক রচনার এটাই প্রধান কারণ। সেদিক থেকে কেরি অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসকদের কাছে গিলক্রাইষ্টের গুরুত্ব বেশি ছিল।

এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজের মোহর (সীল)

থেকে। এই মোহরে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে এবং পরে যথাক্রমে উর্দূ, হিন্দী এবং বাংলায় কলেজের নাম আছে। আবদুল্লাহ ইয়ুসুফ আলিও তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন যে বাংলায় অবস্থিত হলেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উর্দূ ও হিন্দীর জন্য যত কাজ করেছে বাংলার জন্য তত করে নি।

আজু.র সঙ্গে মীরের সম্পর্ক ছিন্ন হল—এই সম্পর্ক বৎসরাধিক কাল স্থায়ী হয় নি মনে হয়। মীর সম্ভবত ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে আজু.র গৃহ ত্যাগ করেন। আজু.র সঙ্গে মীর কিছু দিন মাত্র ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। ১৭৩৯-এর মে মাসে নাদির শাহ্ দিল্লী ত্যাগ করার পরই নিশ্চয় মীর দিল্লী আসেন। তারপর সুবৃষ্টি ও সুফসলের দরুণ সুসময়ে আজু.র প্রসন্নতা। তারপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্র আসা, আজু.র দুর্ব্যবহার এবং মীরের আজু.র গৃহত্যাগ। সময়টা ১৭৪০-এর প্রথমার্ধেই হওয়ার কথা। জাভিদ খাঁ — জাভিদ খাঁ ছিলেন নপুংসক। সম্রাট মহম্মদ শাহ্.র আমলে তিনি ছিলেন হারেমের পরিচারকবৃন্দের সহকারী নিয়ামক এবং বেগমদের ভূসম্পত্তির পরিচালক। মহম্মদ শাহ্.র মৃত্যুর পর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র আহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বৎসর। পিতা তাঁকে যুদ্ধবিদ্যা বা রাজ্য পরিচালন কিছুই শেখান নি। অন্তঃপুরে নারীদের সান্নিধ্যেই তাঁর কাল কেটেছে। যুবজনোচিত খেলাধুলা (যেমন পোলো, পশুযুদ্ধ, শিকার প্রভৃতিতেও তাঁকে আগ্রহী হতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বুদ্ধিরও স্থূলতা ছিল। ফলে যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তিত্বহীন পরনির্ভর যুবক মাত্র। জাভিদ খাঁ এই অবস্থার সুযোগ নিলেন। তিনি সম্রাটের সামনে নানা প্রলোভন, ভাং, চরস, সুরা, নারী প্রভৃতি এগিয়ে দিয়ে রাজকার্য থেকে তাঁকে সরিয়ে রাখলেন। সে ভার সম্রাট তুলে দিলেন জাভিদ খাঁ'রই হাতে এবং নিজে ক্রমশ নানা অশালীন ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। চার বর্গ মাইল এলাকা থেকে সকল পুরুষকে হটিয়ে কেবল মাত্র নারীদের নিয়ে তিনি বিহার করতেন। পুরুষোচিত সাহসেরও তাঁর অভাব ছিল। সম্রাটের মাতা উধম বাঈ ছিলেন একটি অদ্ভুত চরিত্র। প্রাক-বিবাহ জীবনে তিনি ছিলেন এক নর্তকী। প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অভাব সত্বেও তিনি নিজেকে নূর জাহানের সমকক্ষ মনে করতেন। প্রতিদিন পর্দার অন্তরালে বসে নপুংসকদের সাহায্যে তিনি রাজকার্যের নির্দেশ দিতেন। সৈন্যদের যখন দীর্ঘকাল ধরে বেতন দেওয়া যাচ্ছিল না তখন তিনি নিজ জন্মদিন পালনের জন্য দু'কোটি টাকা ব্যয় করেন।

জাভিদ খাঁ এই মহিলার উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই এটা ঘটেছিল। সকল রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে জাভিদ খাঁ হারেমে রাত্রি যাপনও করতেন।

তৈমুর বংশের ইতিহাসে কখনো কোনো নপুংসককে এত ক্ষমতার অধিকারী হতে দেখা যায় নি, যদিও এই বংশের প্রশাসনে নপুংসকদের এক উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। বিশেষ করে হারেম পরিচালনায় নপুংসকরা বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। হারেমে যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই নপুংসক কর্মচারী রাখা হত। এদের প্রধান হ'তেন হারেমের অধ্যক্ষ, যাঁর পদের নাম ছিল নাজি.র (তত্ত্বাবধায়ক)। জাভিদ খাঁ ছিলেন সহকারী নাজি.র। নাজি.রের নাম ছিল রোজ.আফজু.ন খাঁ।

মহাভারতের আমল থেকে নপুংসকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা গেছে। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন নপুংসক বৃহন্নলা রূপ ধারণ করেছিলেন। পিতামহ ভীষ্মের নিধনের ব্যাপারে নপুংসক শিখণ্ডীর ছিল মুখ্য ভূমিকা। ভারতের ইতিহাসকালের ভিতরে মুঘলদের পতনের যুগে নপুংসকদের উল্লেখের ছড়াছড়ি। তাঁদের গুরুত্বের জন্য তাঁদের নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন জাভিদ খাঁ। ঐ কালের নপুংকদের মধ্যে যাঁর দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্য তিনি ছিলেন অযোধ্যা রাজ্যের এক মুখ্য সেনাপতি লতাফৎ আলি। নজফ খাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীতে তাঁর চার সহকারীর মধ্যে যখন ১৭৮২–৮৪ খ্রীষ্টাব্দ জুড়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছিল তখন লতাফৎ পক্ষভুক্ত হয়ে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত অবশ্য লতাফৎ পরাজিত হন, তাঁকে অন্ধ করে নিহত করা হয় (নভেম্বর, ১৭৮২ খ্রী)। ১৭৭৪-এ অযোধ্যার আরো এক নপুংসক সেনাপতির নাম শোনা যায়। ইনি বসন্ত আলি খাঁ। অযোধ্যা রাজ্যের অপর নপুংসক সেনাপতি ছিলেন মাহবুব আলি খাঁ। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রামঘাটে মারাঠা যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দেন।

আহম্মদ শাহ্ সম্রাট হওয়ার পর তাঁর মাতা উধম বাঈ এক দিকে যেমন নিজের প্রাধান্য বৃদ্ধি করতে লাগলেন, তেমনি তাঁর অনুগৃহীত জাভিদ খাঁরও পদবৃদ্ধি হতে লাগল। তাঁকে ছ' হাজারী মনসবদার করা হল নাজি.র রোজ.আফজু.ন খাঁ অতিবৃদ্ধ হওয়ায় (ইনি ছিলেন ঔরংজেবের সময়ের লোক, মহম্মদ শাহ্.র সময়েও ইনি নাজি.র ছিলেন। নাজিরের ক্ষমতা জাভিদ খাঁরই দখলে এসেছিল। তদুপরি দেওয়ান-ই-খাসের অধ্যক্ষের পদও তাঁকে দেওয়া হল।

ফলে সম্রাটের সঙ্গে অভিজাতদের সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ল। এ ছাড়াও জাভিদ পেলেন গুপ্তচর বিভাগের, রাজকীয় হস্তিবাহিনীর, অনুদান ও নিয়োগ স্থায়ীকরণের এবং বেগমদের সম্পত্তি ও সম্রাটের ব্যক্তিগত তহবিলের ভার।

জাভিদ সর্বদা হারেমে সম্রাটের কাছাকাছি থাকার জন্য বুদ্ধি ও শক্তি-হীন যুবক সম্রাট তাঁকে খুবই যোগ্য লোক মনে করতেন, যদিও জাভিদের না ছিল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, না প্রশাসনের। সম্রাট সব ব্যাপারে অভিজাতদের জাভিদের কাছেই পাঠাতেন। কিন্তু অভিজাতরা এই নিম্নজাতীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত নপুংসককে এড়িয়ে চলতেন। জাভিদও তাঁদের অবহেলা করে প্রতিশোধ নিতেন। জাভিদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট ও তাঁর জননীর সন্তোষ বিধান করে' নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করা।

এ কালে সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন না পাওয়া রেওয়াজে দাঁড়িয়েছিল। দু'তিন বৎসর পর্যন্ত বেতন বাকি থাকত। ফলে বিশেষ করে সৈন্যরা লুটপাট করে বা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে কিছু কিছু অর্থ আদায় করে নিত। জাভিদের সময়েও এই অবস্থা যথারীতি প্রচলিত ছিল। বেতন না পাওয়ায় রাজকীয় রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা এক অদ্ভুত উপায়ে জাভিদ ও রাজমাতার উপর একবার প্রতিশোধ নিয়েছিল (কেননা এঁরা দু'জনই ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী)। সৈন্যরা রাজ-প্রাসাদের দ্বারে একটি পুরুষ গর্দভ এবং এক কুক্কুরীকে বেঁধে রাখল। যখন রাজপুরুষরা সম্রাটের দরবারে এলেন, তখন তারা তাঁদের ঐ দু'টি পশুকে প্রথমে অভিবাদন করতে বলল। তারা বলল, গর্দভটি হ'ল নবাব বাহাদুর (জাভিদ খাঁ) এবং কুক্কুরীটি সম্রাট জননী। ঐতিহাসিক শাকীরের বর্ণনা থেকে আচার্য যদুনাথ এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

এ সময়টা ছিল সফদর জঙ্গের উজীরত্বের সময়। তাঁর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্র। রাজধানীর প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাতেন না, রাজধানীতে তিনি থাকতেনও না, সম্রাট ও সম্রাট জননীর সান্নিধ্যে থেকে সে কাজটি করতেন জাভিদ খাঁ। ক্রমশ সফদর ও জাভিদ খাঁর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং অবশেষে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সফদর জঙ্গ, আলোচনার জন্য স্বগৃহে ডেকে এনে জাভিদ খাঁকে হত্যা করান। রাজা লছমী নারায়ণ— ইনি ছিলেন উজীর সফদর

জঙ্গের এজেন্ট (প্রতিনিধি / দেওয়ান)। সফদর জঙ্গ, ১৭৪৮-এর জুন থেকে ১৭৫৩'র নভেম্বর পর্যন্ত উজীর ছিলেন। (সম্রাট অবশ্য মে মাসে তাঁকে পদচ্যুত করেন, কিন্তু সফদর তা অগ্রাহ্য করেন।) রাজার পুত্র কিষণ নারায়ণ দরবারের দরজায় দাঁড়িয়ে সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী লোকদের ভিতরে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতেন (জানুয়ারি, ১৭৫৩খ্রীঃ।) মার্চ, ১৭৫৩-য় সম্রাটের কাছে সফদরের প্রস্তাব নিয়ে এঁর দুর্গে আসা সম্রাট বন্ধ করেন। ডিসেম্বর, ১৭৫৬-য় আবদালীর আগমন সংবাদে রাজা লছমীনারায়ণের পরিবার মথুরা চলে যায়। ১৭৬২'র ফেব্রুয়ারিতে ইনি ছিলেন সরহিন্দের (পাঞ্জাবের) ফৌজদার জৈন খাঁর দেওয়ান। আবদালীর সঙ্গে পাতিয়ালার রাজা আলা সিংয়ের যুদ্ধের ব্যাপারে আবদালীকে তিনি পরামর্শ দেন। জুন, ১৭৬২-তে আবদালীর সঙ্গে যুদ্ধরত শিখরা জৈন খাঁর এলাকার সঙ্গে লছমীনারায়ণের এলাকাও লুণ্ঠন করে। রাজা যুগলকিশোর— নভেম্বর, ১৭৫৩-য় উজীর ইন্তিজামুদ্দৌলহ্, এঁকে মলহর রাও হোলকরের পুত্র খাণ্ডোজীর (অহল্যা বাঈর স্বামী) কাছে এক দৌত্যে প্রেরণ করেন। জানুয়ারী, ১৭৫৭'য় আহমদ শাহ্, আবদালী দিল্লীতে এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে দু'কোটি টাকা, সম্রাট কন্যার পাণি এবং পাঞ্জাবের সরহিন্দ থেকে পশ্চিমে সব অঞ্চল তাঁকে দিলে তিনি দিল্লী আক্রমণ করবেন না। এই প্রস্তাবে ভীত হয়ে দিল্লী নগরীর অধিবাসীরা ৫০০ গো-শকট ভর্তি ক'রে মথুরায় পলায়ন করে। রাজা যুগলকিশোরও সপরিবারে ঐ দলে যান। দিনটা ছিল ১৭ই জানুয়ারি। দেওয়ান নাগরমল— ১৭৫৩'র প্রথমে নাগরমল সম্রাটের নিজস্ব এলাকার (ক্রাউন ল্যাণ্ড) দেওয়ান ছিলেন। নাগরমল, লছমীনারায়ণ ও অন্যান্যদের নিয়ে সম্রাট আহ্‌মদ শাহ্-র জননী উধম বাঈ পর্দার অন্তরালে থেকে সম্রাটের হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মারাঠাদের দেয় অর্থ সংগ্রহের জন্য জুন, ১৭৫৪'য় নাগরমল দিল্লীর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেন। আগষ্ট, ১৭৫৪'য় সম্রাটের ব্যক্তিগত কর্ম্মচারীরা নাগরমলকে বকেয়া বেতন আদায়ের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ করে' আক্রমণ করে। ঐ বছর নভেম্বরে বেতন না পাওয়া সৈন্যদের লুটপাটের ভয়ে নাগরমল দিল্লীস্থিত মারাঠাদের কাছে আশ্রয় নেন। ১৭৫৫'র জুলাইতে জাট রাজা সুরযমলের সঙ্গে উজীর ইমাদুল মুল্ক্-এর বিবাদের নিষ্পত্তি করেন নাগরমল। ১৭৫৬'র নভেম্বরে নাগরমল ইমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলহ্-র সঙ্গে যোগ দেওয়া থেকে সুরযমলকে নিবৃত্ত করেন। ১৭৫৬'র ডিসেম্বরে আবদালীর আক্রমণের আশঙ্কায়

নাগরমলকে উজীর ইমাদ সাহায্যের জন্য সূরযমলের কাছে প্রেরণ করেন। ঐ মাসেই একই কারণে নাগরমলের পরিবার মথুরা যায়। (লছমী নারায়ণের পরিবারও এ সময়ে মথুরা যায়।) উজীর ইমাদ তাঁর পরিবার প্রেরণ করেন রাজপুতানায়। কিন্তু নাগরমল, লছমীনারায়ণ প্রভৃতির পরিবার তখন দিল্লীর বাইরে যেতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ, কেননা ইমাদের আদেশে মারাঠারা দিল্লী ত্যাগীদের বাধা দেয় এবং দিল্লী ফিরিয়ে আনে। সম্রাটের অপর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী (লর্ড চেম্বারলেন) জিয়াউদ্দৌলহ্-র পরিবারকেও বাইরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে উজীরের নির্দেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সুতরাং মনে হয় নাগরমলের পরিবার বাধা পেয়ে দিল্লীতেই থেকে যায়। পরের মাসে (জানুয়ারী, ১৭৫৭) যখন রাজা যুগলকিশোরের পরিবার আবদালীর ভয়ে মথুরা চলে যায় তখন হিন্দু নগরী মথুরায় মীরকে সঙ্গে করে না নিয়ে যুগলকিশোর তাঁকে দিল্লীতে নাগরমলের কাছে রেখে যান। এর সমর্থন পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে ১৯শে জানুয়ারি ভোর হওয়ার পূর্বেই উজীর ইমাদ চারজন মাত্র রক্ষী সঙ্গে নিয়ে আবদালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে ঐ দিনই মধ্য রাত্রে নাগরমল অন্যান্য অভিজাতবর্গের সঙ্গে দিল্লী ছেড়ে পলায়ন করেন। সুতরাং বোঝা যায় যে ১৭৫৬'র ডিসেম্বরে নাগরমল দিল্লী ছেড়ে পলায়ন করতে পারেন নি, দিল্লীতেই ছিলেন। ১৭৫৭'র ১৪ই জানুয়ারী যুগলকিশোর যখন দিল্লী ছেড়ে মথুরায় যান তখন তিনি দিল্লীতে নাগরমলের কাছে মীরকে পাঠিয়ে দেন। এরপর ১৯শে জানুয়ারী নাগরমলও দিল্লী থেকে পলায়ন করেন। তখন মীর তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। ১৭৫৭'র আগস্টে উজীর ইমাদ নাগরমলকে দিল্লীর কাছে মারাঠাদের নিকট প্রেরণ করেন নাজিবুদ্দৌলহ্-র বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রার্থনা নিয়ে। পাণিপথের যুদ্ধের (১৪ই জানুয়ারি, ১৭৬১খ্রীঃ) পর ফেব্রুয়ারি মাসে আবদালী নাজিবুদ্দৌলহ্-র কাছে অর্থ চাইলে তিনি (তখন) সূরযমলের দূত নাগরমলকে দেখিয়ে বলেন সূরযমল আবদালীর মার্জনা লাভের জন্য (পাণিপথের যুদ্ধে আবদালীকে সাহায্য না করার অপরাধে) অর্থ দেবেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বরে নাজিবুদ্দৌলহ্ কুম্ভের দুর্গে সূরযমলের কাছে নাগরমলকে পাঠান উভয়ের মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে যাতে শাহ্ আলমকে দিল্লী ফিরিয়ে আনার জন্য পরামর্শ করা যায়। অক্টোবরে দানকৌর নামক স্থানে সূরযমলের কাছে নাজিবুদ্দৌলহ্ দূত প্রেরণ করেন সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে। এখানে সূরযমল সম্রাটকে বার্ষিক অর্থ

দিতে সমুৎ হন, অর্থের জামিন হন নাগরমল। এ মাসেই পুনরায় নাগরমল সুরযমলের কাছে যান আবদালীর দাবির অর্থ সংগ্রহের জন্য। অক্টোবর, ১৭৬৫-তে শিখরা নাগরমলের জাগীর রেওয়ারি লুণ্ঠন করে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসে দেওয়ান নাগরমল এলাহাবাদ থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনোম্মুখ সম্রাট শাহ্ আলমের ফরুখাবাদের নিকটস্থ সাময়িক শিবিরে সম্রাটের তৎকালীন সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হুসামুদ্দীনের কাছে মীরকে পাঠান। প্রায় পনের বৎসর মীরকে আশ্রয় দিয়ে এবং সম্ভবত তাঁর পৃষ্ঠপোষক রূপে গর্বও অনুভব করে এ সময়ে দেওয়ান নাগরমল মীরকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। এ সময়ে দেওয়ান নাগরমলের উপর কোনো বিপদ বা বিপর্যয় আপতিত হয়নি। এ সময়ও তিনি সম্রাটের নিজ এলাকার দেওয়ান ছিলেন। বরঞ্চ এতদিনের সম্রাটবিহীন দিল্লীর চেয়ে সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লীর পরিস্থিতি উন্নততর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং তাতে দেওয়ান নাগরমলের উৎসাহিত হওয়ারই কথা কিন্তু তবু তিনি এ সময়েই মীরকে নিজ আশ্রয় থেকে অপসৃত করলেন।

মনে হয় প্রত্যাবর্তিত সম্রাটের আনুকূল্য তিনি পাবেন না এ রকম কোনো আভাস দেওয়ান নাগরমল পেয়েছিলেন এবং সেজন্যই তিনি মীরকে তৎকালে সম্রাটের সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হুসামুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে মীরের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে যে সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের সময়ে যাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে রাজধানীতে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সম্রাটের নিজ এলাকার দেওয়ান নাগরমল ছিলেন না। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া এ ঘটনা ঘটা অসম্ভব। দেওয়ান নাগরমলের অনুমানও ঠিক হয়েছিল, কেননা দেখা যায় সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরেই সম্রাটের নিজ এলাকার ভার তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তা হুসামুদ্দীনকেই দেওয়া হয়। হুসামুদ্দীনের আশ্রয়ও মীর পান নি। এখন থেকে লক্ষ্ণৌ যাওয়া পর্যন্ত প্রায় ১১ বৎসর মীর অপর কারো নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারেন নি। ডঃ হকের মীরের নির্ব্বাচিত রচনা গ্রন্থে (পৃঃ৬) বলা হয়েছে যে জাটদের হাঙ্গামার জন্যই দেওয়ান নাগরমল মীরকে হুসামুদ্দীনের কাছে পাঠান, কিন্তু একথা ঠিক নয়। জাটদের হাঙ্গামা প্রায় সব সময়েই কমবেশি ছিল, তবে সব চেয়ে বড় হাঙ্গামা হয়েছিল ১৭৫৩'র মে মাসে, যা ইতিহাসে জাট-গর্দি নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। ঐ

সময়ের প্রধানমন্ত্রী সফদর জঙ্গ, সম্রাট আহম্মদ শাহ্-র সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন এবং সফদর জঙ্গের ইঙ্গিতেই জাট সর্দার সুরযমল পুরানো দিল্লী লুট করেন। এর বহু পরে ১৭৭১-এর জুলাই-আগষ্ট মাসে দেওয়ান নাগরমল মীরকে হুসামুদ্দীনের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

১৭৭২-এর ৬ জানুয়ারি সম্রাট শাহ্ আলম দিল্লীতে এসে সিংহাসনে আরোহণ করলে নাগরমলের স্থলে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হুসামুদ্দীন সম্রাটের নিজ এলাকার ম্যানেজার (দেওয়ান) নিযুক্ত হন। সুতরাং অন্তত ১৭৫৩'র প্রথম থেকে নাগরমল ১৭৭১-এর শেষ পর্যন্ত পুরো ১৯ বছর গুরুত্বপূর্ণ সম্রাটের নিজ এলাকার দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাগরমলের কাছ থেকে দেওয়ানী কেড়ে নেওয়ার একটি কারণ অনুমান করা যায়। সম্রাট দিল্লী প্রত্যাবর্তন করার সময় নাগরমল কনিষ্ঠ পুত্রের পরামর্শে তাঁকে স্বাগত জানাতে দিল্লীর বাইরে যান নি। দিল্লীতে তখন অবস্থানকারী সম্রাটজননী ও যুবরাজ এবং প্রধান রাজপুরুষরা সম্রাটকে স্বাগত জানাতে দিল্লীর বাইরে গিয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে সম্রাটের নিজ এলাকা (খাস মহল) সমূহের দেওয়ান নাগরমলের তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে না যাওয়া ছিল প্রোটোকল বিরোধী অসৌজন্যমূলক অপরাধ। এই অপরাধ দেওয়ানী চলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আসলে দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাবর্তিত সম্রাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নাগরমল সন্দিহান ছিলেন। তাঁর হিসেবে ভুল হয়েছিল এবং দেওয়ানী খুইয়ে তাঁকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। দিল্লীতে প্রচুর অশান্তি ও হাঙ্গামা —১৭৫৪'র জুন মাসে ইমাদুল মল্ক্-কে ইন্তিজামুদ্দৌলহ্-র স্থলে সম্রাট আহম্মদ শাহ্ উজীর নিযুক্ত করলেন। সেই দিনই ইমাদ আহম্মদ শাহ্-কে গদিচ্যুত করে' ২য় আলমগীরকে সিংহাসনে বসান এবং সেই মাসেই আহম্মদ শাহ্ ও তাঁর জননীকে অন্ধ করান ও নিজ প্রধান সহায়ক অকিবৎ খাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করান। ১৭৫৭'র জানুয়ারিতে আহম্মদ শাহ্ আবদালী দিল্লী ও আশপাশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। ১৭৫৯'এর নভেম্বরে সম্রাট ২য় আলমগীরকে এবং প্রাক্তন উজীর ইন্তিজামুদ্দৌলহ্-কে ইমাদ হত্যা করান। ১৭৬১'র জানুয়ারিতে পাণিপথের যুদ্ধে আবদালীর হাতে মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত হয়।

১৭৫৪'র জুন থেকে ১৭৬১'র জানুয়ারি পর্যন্ত সাড়ে ছ'বছরে এই সব দুর্দৈব ছাড়া অর্থাভাবজনিত অশান্তিও বার বার মাথা চাড়া দিয়েছে। ১৭৫৭'র জানুয়ারিতে তাঁর কাছে আসার সময় থেকে দেওয়ান নাগরমলের এর মধ্যে

মীরকে নিয়ে প্রধান রাজপুরুষদের কাছে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির বেশি উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে হয় না। ১৭৬১'র জানুয়ারি থেকে ১৭৭০-এর অক্টোবরে রোহিলা সর্দার নাজিবুদ্দৌলহ্-র মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পৌনে দশ বছর দিল্লীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। আবদালীর পৃষ্ঠপোষকতায় নাজিবুদ্দৌলহ-এ সময়ে দিল্লীর প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। এ সময়ে জাট ও শিখদের সঙ্গে দিল্লী বাহিনীর যুদ্ধ হয় বটে, তবে তা হয়েছে দিল্লীর বাইরে। দিল্লীতে তাতে তত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। দিল্লীতে এসময়ে সম্রাট ছিলেন না। উজীর ইমাদের শত্রুতায় যুবরাজ (২য় শাহ্ আলম) ১৭৫৮'র মাঝামাঝি দিল্লী থেকে বিতাড়িত হন। ১৭৭২-এর জানুয়ারির পূর্বে তিনি আর দিল্লী ফিরতে পারেন নি। এই অপেক্ষাকৃত শান্তির সময়ে মীর দেওয়ান নাগরমলের সঙ্গে প্রধান রাজপুরুষদের গৃহে গেছেন, কিছু কিছু যুদ্ধ বিগ্রহও প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজপুরুষরাও মীরকে সম্মান করতেন— দিল্লীতে কম ও বেশি রাজনৈতিক অশান্তি ও হাঙ্গামা লেগেই ছিল। এই পরিস্থিতিতেও দিল্লীর সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা যে কবি মীরের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে পেরেছেন তা তাঁদের কাব্য প্রীতির নিদর্শন। এজন্য তাঁদের সাধুবাদ প্রাপ্য। আবার এই পরিস্থিতিতে মীর (তথা অন্যান্য কবিরা) যে কবিতা (এবং উন্নত মানের কবিতাও) রচনা করতে পেরেছেন তা তাঁদেরো প্রভূত মানসিক শক্তির পরিচায়ক। মীর যতদিন দিল্লীতে ছিলেন ততদিন হাঙ্গামা ও অশান্তি লেগেই ছিল। কখনো তার তীব্রতা বেশি ছিল, কখনো বা কম। মীরের জীবনের সৃষ্টিশীল অংশের বেশির ভাগই অশান্ত আবহাওয়ায় কেটেছে। পক্ষান্তরে মীরের পরবর্তী অপর শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি মির্জা গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯খ্রীঃ) জীবনে বাহ্যিক অশান্তির বিস্তার ছিল মাত্র এক বৎসরের মতো ১৭৫৭'র মহাঅভ্যুত্থানের সময়ে। সুতরাং উভয়ে যে পরিস্থিতিতে কবিতা রচনা করেছেন তার বিচারে মীরকেই অধিকতর সাধুবাদ দিতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী যে অশান্ত পরিস্থিতিতে মীর যে পর্যায়ের কবিতা রচনা করতে পেরেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মীরের কবিতার এক বিরাট অংশ উন্নত মানের নয় বলে সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন। তার কারণ সম্ভবত এই অশান্ত পরিবেশ। এই পরিবেশে গতানুগতিকতার পথেই সৃষ্টির ধারা বয়ে চলে। তবু তারই মাঝে হয়তো সাময়িক শান্ত অবকাশগুলিতে মীর যেসব উন্নত মানের কবিতা রচনা করে গিয়েছেন তাই তাঁকে উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

কবির আসনে বসিয়েছে। পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মীরের রচনার বিচার করলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিস্ময় না জানিয়ে আমাদের উপায় থাকে না।

এ সময়ে একই সঙ্গে তিনজন হিন্দুকে (লছমীনারায়ণ, যুগলকিশোর ও নাগরমল) উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দেখা গেছে। নানা বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে এঁদের মধ্যে নাগরমলই সর্বাধিককাল গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

মোগল রাজত্বে বহু হিন্দুকে উচ্চপদে নিযুক্ত দেখা গেছে। সম্রাট ফরুখ-সিয়রের সময়ে আগ্রার রাজ্যপাল ছিলেন রাজা ছবিলারাম নাগর। ফরুখ-সিয়রের উজীর আবদুল্লাহ্-র দেওয়ান ছিলেন রতন চাঁদ, যিনি জাতিতে ছিলেন বেণে। সম্রাট জাহান্দার শাহ্-র উজীর জুলফিকার খাঁর দেওয়ান ছিলেন রাজা সভাচন্দ্। সম্রাট ২য় আলমগীরের হারেম অধ্যক্ষের প্রধান সহকারী ছিলেন ঠাকুরদাস। দিল্লীর এককালীন প্রধান রাজপুরুষ মির্জা নজফ খাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন শোভারাম কাশ্মীরী এবং দেওয়ান ছিলেন রাজা মনিরাম। মির্জা নজফের পরবর্তী দিল্লীর প্রশাসন-প্রধান অফ্রাসিয়াব খাঁর অর্থবিভাগের প্রধান ছিলেন রাজা নারায়ণ দাস। মির্জা নজফের অন্যতম প্রধান সহকারী মুহম্মদ বেগ হামাদানীর এক প্রধান কর্মচারী ছিলেন লছমীরাম। রোহিলা সর্দার এবং পরে দিল্লী-প্রশাসনের প্রধান পুরুষ নাজিবুদ্দৌলহ্-র এক প্রধান দূত ছিলেন মেঘরাজ (১৭৫৮খ্রীঃ)। ১৭৬৩'র ডিসেম্বরে নাজিবুদ্দৌলহ্ জাট রাজা সুরযমলের কাছে যে দূত প্রেরণ করেন তিনিও ছিলেন হিন্দু, নাগরমল ক্ষেত্রী (নাজিবুদ্দৌলহ্-র অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে যে ১৭৭০-এর অক্টোবরে আধুনিক উত্তর প্রদেশের হাপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বে তিনি সৈন্যদের আদেশ দেন যে নিকটবর্তী গড় মুক্তেশ্বরে গঙ্গায় পুণ্যস্নানের জন্য সমাগত হিন্দুদের যেন লুণ্ঠন বা নির্যাতন না করা হয়। আচার্য যদুনাথ লিখেছেন যে এ ঘটনা নাজিবুদ্দৌলহ্-র জীবনের বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা নয়, তাঁর জীবনের ঘটনা পঞ্জীর অনুবৃত্তি।) আচার্য যদুনাথ ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃঃ ৩০) লিখেছেন যে উত্তর ভারতের রোহিলা প্রধানগণ রাজস্ব আদায়ের কাজ হিন্দু দেওয়ানদের হাতে এবং পারিবারিক হিসাব রক্ষা ও পত্রাদি লেখার কাজ হিন্দু সচিবদের (মুন্সি) হাতে রাখতেন। লক্ষ্ণৌর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সেখানে ১৮১৫ থেকে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজস্বমন্ত্রীত্ব (দেওয়ানী) ন্যস্ত ছিল এক হিন্দু পরিবারে। ইতিপূর্বে সফদর জঙ্গের রাজত্বকালেও হিন্দুরা উচ্চপদে ছিলেন।

তাঁর এক সেনাপতি ছিলেন রাজা দেবীদৎ এবং এক রাজ্যপাল ছিলেন রাজা নওয়ল রাই। আসফুদ্দৌলহ্‌র দেওয়ান ছিলেন রাজা ঝাউ লাল, যাঁর তৈরী ঝাউ লাল্‌কা পুল এখনো লক্ষ্ণৌতে এক দ্রষ্টব্য বস্তু। মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গ্রন্থে আচার্য যদুনাথ লিখেছেন (পৃ: ১৬৬): মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের পুরাতন গ্রাম প্রশাসন এবং রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তাঁরা প্রায় একচেটিয়া ভাবেই রাজস্ব বিভাগে হিন্দুদের নিযুক্ত করতেন। এই ধারা পরেও চলে এসেছে। মহারাজা নন্দকুমার ও পুত্র রাজা গুরুদাস ছিলেন মুর্শিদাবাদে দেওয়ান। আধুনিক যুগের সূচনায়ও রাজস্ব আদায়ের প্রধান দেওয়ান পদে দু'জন মুখ্য হিন্দুকে দেখতে পাই। একজন রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রথমে ঢাকার কালেক্টর টমাস উডফোর্ডের দেওয়ান এবং পরে রংপুরের কালেক্টর ডিগবীর দেওয়ান ছিলেন (১৮০৫-০৯খ্রী:)। অন্যজন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন। এক সময়ে তিনি কলকাতা টাকশালের অ্যাসে মাষ্টার এবং প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ড: হোরেস হেম্যান উইলসনের দেওয়ানছিলেন (১৮২৮-৩২খ্রী:)। (কৃষ্ণনগরের হিন্দুরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন প্রখ্যাত কার্তিকেয়চন্দ্র রায়।) রাজস্ব বিভাগ ছাড়া অন্য একটি উচ্চপদেও হিন্দুদের নিয়োগ সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ ঐ গ্রন্থে (পৃ: ১৫৪) উল্লেখ করেছেন। এই পদটির নাম মুন্সী (সচিব)। তিনি লিখেছেন যে প্রথম হিন্দু মুন্সীরূপে হরকর্ণ ইতিবর খানীর নাম শোনা যায় (১৬২৪খ্রী: ?)। এরপর নাম করা যায় শাহ্‌জাহানের উজীর (প্রধানমন্ত্রী) সাদুল্লাহ্‌ খাঁর মুন্সী চন্দ্রভান-এর। ইনি কবি ছিলেন এবং কবিতায় "ব্রাহ্মন" ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে প্রধান মুসলমান রাজপুরুষদের অধীনে উচ্চপদে হিন্দু কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮শ শতাব্দীতে আনন্দরাম সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌-র মীর মুন্সীর (মুখ্য সচিব) পদ অলংকৃত করেন। হুসামুদ্দীন—উজীর গাজিউদ্দীন ইমাদুল্‌ মুল্ক্‌-এর ভয়ে সম্রাট ২য় আলমগীরের পুত্র আলী গওহর মে, ১৭৫৮-য় দিল্লী থেকে বেরিয়ে নানা স্থান হয়ে শেষে এলাহাবাদ দুর্গে আশ্রয় নেন। এখান থেকে ১৩ বছর পরে বেরিয়ে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি পুনরায় দিল্লী প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে উজীর ইমাদুল মুল্ক্‌ সম্রাট ২য় আলমগীরকে হত্যা করান। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তৎকালে বিহার অভিযানে আধুনিক শোন ইস্ট ব্যাঙ্ক রেল স্টেশনের পাঁচ মাইল উত্তরে

গোথাউলিতে অবস্থানকারী আলী গওহর ২য় শাহ্ আলম নাম নিয়ে ১৭৫৯-এর ডিসেম্বরে সেখানেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংরেজদের সঙ্গে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এলাহাবাদ চুক্তির ফলে শাহ্ আলম পেলেন কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি, যার রাজস্ব ছিল বার্ষিক আনুমানিক ২৮ লক্ষ টাকা, এবং বাংলার দেওয়ানি ইংরেজদের দেওয়ার জন্য বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা। (এর থেকে মির্জা নজফ খাঁকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল)। সুতরাং শাহ্ আলমের এ সময় বার্ষিক মোট আয় দাঁড়াল ২৮ + ২৪ = ৫২ লক্ষ টাকা। দায়হীন ভাবে বার্ষিক অর্ধ ক্রোড়াধিক টাকা নিয়ে তাঁর সময় ভালোই কাটছিল কিন্তু ভয় ছিল দিল্লীতে রয়েছেন তাঁর মা ও উত্তরাধিকারী। আবদালি দিল্লী অভিযানের পর (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) নাজিবুদ্দৌলহ্-কে দিল্লীতে প্রধানের পদে বসিয়ে যান। নাজিব শাহ্ আলমের মাতা ও পুত্রের তত্ত্বাবধান করতেন। পরবর্তী কালে শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি শাহ্ আলমকে দিল্লী ফিরে যেয়ে মাতা-পুত্রের এবং সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহন করতে অনুরোধ করলেন। শাহ্ আলম তাই দিল্লী ফিরতে আগ্রহী হন কিন্তু এলাহাবাদে তাঁর পরামর্শদাতা মুনিরুদ্দৌলহ্ তাঁকে দিল্লী না যেতে পরামর্শ দিলেন, কারণ ইংরেজদের অর্থ ও রক্ষনাধীনে (এলাহাবাদে শাহ্ আলমের রক্ষার জন্য একটি ইংরেজ বাহিনী মোতায়েন ছিল) থেকে যাওয়াই ভালো, দিল্লীতে অনিশ্চয়তার মধ্যে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

এলাহাবাদে যেমন দিল্লী যাওয়ার একটি বিরোধী দল ছিল, তেমনি দিল্লী যাওয়ার পক্ষেও একটি দল ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন হুসামুদ্দীন। শেষে মারাঠাদের সাহায্যে শাহ্ আলম দিল্লী ফেরা স্থির করলেন। তিনি এলাহাবাদ থেকে যাত্রা করলেন এপ্রিল মাসে (১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ)। দিল্লীর অনিশ্চয়তার কথা ভেবে যাত্রাকালে শাহ্ আলমের পরিবার ও পরিজনের মধ্যে আতঙ্ক ও হাহাকার দেখা দিয়েছিল। পথে অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলহ্ দেখা করে সম্রাটকে ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন। শুজাউদ্দৌলহ্ ৪০০০ সৈন্য এবং যাত্রার সরঞ্জামাদিও দিয়ে নিজে সঙ্গে যাওয়া থেকে অব্যাহতি নিয়ে ফিরে গেলেন। কানপুর হয়ে পিঠুরে এলে ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল স্যার রবার্ট বারকার এবং তাঁর সঙ্গে পূর্বোক্ত মুনিরুদ্দৌলহ্ও বিদায় নিলেন। শাহ্ আলম কনৌজ হয়ে ফরুখাবাদের কাছে উপস্থিত হলেন। সময়টা ১৭৭১-এর জুলাই-আগষ্ট মাস।

পরের মাসে ফরুখাবাদের ১৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নবীগঞ্জে তিনি বর্ষার জন্য তাবু ফেলে তিন মাস রইলেন। এখানে দেওয়ান নাগরমল কর্তৃক প্রেরিত হয়ে হুসামুদ্দীনের কাছে মীর আসেন। বর্ষার শেষে নভেম্বর মাসে দিল্লী থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এবং মারাঠা সেনাপতি মহাদজী সিন্ধিয়া সম্রাটকে দিল্লী নিয়ে যেতে এলেন। ১৭৭২-এর প্রথম দিন সম্রাট জননী ও অন্যান্যরা আসেন তাঁকে স্বাগত জানাতে। ৬ জানুয়ারি ঈদের পূর্ব দিন সকলকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট দিল্লী দুর্গে প্রবেশ করলেন। দিল্লী এসে হুসামুদ্দীন সম্রাটের উপ উজীর (উপ-প্রধান মন্ত্রী) হয়ে বসলেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে তিনি মারাঠাদের সঙ্গে তাঁদের দাবি দাওয়া (সাহায্য করার জন্য) সম্পর্কে আলোচনা চালালেন। কিন্তু হুসামের সুদিন দীর্ঘস্থায়ী হল না। ইংরেজরা তাঁকে অপছন্দ করতেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরেজরা সম্রাটের পূর্বোক্ত বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে সম্রাটের মন ভালো ছিল না। তদুপরি এ সময় নতুন সেনাপতি মির্জা নজফ খাঁ ধীরে ধীরে দরবারে প্রাধান্য লাভ করছিলেন। হুসাম যোদ্ধাও ছিলেন না। সুতরাং সম্রাট ধীরে ধীরে মির্জা নজফের দিকে ঢললেন (মে, ১৭৭৩)। হুসামের ১½ বছরের সুদিনের অবসান হল। যুদ্ধক্ষেত্রে মির্জা নজফ এবং সম্রাটের পার্শ্বে স্থান নিলেন আব্দুল অহদ খাঁ।

হুসামুদ্দীনকে মীর উল্লেখ করেছেন হুসামুদ্দীন বলেই। কিন্তু আচার্য যদুনাথ একাধিকবার বলেছেন হুসামুদ্দৌলহ্। হুসামুদ্দীন ও হুসামুদ্দৌলহ্ একই ব্যক্তি। উচ্চপদ লাভের পর হুসামুদ্দীন সম্ভ্রান্ত নামে হুসামুদ্দৌলহ্ হয়েছিলেন। পদচ্যুতির পর তিনি আবার হুসামুদ্দীন হন। অব্দুল অহদ খাঁ— আব্দুল অহদ খাঁ (কাশ্মীরী) ছিলেন দিল্লীতে সম্রাট জননী ও যুবরাজের সঙ্গে তৎকাল এলাহাবাদ অবস্থিত সম্রাটের (শাহ্ আলমের) যোগাযোগ রক্ষার জন্য সেকালের প্রধান রাজপুরুষ নাজিবুদ্দৌলহ্ কর্তৃক নিযুক্ত দূত। সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯-এ সম্রাট জননী ও যুবরাজের বার্তা নিয়ে এলাহাবাদে গেলে সম্রাটের সঙ্গে আব্দুল অহদের প্রথম পরিচয় হয়। নাজিবুদ্দৌলহ্-র মৃত্যুর পর (অক্টোবর, ১৭৭০) আব্দুল অহদ নাজিব পুত্র জবিতা খাঁর সঙ্গে থাকেন। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে সম্রাট অগ্রসর হলে জবিতা খাঁর প্রস্তাব ও উপঢৌকন নিয়ে আব্দুল অহদ সম্রাটের কাছে যান (নভেম্বর, ১৭৭১)। সম্রাট বাহিনীর

সঙ্গে জ.বিতার যুদ্ধ ও পরাজয়ের পরও মার্চ, ১৭৭২-এ সম্রাট জ.বিতার অনুগামী আব্দুল অহদকে ক্ষমা করেন। ১৭৭৩-এর মে মাসে শাহ্ আলমের প্রধান রাজপুরুষ নজফ খাঁ (পারসিক) আব্দুল অহদ খাঁকে উপ-উজীর নিযুক্ত করান। এই পদে তৎপূর্বে ছিলেন হুসামুদ্দীন। তাঁকে রাজকোষে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থতার অভিযোগে পদচ্যুত করা হয়। হুসামুদ্দীনের মারাঠা-সমর্থন নীতিও সম্রাটের অপছন্দ ছিল।

আব্দুল অহদ খাঁ কাশ্মীরীর কথাবার্তা ও আচরণ ছিল সম্রাটের খুবই প্রিয়। ক্রমে আব্দুল অহদ দরবারে শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ এবং সম্রাটের সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। কিন্তু সেনাপতি নজফ খাঁর সঙ্গে ক্রমাগত শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করায় নজফ খাঁ ১৭৭৯-র নভেম্বরে আব্দুল অহদকে বন্দী করেন এবং এভাবে তাঁর ৬½ বছরের প্রাধান্যের অবসান হয়। পরে ১৭৮২ ও ১৭৮৩-তে তিনি পুনরায় পাদপ্রদীপের আলোয় এলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী আর কখনও হন নি। ১৭৮৪'র মে মাসে মীর-বংশী আফ্রাসিয়াব তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে বন্দী করেন। নভেম্বরে সম্রাটের আদেশে তাঁর মুক্তি হয় এবং পুনরায় তিনি বন্দী হন। এরপর অতিবৃদ্ধ আব্দুল অহদের কি হল জানা যায় না।

সম্রাটের দুরবস্থা এবং মীরের লক্ষ্ণৌ গমনের পটভূমি— পিতা সম্রাট ২য় আলমগীরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ১৭৫৯-এর ২৪ ডিসেম্বর বাইরে অবস্থানকারী যুবরাজ আলী গওহর বিহারে নিজেকে সম্রাট ২য় শাহ্ আলম বলে ঘোষণা করে' সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর বারো বছর ধরে তাঁর দিল্লী ফেরার চেষ্টা চলে। অবশেষে ১৭৭১-এর এপ্রিলে এলাহাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে' (এ সময়ে তিনি এলাহাবাদ দুর্গে বাস করতেন) সরাই আলমচাঁদ, সুজায়েৎপুর, কুরা, আজমৌ, কানপুর, বিঠুর, কনৌজ, ফররুখাবাদ, নবীগঞ্জ, সুরেযপুর ও ঘারৌলি হয়ে পর বৎসরের (১৭৭২) ৬ জানুয়ারী তিনি দিল্লী ফিরে আসেন। এ সময়ে সম্রাটের প্রধান বিশ্বাসভাজন রাজপুরুষ ছিলেন হুসামুদ্দীন। দেওয়ান নাগরমল মীরকে ফররুখাবাদে হুসামুদ্দীনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহী শিবির ফররুখাবাদে ছিল ১৭৭১-এর জুলাই-আগষ্ট মাসে। মীর এ সময়েই হুসামুদ্দীনের কাছে এসেছিলেন। নাগরমল এ সময়ে কোনো প্রকারে বিপন্ন

ছিলেন না। কেবল ছ' বছর পূর্বে শিখরা তাঁর জাগীর লুট করেছিল। তবু যে তিনি এই সময়েই মীরকে তাঁর আশ্রয়চ্যুত করলেন তার কারণ মনে হয় পারিবারিক। দেওয়ান নাগরমলের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন মীরের সুহৃদ এবং এ কারণেই কনিষ্ঠ ছিলেন মীরের বিরোধী। কনিষ্ঠ ছিলেন পিতার প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বাসভাজন। এঁরই পরামর্শে দেওয়ান নাগরমল সম্রাটকে স্বাগত জানাতে না গিয়ে দিল্লীস্থিত মারাঠাদের আশ্রয়ে চলে যান। হুসামের আশ্রয়ও মীর বেশিদিন পান নি। রাজকোষে অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার অভিযোগে দেড় বৎসরের মধ্যে (মে, ১৭৭৩) হুসামকেও অপসারিত করা হয়েছিল।

ফরুখাবাদের কাছে সম্রাটের শিবির বর্ষার জন্য ক' মাস থেকে যায়। হুসামুদ্দীনের কাছে মীর কয়েক মাস ছিলেন মনে হয়। এ সময়টা মীরের ভালোই কেটেছিল, কেননা দীর্ঘকাল বাদে সম্রাটের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য চারিদিকেই খুশীর আবহাওয়া বইছিল। কিন্তু দেওয়ান নাগরমলের মারাঠাদের কাছে চলে যাওয়ার জন্য দিল্লীতে এসে মীর বিব্রত হয়ে পড়েন এবং দেওয়ান নাগরমলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবু অনতিবিলম্বে মীর শেষবারের মতো অনাথ হন।

দিল্লী এসে মীর এবার একান্তে পড়ে রইলেন। সম্রাট ২য় শাহ্ আলম তখন দিল্লীতে স্থিতি লাভ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের হাঙ্গামায় তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াও আর্থিক অনটন ছিল বড় সমস্যা। সম্রাট-পরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাসিক লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন হ'ত। দিল্লীতে যিনি যখন প্রধান হতেন তাঁকে এই অর্থের ব্যবস্থা করতে হত। এ সময়ে মির্জা নজফ খাঁ ছিলেন দিল্লীতে প্রধান। তিনি খুব ভালো সেনাপতি ছিলেন আচার্য যদুনাথের মতে তিনি ছিলেন দিল্লীর শেষ যোগ্য মোগল সেনাপতি, কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতা তাঁর একেবারেই ছিল না। ১৭৭২-এ সম্রাটের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর থেকে মির্জা নজফ ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে ১৭৭৯-র শেষে দরবারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল অহদের পতনের পর সর্বাধিনায়ক হন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁর অপশাসন ও প্রশাসনিক দীনতা রাষ্ট্রকে দেউলিয়ায় পরিণত করে এবং সর্বত্র দুঃখকষ্ট দেখা দেয়। সৈন্যদের বেতন বাকি, কর্মচারীদের বেতন বাকি, সম্রাটের ভরণপোষণের অর্থ নেই, সম্রাট পরিবারের দিন কাটে উপবাসে।

অভুক্ত হতাশ সম্রাট একদিন তাঁর দাসকে বলেন, "তুই যদি আজ কিছু আহার করিস তবে তা হবে শূকর রক্ত পানের তুল্য", কেননা সেদিন সম্রাট নিজেই সম্ভবত অভুক্ত ছিলেন। অন্য একদিন নিজ অবস্থার বর্ণনায় সম্রাট বলেন, আমার অবস্থা এমন যে আমার একটির বেশি দু'টি জামা নেই। নজফের কর্মের নিন্দায় সম্রাট শের রচনা করে' পুত্রপৌত্রাদিকে শোনান :

জহাঁ-রা জহাঁদার দরদ্ খ.রাব
জে. দস্ত্-এ-নজফ খাঁ ওরা আফ্রাসিয়াব
জগতের প্রভু জগৎ নাশিছে কি এ
নজফ খাঁ ও আফ্রাসিয়াব দিয়ে?

আফ্রাসিয়াব ছিলেন নজফের প্রধান সহকারী।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্ আলমের এ অবস্থা ছিল। নতুবা তিনি হয়তো মীরের জন্য কিছু করতেন। মীরের লেখা থেকে জানা যায় যে ফারুখ'বাদ থেকে দিল্লী ফেরার পর সম্রাট তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। মীর অবশ্য যেতেন না। (কিন্তু সম্রাট ডেকে পাঠালে দিল্লীতে থেকে মীর কী করে না যেয়ে পারতেন, তাও বোঝা মুস্কিল)। তা সত্ত্বেও সম্রাট মাঝে মাঝেই মীরকে সাহায্য পাঠাতেন। এ থেকে সম্রাটের মীরের প্রতি অনুকূল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট নিজেও কবি ছিলেন, তুর্কি, ফার্সী, আরবী ও হিন্দুস্থানী (উর্দু) ভাষা তিনি জানতেন। তাই কবি হিসাবে মীরের গুরুত্ব তিনি বুঝতেন। কিন্তু নিজ দুর্দশার জন্য মীরের ভার গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে সম্রাট শাহ্ আলম দিল্লী ফিরেই রাষ্ট্রের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েন। ১৭৭২-এর জানুয়ারিতে দিল্লী এসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাট ও রোহিলাদের উপর প্রভুত্ব পুনঃ স্থাপনে তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হ'তে হ'ল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে সম্রাট ২য় আলমগীরের হত্যার পর থেকে পুত্র সম্রাট ২য় শাহ্ আলমের দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসর দিল্লী ছিল প্রভুহীন নগরী। এই অবস্থার সুযোগ সকলেই গ্রহণ করে। বিশেষ করে রোহিলা, জাট ও অযোধ্যা রাজ্য এর ফলে প্রভূত সম্পদ সঞ্চয় করে উত্তর ভারতে তিন শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী রাজ্যে

পরিণত হয়।* ১৭৬৩-র ডিসেম্বরে জাট রাজা সূরযমল রোহিলা সর্দার নাজিবুদ্দৌলহ্-র সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। পাঁচ বৎসর পরে তাঁর পুত্র জওয়াহির সিং ১৭৬৮'র আগষ্টে নিজের এক সৈন্যের হাতে নিহত হন। ১৭৭০-এর অক্টোবরে নাজিবুদ্দৌলহ্ মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন পুত্র জ়াবিতা খাঁ। অযোধ্যায় নবাব শুজাউদ্দৌলহ্ ছিলেন নামে দিল্লীর উজীর (প্রধান মন্ত্রী)। তিনিও পিতা উজীর সফদর জঙ্গের ন্যায় কখনো দিল্লীতে বাস করে' এই পদের দায়িত্ব পালন করেন নি। এ কাজ করতেন প্রথমে হুসামুদ্দীন, পরে সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র উপ প্রধানমন্ত্রী আব্দুল অহদ খাঁ এবং আব্দুল অহদ খাঁর পতনের পর মির্জা নজফ খাঁ। অযোধ্যার বিরুদ্ধে দিল্লী কখনো যুদ্ধ করে নি। কিন্তু অপর দুই শক্তির বিরুদ্ধে দিল্লী বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রথমে রোহিলাদের সঙ্গে। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে রোহিলাদের সঙ্গে সন্ধি হয়। ১৭৭৭-৭৯-তে পুনরায় রোহিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সন্ধি হয়। এদিকে জাট রাজা জওয়াহির সিংয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা রতন সিং এবং তাঁর মৃত্যুর (এপ্রিল, ১৭৬৯) পর নওয়ল সিং ও রঞ্জিৎ সিং জাটদের নেতৃত্ব করেন কিন্তু শেষোক্ত দু'জনার কলহ জাট শক্তিকে দুর্বল করে। অবশেষে দিল্লীর সেনাপতি মির্জা নজফ খাঁর নেতৃত্বে সম্রাট বাহিনী জাটদের পরাস্ত করে। দীর্ঘ তেরো বছর জাটদের অধীনে থাকার পর ১৭৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে আগ্রা জাটদের কাছে থেকে সম্রাট বাহিনী পুনরাধিকার করে। বহিরাক্রমণ এবং অন্তঃকলহে দীর্ণ দিল্লী অপেক্ষা নিরাপদ আগ্রাই ছিল অধিকতর সম্পদশালী। মোগল সম্রাটদের সম্পদও এখানেই রক্ষিত হ'ত, এই নগরী জুন, ১৭৬১-তে জাট রাজা সূরযমল দিল্লীর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। এ সময়ে আগ্রা ছিল সাম্রাজ্যে সবচেয়ে ধনী নগরী। ১৭৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নওয়ল সিংয়ের সময়ে সম্রাট বাহিনী পুনরায় জাট অঞ্চলে অভিযান চালায় এবং ১৭৭৬-এর এপ্রিলে জাটদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি ডিগ দুর্গের পতন হয়। রঞ্জিৎ সিং তখন এই দুর্গে ছিলেন। তিনি পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করেন। জাট শক্তিরো এর সঙ্গে সঙ্গেই পতন হয়।

দিল্লী বাহিনীর এসব সাফল্যের মূলে ছিলেন সেনা-প্রধান মির্জা নজফ

খাঁ। কিন্তু দরবারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কাশ্মীর নিবাসী পূর্বোক্ত আব্দুল অহদ খাঁ। মির্জা নজফের ক্রমাগত সাফল্যে ঈর্ষান্বিত আব্দুল অহদ খাঁ দরবারে বসে সম্রাট শাহ্ আলমকে মির্জা নজফের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন এবং মির্জা নজফের পতনের চেষ্টা করতেন। পূর্ব বর্ণিত জাভিদ খাঁ ও সফদর জঙ্গের পারস্পরিক শক্তিদ্বন্দ্বের যেন এবার পুনরাবৃত্তি হ'ল। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে জাভিদের গুপ্ত হত্যায় ঘটনায় পরিসমাপ্তি হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ঘটনারপরিসমাপ্তি হয় আব্দুল অহদের দরবার থেকে অপসরণ ও বন্দী দশায়। সফদরের ন্যায় মির্জা নজফও প্রতারনা করে আব্দুল অহদকে বন্দী করেন, কিন্তু তাঁর প্রাণনাশ করান নি। সাতাশ বৎসর পরে দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে একটি নাটকের পুনরাভিনয় হ'ল। ১৭৭৯'র নভেম্বরে এ ঘটনা ঘটে।

এরপর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নজফ খাঁ প্রায় আড়াই বৎসর দিল্লীতে একচ্ছত্র আধিপত্য (করেন ডিসেম্বর, ১৭৭৯ থেকে এপ্রিল, ১৭৮২-তে মৃত্যু পর্যন্ত)। এ সময়টা ছিল দিল্লীর অত্যন্ত সুসময়, যদিও নিন্দাহীন চরিত্রের অধিকারী মির্জা নজফের এ সময়ে চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে, যা অবশেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। ঐতিহাসিক তাহ্‌মাস্প খাঁ মিসকিন এ সময়ের দিল্লীর বর্ণনায় লিখেছেন: 'রাজধানীতে এখন সকলের মধ্যেই সুখের এক সাধারণ প্রবাহ বইছে। প্রতি গৃহে বিবাহ ও আনন্দ। নগরীর সর্বত্র ক্রয়বিক্রয় চলছে, নতুন নতুন গৃহ নির্মিত হচ্ছে, বেচা কেনা হচ্ছে। এ সকলই মির্জা নজফের সহৃদয় ও যোগ্য প্রশাসনের ফল। তুরাণী, ইরাণী ও হিন্দুস্থানী সকলেই সুখী, সমৃদ্ধ ও আনন্দিত।'[১]

এপ্রিল, ১৭৮২-তে মির্জা নজফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর স্বল্পকালীন সুখের দিন অপগত হ'ল। শুরু হ'ল ক্ষমতা দখলের লড়াই তাঁর চার মুখ্য সহকারীর মধ্যে। এঁরা হলেন আফ্রাসিয়াব খাঁ, মির্জা শফী খাঁ, নজফ কুলী খাঁ এবং মুহম্মদ বেগ হামাদানী। এই লড়াইয়ে প্রথম বিজয়ী হলেন আফ্রাসিয়াব খাঁ (এপ্রিল, ১৭৮২), তারপর মির্জা শফী (সেপ্টেম্বর, ১৭৮২)। এরপর এঁদের ভাগ্য ওলট পালট হতে লাগল। কখনো প্রথম জন জিতলেন, কখনো দ্বিতীয় জন। এই সব উত্থান পতনের মধ্যে প্রথমে নিহত হলেন

শফী (সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩)' তারপর আফ্রাসিয়াব (নভেম্বর, ১৭৮৪)।

আফ্রাসিয়াব ও শফীর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের প্রথম প্রকাশ দেখা দেয় ১৭৮২'র জুলাই মাসে। রাজধানী গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। দু' মাস ধরে এই সন্ত্রাস বজায় থাকে। শেষে সেপ্টেম্বর মাসে শফীর হঠাৎ আক্রমণে প্রতিপক্ষের কেউ কেউ বন্দী ও নিহত হলেন। সম্রাট বাধ্য হয়ে শফীকে মীর বখশী (উজীরের পর শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ) নিযুক্ত করেন। এরপর থেকে চক্রান্ত ও সংঘাত চলতেই থাকে। পরের মাস অক্টোবরে সম্রাট শফীকে অপসারিত করেন। নভেম্বরে শফী আবার রাজধানীতে প্রাধান্যে ফিরে আসেন। এই মাসেই হামাদানী বিপক্ষীয় লতাফৎ আলীকে অন্ধ করে দেন এবং লতাফতের সহকারী জর্মান সেনানায়ক পউলিকে খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করেন। ১৭৮২ এ ভাবেই শেষ হয় এবং ১৭৮৪ পর্যন্ত অস্থির অবস্থা চলতেই থাকে। ঐ বছরে সম্রাটের আমন্ত্রণে মারাঠা সেনাপতি মহাদজী সিন্ধিয়া সাম্রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেন। শেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা পরবর্তী মারাঠা সেনাপতি দৌলৎরাও সিন্ধিয়াকে পরাজিত করে' দিল্লী দখল করলে মোগল শাসনের অবসান হয়। মীর ১৭৮২-তে দিল্লী ত্যাগ করেন। ১৭৮২'র এপ্রিলে যখন মির্জা নজফের মৃত্যু হয় তখন সম্ভবত মীর দিল্লীতেই ছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্ণিত পরের গোলোযোগের সময়ে সম্ভবত তিনি দিল্লী ছেড়ে যান। মির্জা নজফের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাধিকারের সংগ্রামে সন্ত্রস্ত দিল্লীতে সম্ভবত এ সময়েই মীরের কাছে আসফুদ্দৌলহ্-র লক্ষ্ণৌ গমনের আমন্ত্রণ আসে। আমন্ত্রণ পূর্বে এসে থাকলেও এবং তাঁর প্রিয় দিল্লীর মায়া ত্যাগ করতে পূর্বে ইতস্তত করে থাকলেও মীর এখন আর আমন্ত্রণ গ্রহণে ইতস্তত করলেন না। সুতরাং মনে হয় ১৮৮২'র এপ্রিলের পর কোনো এক সময়ে মীর দিল্লী ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌ চলে যান।

অযোধ্যার নবাব আসফুদ্দৌলহ্-র সম্পর্কে তৎকালীন বৃটিশ রাজপুরুষ সার জে শোর একটি চিঠিতে লিখেছেন: 'প্রতি সন্ধ্যায় আসফুদ্দৌলহ্ আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন। তাঁর ইয়ার বন্ধুরা হচ্ছে সব চেয়ে নীচ প্রকৃতির। গুণবান লোকদের সংসর্গ করতে তিনি ভয় পান। আমোদ প্রমোদের জন্য তিনি এক কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের তিনি প্রখ্যাত

শাসনকর্তা। কিন্তু তাঁর দরবার ভরে আছে ভিখারী, ভাঁড়, নর্তক ও ঐ জাতীয় লোকে এবং নির্বোধ ও চাটুকারে। আচার্য্য যদুনাথ লিখেছেন যে আসফুদ্দৌলহ্-র কাছে যারা যা কিছু চাইত তাদের সকলকেই পূর্বাপর চিন্তা না করে তিনি তাই দান করতেন এবং সেজন্য তাঁরা তাঁকে পূজা করত। ১৭৭৫-এ পিতা শুজাউদ্দৌলহ্-র মৃত্যুর পর আসফুদ্দৌলহ্ উত্তরাধিকার সূত্রে দিল্লীর উজীর হন। কিন্তু পিতা যেমন সাম্রাজ্যের কিছুই দেখতেন না, তিনিও তেমনি দেখতেন না। সে ইচ্ছা বা ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন চারিত্রিক দৃঢ়তাহীন ভোগী পুরুষ। তাঁর আচরণে বাইরের চাকচিক্য ছিল ঠিকই, তবে তা তাঁর আভ্যন্তরীণ শূন্যতা গোপন করতে পারত না।

পিতা শুজাউদ্দৌলহ্-র সময়েই অযোধ্যা ইংরেজ রক্ষনাধীনে আসে। সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহের আর প্রয়োজন থাকে না। 'পুরুষত্বহীন' আসফুদ্দৌলহ্-র শাসনকার্যে বিরক্ত হয়ে যোগ্য সেনাপতি মেহবুব আলী খাঁ অযোধ্যা ত্যাগ করে চলে যান। এ সব সত্যি। কিন্তু আসফুদ্দৌলহ্ গুণবান লোকদের সঙ্গ করতে ভয় পান, সার শোরের এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। আচার্য যদুনাথও এ কথার প্রতিবাদ করেননি। সম্ভবত উর্দু সাহিত্যিকদের জন্য আসফুদ্দৌলহ্ যা করেছেন আচার্য যদুনাথ সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সওদা, মীর, হাসান এবং আরো বহু দিল্লী ও অন্যত্রবাসী উর্দু সাহিত্যিকদের সাহায্য দিয়ে, লক্ষ্ণৌতে অনেক কবি-সাহিত্যিককে আশ্রয় দিয়ে এবং লক্ষ্ণৌর বহু খ্যাত অখ্যাত কবি সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসফুদ্দৌলহ্ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে নিজ নাম অক্ষয় করে গেছেন। উর্দু সাহিত্য যত দিন থাকবে ততদিন এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনিও অমর হয়ে থাকবেন। এ ছাড়া নির্মান কার্যের পৃষ্ঠপোষকরূপেও আসফুদ্দৌলহ্-র খ্যাতি রয়েছে। তাঁকে বলা হয় ক্রমবর্ধমান লক্ষ্ণৌ নগরীর পিতা। লক্ষ্ণৌ শহর বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদির জন্য বিখ্যাত। এর মধ্যে বেশ কিছু আসফুদ্দৌলহ্-র কীর্তি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে রূমী (তুর্কী) দরওয়াজা, রেসিডেন্সি, বড় ইমামবরা প্রভৃতি। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে রূমী দরওয়াজার আংশিক প্রতিলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। (লক্ষ্ণৌর সৌধগুলির ন্যায়

রূমী দরওয়াজাও মুখ্যত ইষ্টক নির্মিত, প্রস্তর নির্মিত নহে।)

তবে তাঁর চরিত্রের অপ্রশংসনীয় যে সব দিকের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, তা সত্যবিগর্হিত নয় মনে হয় তাঁর সময়ে লক্ষ্নৌ দরবারের সম্ভ্রম এবং লক্ষ্নৌ শহরের সাংস্কৃতিক মান অবনত হয়েছিল। উর্দু সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হয়েও তিনি লক্ষ্নৌ শহরকে সংস্কৃতিক মর্যাদা দিতে পারেন নি, যদিও ঐ শহরে তাঁরই সহায়তায় বহু গুণিজনের সমাবেশ হয়েছিল। লক্ষ্নৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্-র প্রপৌত্র অধুনা কলকাতার সন্নিকটে মেটিয়া বুরুজ নিবাসী শ্রীঅঞ্জুম ক.দরের মতে 'আসফুদ্দৌলহ্ নয়, লক্ষ্নৌকে সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়েছিলেন ওয়াজিদ আলী শাহ'। কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের (১৮৭২ খ্রীঃ) বহু বছর পূর্বে তিনি তাঁর রাজত্ব কালে (১৮৪৭-৫৬ খ্রীঃ) লক্ষ্নৌতে নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেন এবং সেখানে কবি আগা হাসান আমানৎ (১৮১৫-৫৮ খ্রী) কর্তৃক রচিত 'ইন্দর সভা' (ইন্দ্র সভা) নৃত্য নাট্য মঞ্চস্থ হয়। আসফুদ্দৌলহ্-র মতো বহু গুণিজনের সান্নিধ্য তিনি পান নি। (সওদা, মীর, হাসান, দর্দ্ প্রভৃতির তুলনায় আমানৎ একান্তই অনুজ্জ্বল।) তবু যা পেয়েছেন তারি সাহায্যে ওয়াজিদ আলী শাহ্ লক্ষ্নৌর সাংস্কৃতিক আবহাওয়া উজ্জ্বল করে তোলেন। তাঁর 'রহস' নৃত্যনাট্যের এবং আমানতের পূর্বোক্ত নাটকের বিষয়বস্তু যথাক্রমে রাধা কৃষ্ণ প্রেম এবং স্বর্গের ইন্দ্র সভা। উভয়ের বিষয়বস্তুই হিন্দু ধর্মের। অন্য ধর্মের বিষয় নিয়ে নাটক রচনা ও উপস্থাপনা ওয়াজিদ আলী শাহ্ (ও আমানতের) সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিচয়। ইসলাম অননুমোদিত নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত করে তিনি সাহসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। নাটক অভিনয়ে জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে বহু লোকও নিযুক্ত করেছিলেন। লক্ষ্নৌ ঠুংরীর জনপ্রিয়তার কারণ তিনি। তিনি নৃত্যের প্রসারেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি কথক নৃত্যের পৃষ্টপোষ ছিলেন। তাঁর সময়ে ভারতে তিনিই ছিলেন নৃত্যগীতের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। এসব ছাড়াও তিনি ছিলেন উর্দুর এক স্বীকৃত কবি। তাঁর ছদ্মনাম (তখল্লুস) ছিল অখতার (সূর্য)। তাঁর রচিত ফার্সী ও উর্দু গদ্য ও কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। নির্মাণ কার্যও তিনি করেছেন। লক্ষ্নৌর বিখ্যাত কাইসর বাগ ও সিকন্দর বাগ তাঁরই সময়ে নির্মিত হয়।

তবে আসফুদ্দৌলহ্‌ নির্মিত সৌধগুলি উৎকৃষ্ট তর। ওয়াজিদ আলী শাহ্‌-র বিবিধ গুণের তুলনায় আসফুদ্দৌলহ্‌ অবশ্যই পিছনে আছেন কিন্তু নির্মাণ কার্যে এবং শ্রেষ্ঠ ও বহু কবি-সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটানোয় তাঁর স্থান ওয়াজিদ আলী শাহ্‌-র উপরে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

লক্ষ্ণৌ রাজ বংশের তালিকা নিম্নরূপ। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌর অওধ কালচারাল ক্লাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌ নামক একটি নাটক মঞ্চস্থ করা প্রসঙ্গে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটিতে ডঃ বি এস্‌ সাকসেনা লক্ষ্ণৌ রাজবংশের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এতে লক্ষ্ণৌর রাজবংশের ১২ জন নৃপতির নাম আছে। কলকাতার মেটিয়াবুরুজে লক্ষ্ণৌ রাজবংশের যে সিবতয়েনাবাদ (সিবতয়েন, অর্থাৎ দুই নাতি, হজরৎ মুহম্মদের দুই দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসেনের আবাদ, বাসস্থান) ইমামবরা আছে, তার অছি পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৪খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তিকায় এই বংশের পূর্ণ তালিকা আছে। তাতে নৃপতি সংখ্যা ১৩। এই তারতম্যের কারণ প্রথমটিতে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত রফিউদ্দীন হায়দরের নাম নেই। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে অযোধ্যার বিভিন্ন নবাবদের নাম পাওয়া যায়। উর্দু কবি মির্জা গালিবের উর্দু চিঠিতে গাজিউদ্দিন হায়দর নসীরুদ্দীন হায়দর, আমজাদ আলী শাহ এবং ওয়াজিদ আলি শাহ্‌-র নাম পাওয়া যায়। কোনো একটি গ্রন্থে অযোধ্যার সম্পূর্ণ রাজবংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস আমাদের কাছে লভ্য হয়নি। উর্দুতে নাকি এ রকম গ্রন্থ আছে। ইংরাজিতে দু'টি গ্রন্থ পাওয়া যায়, শ্রীআশীর্বাদী লাল শ্রীবাস্তবের গ্রন্থ এবং কলকাতার কে. পি. বাগচী কোং কর্তৃক প্রকাশিত 'অযোধ্যার সঙ্গে ব্রিটিশ সম্পর্ক' নামাঙ্কিত গ্রন্থ। বাংলায়ও ওয়াজিদ আলী শাহ্‌ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ আছে। তবে কোনো গ্রন্থেই এই বংশের পূর্ণ ইতিহাস নেই। আমরা পূর্বোক্ত অছি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বংশ তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

১। মীর মুহম্মদ আমিন সাদাৎ খাঁ বুরহানুল মুল্ক্‌ (১৭২২-৩৯)

২। মির্জা মুহম্মদ মুকিম আবুল মনসুর খাঁ সফদর জঙ্গ (১৭৩৯-৫৪)

৩। জলালুদ্দীন হায়দর শুজাউদ্দৌলহ্‌ (১৭৫৪-৭৫)

৪। আসফুদ্দৌলহ্‌ (১৭৭৫-৯৭)

৫। ওয়াজির আলী খাঁ (১৭৯৭-৯৮) পদচ্যুত
৬। সাদৎ আলী খাঁ (১৭৯৮-১৮১৪)
৭। গাজিউদ্দীন হায়দর (১৮১৪-২৭)
৮। নসীরুদ্দীন হায়দর (১৮২৭-৩৭)
৯। রফিউদ্দীন হায়দর মুন্নাজান (১৮৩৭) পদচ্যুত
১০। মুহম্মদ আলী শাহ্ (১৮৩৭-৪২)
১১। আমজাদ আলী শাহ্ (১৮৪১-৪৭)
১২। ওয়াজিদ আলী শাহ্ (১৮৪৭-৫৬)। এঁর সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যা রাজ্য অধিগ্রহণ করে।
১৩। বিরজিস কদর (১৮৫৭-৫৯)। ১৮৫৬'র অধিগ্রহণের পর ওয়াজিদ আলী শাহ্ কলকাতা চলে যান। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেবল বিরজিস কদর লক্ষ্ণৌতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে থেকে যান। ১৮৫৭'র অভ্যুত্থানের সময় ইনি এবং এঁর মাতা বেগম হজরৎ মহল তাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিরজিস কদরকে অযোধ্যার নৃপতি বলে ঘোষণা করা হয়। মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জফরও এতে সম্মতি জানান। অভ্যুত্থান দমনের পর উভয়ে নেপাল চলে যান। সেখানে বেগমের মৃত্যু হলে (১৮৭৯) বিরজিস কদর কলকাতা চলে আসেন। কলকাতায় তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন (১৮৯৩)।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হ'ল তা থেকে মীরের জীবনের সম্ভাব্য ঘটনা-পঞ্জী নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

১৭২৪ খ্রীঃ (বা ১৭২২ খ্রীঃ)	আগ্রায় জন্ম।
১৭৩৫ খ্রীঃ	পিতার মৃত্যুর পর প্রথম আগ্রা থেকে দিল্লী গমন ও বৃত্তি লাভান্তে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন।
১৭৩৯ খ্রীঃ (শেষার্ধ)—১৭৪০ খ্রীঃ (পূর্বার্ধ)	পুনরায় দিল্লী গমন এবং আরজু'র কাছে আশ্রয় ও শিক্ষা লাভ এবং আশ্রয়চ্যুতি। এ সময়ে আরজু নিজেই আশ্রয়ের আশায় দিল্লী ত্যাগ করে' লক্ষ্ণৌ যান।

১৭৪০ খ্রী: (শেষার্ধ)- ১৭৪২-৪৩	ফখরুদ্দীনের স্ত্রীর কাছে আশ্রয়, উন্মাদাবস্থার চিকিৎসা এবং তাঁর আশ্রয়ে শিক্ষালাভ ও কবিতা রচনা চর্চা।
১৭৪২-৪৩খ্রী: - ১৭৪৯-৫০খ্রী:	এককালীন উজীর ইতিমাদুদ্দৌলহ্ কমরুদ্দীন খাঁর দৌহিত্র রিয়াযৎ খাঁর কাছে আশ্রয়।
১৭৪৯-৫০খ্রী: আগষ্ট, ১৭৫২খ্রী:	'নবাব বাহাদুর' জাভিদ খাঁর কাছে আশ্রয়।
আগষ্ট, ১৭৫২খ্রী—নভেম্বর, ১৭৫৩খ্রী:	রাজা লছমীনারায়ণের কাছে আশ্রয়।
নভেম্বর, ১৭৫৩খ্রী:— মে, ১৭৫৪খ্রী:	নিঃসহায়।
মে, ১৭৫৪খ্রী:—জানুয়ারী, ১৭৫৭খ্রী:	রাজা যুগলকিশোরের কাছে আশ্রয়।
জানুয়ারি, ১৭৫৭খ্রী:— জুলাই/আগষ্ট, ১৭৭১খ্রী:	দেওয়ান নাগরমলের কাছে আশ্রয়।
জুলাই/আগষ্ট, ১৭৭১খ্রী:— জানুয়ারী, ১৭৭২খ্রী:। (১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হুসামুদ্দীনকে উপ-উজীরের পদ থেকে অপসারিত করা হয়। ঐ সময় পর্যন্ত মীর তাঁর কাছেও থাকতে পারেন। তবে সম্রাটের প্রতি অসৌজন্য-অপরাধের জন্য জানুয়ারি, ১৭৭২-এ সম্রাটের সঙ্গে দিল্লী ফিরে হুসামুদ্দীন নাগরমলের	হুসামুদ্দীনের কাছে আশ্রয়।

অপরাধে তাঁর আশ্রিত মীরকেও বর্জন করে থাকতে পারেন।)

জানুয়ারি, ১৭৭২খ্রীঃ—নভেম্বর, ১৭৭৯খ্রীঃ	নিরাশ্রয়, পরে কাশ্মীরের সুবাদার আবুল বরকাৎ খাঁর পুত্র এবং আব্দুল অহদ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল কাসেম খাঁর বন্ধুত্ব।
নভেম্বর, ১৭৭৯খ্রীঃ—এপ্রিল, ১৭৮২খ্রীঃ	সম্রাট শাহ্ আলম কর্তৃক মাঝে মাঝে সহায়তা।
এপ্রিল, ১৭৮২'র পর কোনো এক সময় থেকে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত।	লক্ষ্ণৌর নবাব আসফুদ্দৌলহ্ ও নবাব সাদাৎ আলী খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লক্ষ্ণৌতে বাস ও মৃত্যু।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ থেকে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ৪২½ বছরের দিল্লী বাসের মধ্যে ১৯ বছর (১৭৫২–৭১ খ্রীঃ) মীর তিন হিন্দু রাজপুরুষের আশ্রয়ে বাস করেন। মীরের জীবন ও সাহিত্যে এর প্রভাব পড়েছিল। সূফী পিতার প্রভাব এবং দীর্ঘকাল হিন্দুর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মীর ধর্ম বিষয়ে উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। এই সংস্করণের বহু কবিতায় তার প্রমাণ আছে।

অনুধাবনের সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট সময়ে মোগল সম্রাটগণ এবং প্রধান রাজপুরুষদের তালিকা এখানে দেওয়া হল:

সম্রাট	প্রধান রাজপুরুষ
মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-৪৮খ্রীঃ)	ইতিমাদুদ্দৌলহ্ কমরুদ্দীন খাঁ।
আহম্মদ শাহ্ (১৭৪৮-৫৪খ্রীঃ)	সফদর জঙ্গ (জুন, ১৭৪৮- মে, ১৭৫৩), ইন্তিজামুদ্দৌলহ্ (মে, ১৭৫৩-জুন, ১৭৫৪)।

২য় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯খ্রী:)	গা।জিউদ্দীন ইমাদুল মুল্ক (জুন, ১৭৫৪-জানুয়ারি, ১৭৬১)
২য় শাহ্ আলম (১৭৭১-এর শেষ পর্যন্ত রাজধানীতে অনুপস্থিত) (১৭৫৯-১৮০৬খ্রী:)	নাজিবুদ্দৌলহ্ (১৭৬১-১৭৭০খ্রী:), নজফ খাঁ (১৭৭২-৮২খ্রী:), আফ্রাসিয়াব খাঁ ও মুহম্মদ শফী (১৮৮২-৮৪খ্রী:), মহাদজী সিন্ধিয়া (১৭৮৪-১৭৯৪)খ্রী: এবং দৌলৎরাও সিন্ধিয়া (১৭৯৪-১৮০৩ খ্রী:) ব্রিটিশ আশ্রয় (১৮০৩-০৬ খ্রী:)

জীবন কথার উৎস

সার যদুনাথ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে (পৃ: ১৭)— সার যদুনাথের জন্ম হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

মীরের আত্মজীবনী ছাড়া আরো কিছু অনুরূপ সাহিত্যগ্রন্থ ইতিহাস রচনার উপাদান সরবরাহ করতে পারে। এগুলি সবই হিন্দী সাহিত্যের উত্তর মধ্যকালের (১৬৪৩-১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের) রচনা। এই গ্রন্থগুলির রচয়িতারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থগুলি রচনা করেন। তবু বহু ঐতিহাসিক উপাদান এসব গ্রন্থে নিহিত থাকার সম্ভাবনা। এরূপ একটি গ্রন্থ সূদন লিখিত সুজান চরিত। (বইটির নাম সার যদুনাথ সুজান চরিত্র বলে উল্লেখ করেছেন) এরূপ আরো কিছু গ্রন্থের নাম ও বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল: ভূষণ কর্তৃক শিবাজীর প্রশস্তিতে লিখিত শিবরাজভূষণ (১৬৭৩খ্রী:) ও শিবাবাওনী, ছত্রসাল বুন্দেলার প্রশস্তিতে লিখিত ছত্রসালদর্শক, লালকবির ঐরূপ গ্রন্থ ছত্র প্রকাশ, দেব কর্তৃক দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাতীরামের পুত্র সুজানমণির প্রশস্তিতে লিখিত সুজান বিনোদ এবং পদমাকর কর্তৃক লক্ষ্মৌর নবাব শুজাউদ্দৌলহ্-র সেনাপতি 'হিম্মৎ বাহাদুর' উপাধিধারী গোঁসাই অনুপগিরির প্রশস্তিতে লিখিত হিম্মৎবাহাদুর বিরুদাবলী, জয়পুর নরেশ প্রতাপসিংহের প্রশস্তিতে লিখিত প্রতাপসিংহ বিরুদাবলী এবং তৎপুত্র জগৎ সিংহের প্রশস্তিতে লিখিত জগদ্বিনোদ প্রভৃতি। জি.করে মীর পৃ: ২২)—। জি.করে মীর গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে মীর রচনা করেন থ।

উর্দুতে রচিত হলে এটি ভারতীয় ভাষায় লেখা অন্যতম প্রাচীন আত্মজীবনী গ্রন্থ হত। বাংলায় শ্রীমতী রাসসুন্দরী বোধ হয় সর্বপ্রথম আত্মজীবনী লেখেন। তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের। বাংলা রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা বিনোদিনীর আত্মজীবনী-ও একটি প্রথমদিকের রচনা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রচিত এবং মৃত্যুর পর ঐ বৎসর প্রকাশিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় এর কাছাকাছি সময়ে। রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী প্রথম রচনা। তাই প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লেখেন মেয়েরা'। পরবর্তী কালে এ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁর শ্যালিকা সরলাদেবী চৌধুরানী মহিলা রচিত তৃতীয় উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' বাংলা সাহিত্যকে উপহার দেন। মীরের গ্রন্থ উর্দুতে লেখা হলে রাসসুন্দরীর গ্রন্থের প্রায় ৯০ বছর পূর্বের রচনা হ'ত এবং সে হিসেবে এক প্রথম আত্মজীবনীর মর্যাদা পেত। হিন্দীর আত্মজীবনী বহু পরের রচনা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সত্য অগ্নিহোত্রীর আত্মজীবনী 'মুঝ মেঁ দেবজীবন কা বিকাস' প্রকাশিত হয়। উর্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী একেবারে হালের রচনা (এ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে)। গ্রন্থের নাম ইয়াদোঁ কী বারাত (স্মৃতির মিছিল)। লেখক অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক উর্দু কবি জোশ মলিহাবাদী। এই গ্রন্থে জোশ পাশ্চাত্য কোনো কোনো লেখকের অনুকরণে অশালীন ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে কিছু লোকের বিরাগ ভাজন হয়েছেন। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে (পৃঃ ২৩)— ইংরেজি ও ফার্সী (ভারতীয়) এই দুই ভাষায় অন্যোন্যনিরাপেক্ষভাবে কবি জীবনী ও সাহিত্য আলোচনার গ্রন্থ প্রায় একই সময়ে রচিত হয়েছিল। ইংরেজি ও ভারতীয় রচিত ফার্সীতে উক্ত গ্রন্থ দু' দু'জন রচনা করেন। বাংলায় অনুরূপ একটিই গ্রন্থ প্রায় একশ' বছর পরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই ভাষায় ঐ জাতীয় দ্বিতীয় গ্রন্থ রচিত হয় কিছু পরে বাংলা ১৩১১ সালে (১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। দ্বিতীয় গ্রন্থের লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিন্দিতেও উর্দুর ন্যায় সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস অপর ভাষায় লেখা হয়। লেখকও ছিলেন বিদেশী। ইনি ছিলেন এক ফরাসী পণ্ডিত। নাম গার্সাঁ দ

তাসী। গ্রন্থের নাম 'ইসত্তোয়ার দ লা লিৎরেত্যুর এন্দুই এন্দুস্তানী' (হিন্দুস্তানী সাহিত্যের ইতিহাস)। হিন্দীর সঙ্গে উর্দু কবির বিবরণও এই গ্রন্থে ছিল। উভয় ভাষার কবির সংখ্যা মোট ৭৩৮। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। বিভিন্ন ত্রুটি সত্ত্বেও তাসীর এই প্রথম প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

উর্দু কবিদের বিবরণ থাকায় এটিকে উর্দু কবিতার ইতিহাসরূপেও গণ্য করা যায়। তাসী এবং পূর্বোক্ত উর্দু লেখকদ্বয় উর্দু ছাড়া অপর এক ভাষায় উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন। সম্ভবত মসহফীর গ্রন্থ মীরের গ্রন্থের কিছু পূর্বে রচিত হয়। সে ক্ষেত্রে উর্দুর ইতিহাস ও সমালোচনা (অন্য ভাষায় হলেও) প্রথম লেখার গৌরব হয় মসহফীর। মীর দ্বিতীয় এবং বিদেশী তাসী হন তৃতীয় লেখক। তাসীর গ্রন্থ পূর্বোক্তদের গ্রন্থের ৪০-৪৫ বছর পরে বিদেশে লেখা হয়।

উর্দুর ক্ষেত্রে তাসী তৃতীয় হলেও হিন্দীর ক্ষেত্রে কিন্তু তিনিই প্রথম। এভাবে ভারতীয় দু'টি সাহিত্যের প্রথমদিকের ইতিহাস লেখার গৌরব বিদেশী তাসীর প্রাপ্য। হিন্দীর তৃতীয় ইতিহাস লেখার গৌরবও অপর এক বিদেশীর। তিনি স্বনামধন্য জর্জ গ্রিয়ারসন। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রের এক বিশেষ সংখ্যারূপে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজিতে 'দি মডার্ণ ভার্ণাকুলার লিটারেচার অফ হিন্দুস্তান' নামে এটি প্রকাশিত হয়। উন্নত রচনারীতির জন্য বিশেষজ্ঞরা এটিকেই হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক ইতিহাসের মর্যাদা দেন। মাঝে হিন্দীর দ্বিতীয় ইতিহাস শিবসিংহ সেঙ্গর লিখিত 'শিবসিংহ সরোজ' প্রকাশিত হয়।

হিন্দী ও উর্দুর ন্যায় বিদেশীদের নজর বাংলার দিকে পড়ে নি। বিদেশীদের চোখে সেকালে বাংলার আপেক্ষিক গুরুত্বহীনতার এটি অন্যতম প্রমাণ। ফলে এক বাঙ্গালীই এ কাজে অগ্রসর হন। আপন আপন ভাষায় আপন সাহিত্যের সাহিত্যিক জীবনী ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম হ'ল বাংলায় রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ। এটি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়। দশ বৎসর পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দীতে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস পূর্বোক্ত 'শিবসিংহ সরোজ' লেখেন শিবসিংহ সেঙ্গর। উর্দুতে মহম্মদ হুসেন আজাদ (মৃত্যু ১৯১০) লেখেন উর্দু সাহিত্যের কথা।

'আবে হায়াৎ'। কাছাকাছি সময়েই লেখা হয় আলতাফ হুসেন হালী-র (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রীঃ) দিওয়ানের (গজল সংগ্রহ গ্রন্থ) ভূমিকা যা আজ মুক.দ্দমহ্, শের ও শায়রী নামে পরিচিত। এটিও একটি অনুরূপ রচনা।

কবিতা

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (পৃঃ৩৮)— রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে ভারতেন্দু হিন্দী সাহিত্যের এক অনন্য চরিত্র। মাত্র ৩৫ বৎসর (১৮৫০-৮৫ খ্রীঃ) তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প আয়ুকালেই তিনি হিন্দী সাহিত্যের জন্য অদ্ভুত কাজ করে গেছেন। ভারতেন্দু হিন্দীতে আধুনিক কালের প্রবর্তক। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল লিখেছেন যে পুরী যাত্রার পথে ভারতেন্দু বাংলায় নবযুগের বিবিধক্ষেত্রপ্রসারী নতুন প্রবাহ লক্ষ্য করেন এবং তদনুরূপ হিন্দীর বিবিধ ক্ষেত্রে নতুনত্বের প্রবর্তন করেন তাঁর পূর্ববর্তী কালকে হিন্দীতে রীতিকাল বলে। এ কালের কবিরা কাব্য রচনায় বিবিধ রীতিনীতি, আলঙ্কারিকতা, নায়িকাভেদ, শৃঙ্গারিকতা প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। ভারতেন্দু-যুগে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক চেতনার আবির্ভাবের ফলে কবিতায়ও তার প্রতিফলন হয়। ফলত এ যুগ আধুনিক যুগ বলে' চিহ্নিত। এই যুগের নেতৃত্ব করেন ভারতেন্দু। রচনার উৎকর্ষের দিক থেকে এ যুগের লেখকেরা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন নি। তাঁদের গুরুত্ব ভাবের নতুনত্ব আমদানিতে।

ভারতেন্দুর জন্ম হয় নবাব সিরাজুদ্দৌলহ্-র সময়ের সেঠ অমীচন্দ্ (উমী চাঁদ)-এর বংশে। তাঁর পিতা গোপালচন্দ্র গিরিধরদাসও ছিলেন কবি। ভারতেন্দুর কর্ম ক্ষেত্র ছিল কাশী। বাল্যকালেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কাব্যকৃতির সংখ্যা হয় সত্তর। তিনি ১৭টি নাটক, বহু নিবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, জীবনী, ইতিহাস প্রভৃতিও রচনা করেন। তদুপরি কবিবচনসুধা এবং হরিশ্চন্দ্রচন্দ্রিকা নামে দু'টি পত্রিকারও

তিনি সম্পাদকতা করেন। অতি অল্প বয়সের মধ্যে রচনার এত সংখ্যাধিক্য ও বিবিধতা আশ্চর্যজনক। এজন্য যখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর (১৮৮০খ্রীঃ) তখন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা একত্র হয়ে তাঁকে 'ভারতেন্দু' উপাধিতে ভূষিত করেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথও রচনার সংখ্যাধিক্যে ভারতেন্দুকে অতিক্রম করতে পারেন নি। রচনার বিবিধতা রবীন্দ্রনাথের ঐ বয়সে ছিল। ঐ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা, গল্প, নাটক, নিবন্ধ, উপন্যাস, সঙ্গীত, ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি লিখেছেন, সম্পাদকতাও করেছেন। ভারতেন্দুর মতো জীবনী ও ইতিহাস তিনি তখন লেখেন নি বটে, তবে ভারতেন্দু যা লেখেন নি সেই গল্প ও উপন্যাস তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। কিন্তু ভারতেন্দুর মতো রচনার সংখ্যাধিক্য তিনি তখন লাভ করতে' পারেন নি। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ। এই বিবেচনায় রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে ভারতেন্দুকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যপুরুষ বলে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

বিবিধতা বঙ্কিমচন্দ্রেও ছিল। তিনি উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। কিন্তু বয়সের বিচারে রচনার সংখ্যাধিক্যে বঙ্কিম ভারতেন্দুর পিছনে পড়েন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে বঙ্কিম লিখেছেন পাঁচটি উপন্যাস এবং কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ। (তাঁর মোট গ্রন্থ সংখ্যা ২৫)। ঐ সময়ে বঙ্কিম বঙ্গদর্শন সম্পাদনাও করেছেন। তবুও ভারতেন্দুর তুলনায় বয়সের সীমারেখার বিচারে বঙ্কিম পিছনে আছেন।

সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ভারতেন্দু সমাজসেবাও করেছেন। তিনি চিকিৎসালয় খুলেছেন, স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দিয়েছেন, যে সব বালিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তিনি তাদের জন্য পারিতোষিক প্রেরণ করেছেন। একই সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের সেবা করার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যে অর্থে বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়, ভারতেন্দুকেও সে অর্থে হিন্দী গদ্যের জনক বলা যেতে পারে। হয়তো তিনি সমসাময়িক বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবু কোনো কোনো দিক দিয়ে তিনি ছিলেন হিন্দী সাহিত্যে ও উত্তর ভারতের জীবনে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর।

বে-খবর— যে খবর রাখে না। হেরি পন্থখান—মীরকে তাঁর দরবেশ পিতা উপদেশ দিতেন, বেটা, এই দুনিয়ার পথে বহু উঁচু নীচু আছে। দেখে পথ চলবে। খানকা— দরবেশদের থাকার জায়গা। (পরে দ্রষ্টব্য।) ওফা— বিশ্বস্ততা। কাবা— মক্কা নগরস্থ মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনাস্থল। বিশ্বের মুসলমানরা এঁর দিকে ফিরে নামাজ পড়েন। কিবলা—মসজিদের একদিকের দেওয়ালে বক্রস্থান, যা কাবাকে নির্দেশ ক'রে। হরম – কাবার চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেওয়াল। এহ্‌রাম—মক্কায় হজ করতে যাওয়ার সময় কতগুলি কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন সেলাই করা পোষাক না পরা।) কবল সেলাম – ইসলামে পাঁচটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য আছে, যথা কল্‌মা (অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ এই কথা বিশ্বাস করা), নামাজ, রোজা, জাকাৎ (আয়ের নির্দিষ্ট অংশ দান) ও হজ করা (সম্ভব হ'লে)। মীর এখানে হজ প্রভৃতি যে আবশ্যিক নয় সে কথা বলেছেন। দীন্—ধর্ম। দিওয়ান—গজলসংগ্রহ গ্রন্থ। যে শিরের অ'জ গর্ব— মীরের অনুরূপ আর একটি শের

দিল্লীতে ভিক্ষাও আজ নাহি মেলে তাহাদের তরে
কাল তক দৃষ্টি ছিল যাহাদের তাজ্ ও তখ্‌ৎ 'পরে।
দিল্লী মেঁ আজ ভীক ভী মিলতী নহী উন্‌হে
থা কল তলক দিমাগ, জিন্‌হেঁ তাজ ও তখ্‌ৎকা।

হশর—কেয়ামতের দিন সৃষ্টি ধ্বংস হলে মানুষ যে ময়দানে বিচারের জন্য আল্লার সম্মুখীন হবে। রাজ-তাজ—রাজ মুকুট। মাতম— হাহাকার। গাফিল—কাজে অবহেলাকারী। কাফিলা—যাত্রীদল। মস্তী— মত্ততা। মাজার— সমাধিস্তম্ভ বা মন্দির বদনাম— যার বদনাম হয়েছে। আওয়ারা— ভবঘুরে। মঞ্জিল— বিশ্রামস্থল। বে-সতুঁ— ইরাণের এক পাহাড়। কোহ্‌কন— যে পাহাড় কাটে। ইরাণের রাণী শীরীঁকে লাভ করার শর্তস্বরূপ তার প্রেমিক ফরহাদ বে-সতুঁ পাহাড় কেটে পাহাড়ের অপর পার্শ্বস্থ স্রোতস্বিনীকে এ পাড়ে এনেছিল। কিন্তু শর্তভঙ্গ করে বাদশাহ্ শীরীঁকে ফরহাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলে ফরহাদ আত্মহত্যা করে। সে সংবাদ পেয়ে শীরীঁ তার অনুগামিনী হয়। মীর— নিজেকেই সম্বোধন করা উর্দু কবিদের একটি প্রথা। গরিবের গোর—দরবারী আবহাওয়ায় বসে গরিবের কথা ভাবা একটু অন্য। গালিব বরাবর দারিদ্র্য ভুগেছেন বটে, তবে তাঁর পারিবারিক আভিজাত্যের গর্ব ছিল। গালিবে

তাই দরিদ্রের কথা অনুপস্থিতপ্রায়। মীর ছিলেন সাধারণ লোকের সন্তান। সেই সঙ্গে দারিদ্র্যেও তিনি কষ্ট পেয়েছেন। দারিদ্র্যের কথা বলে তিনি উর্দু সাহিত্যে তাঁর বিবিধ অনন্যতার সঙ্গে আরো একটি অনন্যতার অধিকারী হলেন। মীরের ১৫০ বছর পরে ইকবাল রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসূচক ক'টি কবিতা লেখেন। তাঁর পরের বামপন্থী কবিরা দরিদ্রের কথা লিখেছেন, যেমন সাহির লুধিয়ানভী তাজ মহল)। দিমাগ — মগজ। জিন্দগানী — জীবন-যাপন। স্বল্পবাক— অল্পকথায় অনেক কিছু বলা মীরের বৈশিষ্ট্য। ডঃ আব্দুল হক বলেছেন, কখনো কখনো সমুদ্রের উপরিভাগ নিস্তরঙ্গ হলেও ভিতরে থাকে প্রবল আলোড়ন। তদনুরূপ মীরের সহজ সরল ভাষার আড়ালে থাকে অনেক গভীর কথা যা পাঠক লক্ষ্য করেন না। তুঃ Brevity is rhe soul of wit. খোদায়ী – ঐশ্বরিক ব্যাপার। মূর্তি— প্রেমিকা। সাঙ্ (বানান স্বাঙ্ — পশ্চিমোত্তর উত্তর প্রদেশের ও হরিয়ানার আঞ্চলিক জনপ্রিয় লোকনাট্য। নৃত্য-গীতের মাধ্যমে উপস্থাপিত কোনো বিষয়ভিত্তিক এই লোকনাট্য আজিও ঐ অঞ্চলে জনপ্রিয়। ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ডঃ ইন্দ্রশর্মা ওয়ারিশ লিখিত 'স্বাংগ' নামক পুস্তিকায় এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে : স্বাংগ বা নৌটঙ্কী, স্ত্রী পুরুষ এতে একজোড়ে অভিনয় করে, হাসি মজার গান গায় এবং খোলা রঙ্গমঞ্চে নাচে। অনুষ্ঠান সারারাত চলে। বিষয় সাধারণত প্রণয় বা বীরতা। জনজাগরণের কাজে অথবা জনসাধারণকে কোনো কিছু সম্বন্ধে অবাহিত করতেও স্বাংগের ব্যবহার হয়। একদা দেশভক্তি প্রচারের কাজও স্বাংগ করেছে। হ'লো ফাঁস— তুঃ গালিব ((লেখকের 'মির্জা গালিবের কবিতা' থেকে)

কি ভাব আছে আমার মনে, জানবে কেন অন্য জনে ?
করল যে সব কাব্য চয়ন, করল তারাই হাস্যভাজন।

রেখতা — প্রাচীন উর্দু। মীরের সময়ের পূর্বে উর্দু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মীর তাই পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে এই ভাষায় কবিতা রচনা ও প্রচারে উৎসাহ পেতেন না। গালিবও মর্যাদার সঙ্গে ফারসী এবং অবহেলায় উর্দুতে লিখতেন। কেয়ামৎ— সৃষ্টি ধ্বংস। সাকী— যে মদ্য পরিবেশন করে। সাকীর নয়ন— তুঃ জফর :

না শুধাও কত শক্তি ধরে তব মত্ত কালো আঁখি,
কত সূফী মদ্যপায়ী হ'লো তব চোখে চোখ রাখি।

সে জন রচনা— তুঃ গালিব (ঐ)—

বন্ধুজন কোন গুণ স্মরি' মোর করিবে ক্রন্দন ?
আছে মাত্র সুকোমল সাঙ্গীতিক আমার বচন।

সওদা— মির্জা রফীহ্ সওদা (১৭১৩-৮০খ্রীঃ)। মীরের সমসাময়িক বিখ্যাত উর্দু কবি। মজনু— বিখ্যাত আরবী লায়লা-মজনুর প্রেম কাহিনীর নায়ক যিনি লায়লার প্রেমে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। শরাবে কাবাবে— সেকালে মন্দিরে (শাক্ত মন্দিরাদিতে?) প্রচলিত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। শরীফ— সৎ ও সম্রান্ত ব্যক্তি। আরবী শব্দ। মক্কার শরীফ অর্থ মক্কার শাসক। আধুনিক ইংরেজী শেরিফ শব্দটি তুলনীয়। তবে আধুনিক শেরিফের ক্ষমতা হয়ে পড়েছে খুবই সীমাবদ্ধ। ছাড়লে আর্তনাদ— তুঃ গালিব (ঐ) — 'ছাড়ি যদি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, ভস্মীভূত সহস্রেক ঘর'। জাহিদ — নিষ্ঠাবান। মুসীর— পরামর্শদাতা। কুদরৎ— ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ।

খানকা — খানকা সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার মুঘল অ্যাডমিনিষ্ট্রেসন গ্রন্থে (পৃ ১০৮) লিখেছেন: মধ্যযুগের ইওরোপের ন্যায় মুঘলদের সময়ে ভারতে শিক্ষা ছিল ধর্মের অঙ্গ। যে খানকা (মঠ) গুলি ব্যক্তিগত দানে পরিচালিত হত না সেগুলি সরকারের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেত। খ্রীষ্টানদের ক্যাথেড্রালগুলির মতো খানকাগুলিতেও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হবে এরূপ আশা করা হ'ত। মুঘলযুগে রাষ্ট্রের শিক্ষাসম্পর্কিত ব্যয় বহন করা হ'ত 'দান' তহবিল থেকে, যার কর্তা ছিলেন সদর— উস-সুদুর নামে এক আধিকারিক। কে আর বিশ্বাসী নহে—এর মূল উর্দু পংক্তিটির অনুসরণে পরবর্তীকালে নাসেখ ইমাম বখ্শ নাসেখ, মৃত্যু ১৮২৮খ্রীঃ তাঁর বিখ্যাত লাইনটি লেখেন, 'আপ বে-বহরহ্ হ্যায় জো মুআতকিদে মীর নহী'। এবং গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯খ্রীঃ) একটি শেরের দ্বিতীয় লাইনরূপে নাসেখের এই লাইনটি উদ্ধৃত করেন ('মীরে বিশ্বাসী নহে কো যে জন সে জন ভাগ্যহীন')। ইমাম— মসজিদে নামাজ পরিচালনাকারী। সর্বকর্ম খোদাতেই সমর্পণ—ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ গীতার শিক্ষা। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে ও যৎ করোষি যদশ্নাসি প্রভৃতি শ্লোক এই শিক্ষারই বাণী। মীরের শেরটি থেকে মনে হয় তিনি গীতার এই শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ হিন্দু-সহবাসের জন্য এটি স্বাভাবিক মনে হয়। ইসলামে ঈশ্বরে সব কর্ম সমর্পণের কথা নেই। বিখ্যাত 'শিকোয়হ্ (অভিযোগ) কবিতায় ইকবাল অভিযোগ করেছেন যে মুসলমানরা ঈশ্বরের এত নাম নিলেও কেন জাগতিক বিষয়ে তাদের পতন হল, অর্থাৎ ঈশ্বর ভজনা ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ করে) নিষ্কাম নয়, বদলে প্রাপ্যের দাবি আছে। ভীত আমি—একটি চিঠিতে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করে গালিব লিখেছেন যে স্বর্গে একই প্রাসাদ একইনারী নিয়ে বরাবর বাস করতে হবে, ফলে একঘেয়েমি এসে যাবে। জিন্নতের— স্বর্গের, ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণের ফলে যে স্বর্গ লাভ হবে তার। শির আপনার উচ্চ রাখার - মীর একাজ চিরদিন করেছেন এবং এজন্য জাগতিক সুখসুবিধাকে অবহেলা

করেছেন। খিজির— ইসলামের পথপ্রদর্শক। মসীহা— ঈসা মসীহ্ (যিশু খ্রীষ্ট)। আজব বয়ান— যার কথাবার্তা অদ্ভুত। নিহান— গুপ্ত। নাম ও নিশান— চিহ্ন। দুঃখ বাদিতা মীরের কবিতার এক বৈশিষ্ট্য। এই শেরটিতে এবং আরো শের ও গজলে মীরের দুঃখ বাদিতার পরিচয় আছে। সমালোচক ডঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ্-র মতে দুঃখ বাদিতা মীরের শেষ বয়সের কবিতার বৈশিষ্ট্য, যখন তিনি লক্ষ্ণৌ ছিলেন। এ সময়ে দিল্লীর জন্য দুঃখ এবং মৃত্যু ভাবনা জনিত দুঃখ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। অনকা— এক প্রকার পাখী এখন যার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জনসমাজে যার কথা প্রচলিত আছে। আরব্য উপন্যাসের গল্পে অতিকায় ডিমবিশিষ্ট বক পাখীর কথা বলা আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদের হোমা পাখীর কথা বলেছেন, যারা বহু উচেচ ওড়ে এবং উড়তে উড়তেই ডিম পাড়ে, কিন্তু বহু উঁচুতে ওড়ার জন্য মাটিতে পড়ার আগেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়, সে বাচ্চাও মাটিতে পড়ার আগেই উড়তে আরম্ভ করে। এ কথা সে কথা— এটি বিখ্যাত ফারসী কবি শেখ সাদীর একটি শেরের অনুবাদ। মীর আরো কিছু ফারসী শেরের অনুবাদ করেছেন। ডঃ আব্দুল হকের মতে মীরের অনুবাদ মূলের চেয়ে ভালো। সাদীর আলোচ্য শেরটি এই

গুফতহ্ বো দম চো বেয়ায়ী গমে দিল্ বা তু বগোয়েম

চে বগোয়েম কে গম অজ. দিল্ বর দো চুঁ তু বেয়ায়ী

এই ভাবের এটি সহ মোট তিনটি শের এই সঙ্কলনে আছে। জ.ফরেরো এ রকম দু'টি শের আছে :

১) ভেবেছিনু দুঃখ কষ্ট যতো বলিব সে আসিলে নিকটে,
এলো যবে কোনো দুঃখ ব্যথা রহিল না হৃদয়ের পটে।

২) আসিলেন তিনি যবে কাছে বলিতে নারিনু কিছু তাঁয়,
শুধুমাত্র এক দৃষ্টি হানি রয়ে গেনু ভরা পিপাসায়।

মীর তিনবার এবং জ ফর দু'বার এই ভাব নিয়ে শের রচনা করেছেন। এটা ভাবটির সৌন্দর্যের পরিচায়ক। জ.ফর মীর থেকে বা মূল সাদী থেকেও প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানটিও স্মরণ করা যেতে পারে :

কিছু বলব বলে এসেছিলেম,
রইনু চেয়ে না বলে।

সাদী, মীর ও রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ কবিদের যে ভাবটি আকৃষ্ট করেছে তার মাধুর্য অনস্বীকার্য। তবে ভাবের প্রথম উদ্ভাবক হিসাবে শ্রেয়ঃ সাদীর প্রাপ্য।

তুর— আরবের তুর পাহাড়ে ঈশ্বর আলোর শিখারূপে মোজেজের নিকট আবির্ভূত

হয়েছিলেন। ফলে পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর জঞ্জাল হাওয়া— রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কিছু সাহিত্যিক অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ রচনার কাল নির্দেশ করেছেন। এর সুবিধা এই যে এতে কবি-মানসের উদ্বর্তনের ধারাটি অনুসরণ করা যায়। মীর ও অনাধুনিক কালের উর্দু কবিদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা নেই। অনেকেরই দিওয়ান থেকে (মীরের ছ'টি দিওয়ান আছে) সঠিকভাবে বিবিধ রচনার সময়ের হিসাব পাওয়া যায় না। আধুনিক কালের উর্দু তথা অন্যান্য ভাষার লেখকদের একাধিক রচনা সাধারণত প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ রচনার কাল নির্দেশও করে থাকেন। এ কারণে ঐ সব কবি-সাহিত্যিকের মানস বিবর্তনের ধারার অনুসরণ সহজ হয়। অনাধুনিক কালের উর্দু কবি গালিবের চিঠিপত্রে সময় নির্দেশ করা আছে। অন্যান্য অনেকের এরূপ না থাকার ফলে ঐ কবি সাহিত্যিকদের রচনার আভ্যন্তর প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু কিছু রচনার কাল নির্দেশের চেষ্টা করা যেতে পারে। মীরের আলোচ্য শেরটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা কিনা বোঝা যায় না। কেননা এ শেরটিতে জীবন ও সম্পদের নশ্বরত্বের কথা বলা হলেও সঙ্গের পরবর্তী শেরটিতে যৌবনসুলভ প্রেমাতুরতার কথা বলা হয়েছে। তবে দেখা যাচ্ছে যে এখানে তাঁর মৃত্যু চিন্তা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে। মৃত্যু যে অমোঘ ও অনিবার্য, এখানে তা তিনি সখেদে স্মরণ করেছেন। অন্যত্র মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর যে পরিহাসতরল বা দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তা নিশ্চিত অনিবার্য আত্মসমর্পণে পরিণত। ইতিপূর্বে কবি বলেছেন :

মৃত্যুপথকথা বলি' কেন ভয় প্রদর্শায় মোকে ?
ও পথের পানে দেখি যায় তো হে কত কত লোকে।

অথবা

মৃত্যু দুর্বলের এক বিশ্রামের স্থান,
দম নিয়ে পুনর্বার হবে আগুয়ান।

কিন্তু এবারে মৃত্যু সম্পর্কে চরম কথাটি তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল। কবির মৃত্যু ভাবনার এটি পরিণত অবস্থা সূচিত করে।

এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখানো হয়েছে যে বয়সের পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মীরের এবং গালিবের ধর্ম ভাবনায় পরিবর্তন এসেছিল। আগে এঁরা আপন ধর্ম সম্বন্ধে চটুলতা, কোথাও প্রায় ধর্মদ্রোহিতার কথা বলেছেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁদের সে ভাব অপসৃত হয় এবং উভয়েই নিজ ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইকবাল স্বধর্ম নিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তাই ইসলাম বিরোধী কথা তিনি কোথাও বলেন নি। ইকবালে মৃত্যু ভাবনাও দেখা যায় না। কেবল মৃত্যুশয্যায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি মুসলমান, মরতে ভয় পাই না'।

ব্যথা কবি জমা— লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মীর দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করেছেন। লক্ষ্ণৌ যেয়েও তাঁর দুঃখ কষ্টের অবসান হয়নি, দুঃখকষ্ট অন্যরূপ নিয়েছে। লক্ষ্ণৌতে তাঁর ভাতা নির্দিষ্ট হয়েছিল মাসিক ৩০০ টাকা। সুতরাং তাঁর আর্থিক দুরবস্থায় অবসান হয়েছিল। কিন্তু অন্য প্রকার দুঃখ কষ্ট দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে মীরের দুঃখ কষ্ট ছিল তিন প্রকার— দিল্লী ত্যাগের, লক্ষ্ণৌর পরিস্থিতি মনঃপূত না হওয়ার এবং বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতার। বস্তুত মীরের জীবন দুঃখবেদনারই পরম্পরা। তাঁর সাহিত্যে এর প্রকৃত প্রতিফলন হয়েছে। মীর অন্য একটি শেরেও বলেছেন, শেরের আড়ালে আমি দুঃখ কথা শোনালাম বন্ধু। ডঃ হকের মতে মীরের শেরগুলি দুঃখ বেদনার চিত্রশালা, প্রেম বা জ্ঞানের কথাও দুঃখ বেদনায় প্রলিপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে মীর বলেছেন যে তিনি তো কবিতা লেখেন নি, শুধু দুঃখ বেদনার কথা একত্র করে প্রকাশ করেছেন। তিনি এখানে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। কথাটি এই যে কবির পক্ষে দুঃখ বেদনা অত্যাবশ্যক দুঃখ বেদনায় অভিষিক্ত না হলে শ্রেষ্ঠ কবিতার সৃষ্টি হয় না। শ্রেষ্ঠ কবিতা দুঃখাশ্রিত। Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts, কবি কীটস-এর (১৭৯৫—১৮২১ খ্রীঃ) এই বিখ্যাত উক্তি সকল সাহিত্য রসিকের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু কীটস-এর প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে কবি মীরই একথা সবপ্রথম বলে গেছেন। সুতরাং এর জন্য প্রথম প্রশংসা মীরেরই প্রাপ্য, কীটস-এর নয়। শুধু বক্তব্যের জন্য নয়, বলার ভঙ্গিও কীটস-এর ন্যায় মীরেরো মনোহর। কীটস তাঁর লাইনটিতে বিরোধালঙ্কারের সৃষ্টি করে মনোহারিত্ব আরোপ করেছেন। মীরও এক প্রকার তাই করেছেন। কবিতা মনোহারিত্বের, কিন্তু দুঃখ যে শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রাণ, মীরই সবপ্রথম আমাদের এ সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এছাড়া এই দ্বিপদীটিতে নিজ রচনায় মীরের অতৃপ্তিও প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ কবির এটিও একটি লক্ষণ। হালের একটি বাংলা চলচ্চিত্রে ('পারাবত প্রিয়া') কিশোরকুমার কর্তৃক গীত একটি গানের দু'টি প্রথম পংক্তিতে কবি অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করেছেন: অনেক জমানো ব্যথা বেদনা কি করে গান হ'ল জানি না।

শেরটির অন্য একটি অর্থও করা যেতে পারে। তা এই: মীর বলেছেন যে তিনি তো আর কবি নন, কেননা তিনি আর কতো দুঃখবেদনা একত্রিত করে দিওয়ানে স্থান দিতে পেরেছেন! সেক্ষেত্রে দ্বিপদীটির অনুবাদে এরূপ পরিবর্তন করতে হবে:

আমারে না কবি কহ মীর, আমি নই সেই একজনা,
বহু দুঃখ ব্যথা করি জমা করেছে যে দিওয়ান রচনা।

এ ক্ষেত্রে মীরের বক্তব্য এই যে যদিও তিনি জীবনভোর দুঃখ বেদনা ভোগ করেছেন,

তবু একজন প্রকৃত (শ্রেষ্ঠ) কবি হওয়ার পক্ষে তাওযথেষ্ট নয়। সে জন্য আরো দুঃখ সইবার প্রয়োজন আছে।

খিজির কহিছে বারি— তুঃ   বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।

নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম ॥

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা ॥

মহাভারতের বনপর্বে বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির একথা বলেছিলেন। মীর কেবল প্রশ্নই করেছেন, উত্তর খুঁজে পাননি। কিন্তু মহাভারতকার ব্যাসদেব প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটিও সরবরাহ করেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে প্রথম দিকে ৯ মে, ১৮৮২খ্রীঃ) যখন নরেন্দ্র দত্ত রামকৃষ্ণে পূর্ণ বিশ্বাসী হন নি, তখন তিনিও মীরের মতো এই প্রশ্নই করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোনটা লব?' আসলে এটি সকল প্রকৃত জিজ্ঞাসুরই কথা, যা মহাভারতকার বলেছেন, মীর বলেছেন, নরেন্দ্র দত্ত বলেছেন, আবার আরো বহু জ্ঞাত অজ্ঞাত লোক যাঁরা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁরাও বলেছেন। আরমান— বাসনা। তসরুফ— পরের জিনিস আত্মসাৎ করা। মীর হয়তো অন্য কারো ক.তহ থেকে এটির প্রেরণা পেয়েছেন। পূর্ববর্তী লাইন থেকে এই অনুমান পোষকতা লাভ করে। আর একটি গজলেও মীর সমসাময়িক লক্ষ্ণৌর কবি মুজ.ফ্ ফর হুসেন জ.মীরের উল্লেখ করে লিখেছেন:

মীর ইস গ জ.ল কো খু.ব কহা থা জ মীর নে

পর্ অয়ে ম.বাঁ দরাজ বাহোৎ হো চুকী খ.মোশ

এই গজলের মীর খুব ভালো লিখেছে জমীর,

বহু দীর্ঘ কথা হ'ল, এইবার হও সুস্থির।

তসর্রুফ এই আরবী শব্দটিই বাংলায় তসরুফ হয়েছে। কথাটির অন্য অর্থ 'কোনো কাজ শুরু করা।' ক.তহ— আরবী শব্দ, অর্থ এক বিষয়ের কবিতা। গ.জ.ল— আরবী শব্দ, অর্থ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা। গজল উর্দু কবিতার সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ। এতে প্রেমের কথা থাকে এবং বিষয়ের পারম্পর্য থাকে না, অর্থাৎ একটি গজলে বহু বিষয়ের সমাবেশ হতে পারে। গজলের প্রতি দু' লাইনকে শের বলে। মক্কা, মদীনা, কারবালা— মুসলমানদের তীর্থস্থান। মক্কায় মহম্মদের জন্ম, মদীনা তাঁর মুখ্য কর্ম কেন্দ্র। তাঁর দৌহিত্র ইমাম হুসেন কারবালার প্রান্তরে খলিফা (মুসলমান রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রধান) পদাভিলাষী মুআবিয়ার পুত্র এজিদের সৈন্যদের হাতে সসৈন্যে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত

হন। মক্কা ও মদীনা বর্তমান সৌদী আরব রাষ্ট্রে এবং কারবালা ইরাকে অবস্থিত। হলু-স্থুলু পড়তে পারে—মীরের নিজ সম্পর্কে গর্ব। অন্যান্য কিছু বিষয়ের ন্যায় নিজ সাহিত্য সম্পর্কে গর্বেও মীর প্রথম ছিলেন। আশিয়াঁ— পাখীর বাসা। হাল— মুসলমান সূফী সাধকদের ঈশ্বর চিন্তার এক চরম অবস্থা যখন সাধকের জ্ঞান অবলুপ্ত হয়। বৈষ্ণব সাধনায়ও এ অবস্থার কথা আছে, যাকে তাঁরা বলেন 'দশা'। এই শেরটিতে মীর ভণ্ড সূফীদের পরিহাস করেছেন। যথার্থ হাল' তাদের হয় না, তারা 'হাল'-এর ভান করে। মীর বলছেন, তাঁর 'হাল' সম্পর্কিত পংক্তিটি শুনে বিভ্রান্ত ভণ্ড সূফীর হাল-এর ভান করতে বিলম্ব হচ্ছে, ফলে অন্যদের কাছে সে অপদস্থ হচ্ছে। সূফী— মুসলমান সাধক যাঁরা প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনা করেন। ইসলামে প্রেমের স্থান নেই বললেই চলে। এই ধর্মে ঈশ্বর ভীতির আকর। সেমিটিকদের অপর ধর্ম ইহুদি ধর্মেও তাই। উভয় ধর্মই আরবে উদ্ভুত। এঁদের মধ্যবর্তী সময়ে আরবে উদ্ভুত অপর ধর্ম খ্রীষ্ট ধর্মে ঈশ্বরকে ভালোবাসার কথা আছে। আফতাব— সূর্য। হেজাব— আবরণ। খোয়াব— স্বপ্ন। ওয়ায়েজ— ধর্মোপদেশক। বাব— পরিচ্ছেদ। হে ঈশ্বর, কোথা গেল – সওদার অনুরূপ কবিতাটির অনুবাদ দ্রষ্টব্য। মীরের কবিতার প্রকৃতি গম্ভীর, কিন্তু সওদার কবিতাটি অধিকতর মনোগ্রাহী। সেই কথা কথা - মীর প্রাচীন কথার স্থলে হাল অর্থাৎ আধুনিক কথার প্রাধান্য দিয়েছেন এটা তার আধুনিক মানসিকতার পরিচয়। নজরে আমার রয়েছে – সকল সমসাময়িক কবির সম্বন্ধেই মীর সমালোচকের দৃষ্টি রাখতেন। তিনি নিজেকে ব্যতীত মির্জা মহম্মদ রফীহ্ সওদাকে (১৭১৩-৮০খ্রীঃ) পূর্ণ কবি, মীর দর্দ কে (১৭১৯-৮৫খ্রীঃ) অর্ধ কবি এবং মহম্মদ মীর সোজ-কে (১৭২০-৯৮খ্রীঃ) এক চতুর্থাংশ কবি বলতেন। একথা তাঁর সুচিন্তিত বিচারের ফল বলেই মনে হয়। মীর অনেক স্থলে নিজের সম্বন্ধে গর্বোক্তি করেছেন। বারম্বার বলার জন্য তা কখনো হয়তো পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা ভিত্তিহীন নয়। বিশ্বাসের কথা সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করতে সকলে পারে না, একথা মানতে হবে। মীর তা পেরেছিলেন, এ তাঁর অন্যতম অনন্যতা। ইতিপূর্বে মীরের কতগুলি অনন্যতার উল্লেখ করা হয়েছে। এটিও তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। কবি হিসাবে তাঁর সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এবং জাগতিক ব্যাপারে তাঁর ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তাঁর এই মনোভাবের পেছনে রয়েছে বলে মনে হয়। মীরের মতো এত না হলেও কিছু দাম্ভোক্তি আর এক কবিও করেছেন, তবে তা মীরের একশ' বছর পরে। বাঙ্গালী কবি মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য রচনার সময় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে জিজ্ঞাসা করেন, Will not this make me immortal? ঐ কাব্য রচনার প্রারম্ভেও তিনি

লিখেছেন, 'রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' এ দম্ভ ও আত্মবিশ্বাস মীরের মতো মধুসূদনকেই শোভা পায়। মর্সিয়া— উর্দু কবিতার রূপ যাতে কোনো দুঃখকাহিনী ব্যক্ত হয়। কাঁদাইল বহু— তুঃ গালিব

১) ধারণ করিয়া বেশ ফকিরের, দেখছি তামাশা দয়াবানদের।

২) কোন মুখে বিদেশের জানাইব অভিযোগ সব?

ভুলি নাই দেশে মোর আছে কত নির্মম বান্ধব।

খুশী থাকা হইল যে বহু— মীর কি এখানে তাঁর অন্তঃজীবনের কথা বলছেন, বলছেন যে বাইরে দুঃখী হলেও অন্তঃ জীবনে তিনি সুখী ছিলেন?

অগ্নি বচন — তুঃ জফর: রয়েছে জফর গর্মী পূরিত যতো তব কবিতায়,

বড় বড় সব অগ্নিজিহ্ব পড়ি' তাহা জ্বলি যায়।

নামাজী— যাঁরা নিয়মিত নামাজ পড়েন। সামান— বস্তু। মুক্ত সদা রয়— কেননা হারাবার আর কিছুই থাকে না। সরাবখানা— মদ্যপানালয়, এখানে পৃথিবী। বাহার— বসন্ত। ওষ্ঠ আপন খুলিস নাকো— তুঃ শেক্সপীয়র— Give everymen thy ear but little thy tongue. কুফর— ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার না করা। উপবীতও তাই— তুঃ গালিব— ১) আসল ধরম রয় অবিচল নিষ্ঠার আধারে,

মন্দিরে মরিল বিপ্র সমাধি কাবায় দেও তারে।

২) কিবা এসে যায় বলো তসবীহ্ বা উপবীতে,

দেখি নিষ্ঠা যায় পারা শেখে বিপ্রে চিনে নিতে।

দিওয়ান— গজলের সংগ্রহ গ্রন্থ। মূর্তি— এক অর্থ প্রতিমা, অপর অর্থ প্রেমিকা। সাত আকাশ— ইসলামে ক্রমোর্ধ্বে সাতটি আকাশ আছে। ঈশ্বর সপ্তম আকাশের উপরে আরশ-এ বসেন। তুঃ গালিব— সপ্ত আকাশ হয় ঘূর্ণিত নিত্য দিবসযামী। হিন্দু ধর্মে 'পঞ্চ'-এর প্রাধান্য, যেমন পঞ্চ ভূত, পঞ্চ মকার, পঞ্চ গব্য প্রভৃতি। ইসলামে 'সাত'-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, যেমন সপ্ত আকাশ, কোরাণে প্রথম সূরা 'ফাতি-হা-য়' সাতটি বাক্য, কোরাণ সাত দিনে পাঠের ব্যবস্থা, সপ্ত সমুদ্র, কাবা সাত বার প্রদক্ষিণের নির্দেশ, সপ্তবাদী (ইসমাঈলী) শিয়া প্রভৃতি। দ্রষ্টব্য লেখকের ইকবালের কবিতা, পৃঃ টীকা ৩৮। রোজা ও নামাজ— ইসলামে এই পাঁচটি অবশ্য মান্য— কলমা (ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ) নামাজ, রোজা, জাকাৎ (আয়ের নির্দিষ্ট অংশ দান) এবং হজ (সম্ভব হলে)। মীর এখানে এর বিরুদ্ধে বলেছেন। একাক্ষর কথা— খুব সহজ কাজ। শেখী— মুসলমানের শেখ হল হিন্দুর ব্রাহ্মণের মতো। শেখীর অর্থ শেখের কার্যকলাপ। এই গজলটি ইকবালের 'বান্দেদরা'

কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত ওতনিয়ৎ (স্বাদেশিকতা কবিতাটিকে স্মরণ করায়। দ্রষ্টব্য লেখকের 'ইকবালের কবিতা'। হনোজ দিল্লী দূর —১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করতে আসেন, তখন দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ তাঁর আগমন সংবাদ পেয়েও আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তায় সময় কাটাতে থাকেন, যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি করেন না বা নাদিরের সঙ্গে আলোচনায়ও উপেক্ষা দেখান। যখন নাদির লাহোর অধিকার করেন (লাহোর দিল্লী থেকে মাত্র ৩১০ মাইলের মতো দূরে) এবং সে সংবাদ সম্রাটকে দেওয়া হয়, তখনো অবিবেচক সম্রাট নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং উক্তি করেন যে ভাবনার কিছু নেই, 'হনোজ-দিল্লী দূর অস্ত্' ফার্সী কথা, অর্থ এখনো দিল্লী দূরে আছে। ঐ সময় থেকে হনোজ দিল্লী দূর অস্ত কথাটি আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তার একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে। মীর এখানে মুহম্মদ শাহ্-র সেই কথাটির পুনরুক্তি করেছেন। বিশ্রামের স্থান-- শেরটি পুনর্জন্মের ব্যাখ্যায় একটি অতি সুন্দর রচনা। জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাওয়ার পথে মৃত্যু গুলি যেন এক একটি বিশ্রামের অবকাশ। ইসলামে পুনর্জন্ম নেই। তাই কোনো নিষ্ঠ মুসলমানের পক্ষে এ জাতীয় শের রচনা সম্ভব নয়। তবে মীরের কতগুলি শেরে হিন্দুধর্মের প্রতি প্রভূত অনুকূল মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এ শেরটি ঐ সব শেরের সমগোত্রীয় হতে পারে। আবার ইসলামী দৃষ্টি থেকেও শেরটির ব্যাখ্যা চলে। সে ব্যাখ্যা এই: মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। কেয়ামতে সৃষ্টি ধ্বংসের পরে মানুষকে বিচারের জন্য ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। এই উপস্থিতির পূর্বে স্বভাবত দুর্বল যে মানুষ, মৃত্যুতে সে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেবে। হে মলয়, যদি হও—

লক্ষ্ণৌ যেয়েও মীর যে দিল্লীর জন্য এবং দিল্লীর বন্ধুদের জন্য মনে কষ্ট পেতেন, এই গজলটি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সঙ্কলনের অন্যত্রও এরূপ শের পাওয়া যাবে মুখস্নমটিও দ্রষ্টব্য। গজলটি বৃদ্ধ গালিবকে স্মরণ করায়। অর্থকষ্টে ভুগলেও হাতের কাছে লক্ষ্ণৌতে নবাবের দাক্ষিণ্যের আশ্রয়ে গালিব যান নি, যদিও সেটাই স্বাভাবিক ছিল। তিনি নবাব আমজাদ আলি শাহ্-র নামে একটি কসিদা (প্রশস্তি কাব্য) লিখেছিলেন কিন্তু সেটি তাঁকে দেওয়া না হওয়ায় তার মৃত্যুর পর পুত্র ওয়াজিদ আলি শাহ্-র নাম ঐ কসিদায় লিখে শেষোক্তকে দেন। ইয়ুসুফ মির্জাকে লেখা (১৯ মে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি চিঠিতে গালিব ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। এ জন্য গালিব নবাবের কাছ থেকে ৫০০ টাকা পেয়েছিলেন। তবে গালিব যে লক্ষ্ণৌ শহরকে খুব পছন্দ করতেন, তা তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। মির্জা হাতিম আলি বেগ মেহের-কে গালিব একটি চিঠিতে লক্ষ্ণৌর উল্লেখ করে লিখছেন 'হায় লক্ষ্ণৌ, জানি না সেই চির বসন্তের শহরের কি অবস্থা হয়েছে!' চিঠিটি ১৮৫৭'র অভ্যুত্থানের পরে লেখা। অন্য

চিঠিতেও লক্ষ্ণৌর প্রতি গালিবের প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যশিষ্য আলাউদ্দীন আহমদ খাঁ আলাঈকে ৪ এপ্রিল, ১৮৬১ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে গালিব লক্ষ্ণৌর তিন নবাবের সম্পর্কে লেখা কসিদার উল্লেখ করেছেন। গালিব কৌতুক করে' লিখছেন: নসীরুদ্দীন হায়দর ও আমজাদ আলি শাহ্ এক একটি কসিদার পরই ভেগেছেন। ওয়াজিদ আলী শাহ্ তিনটি কসিদার মোকাবিলা করলেন কিন্তু পরে আর সামলাতে পারলেন না।' বস্তুত সাহিত্যের মতো জীবনেও মীর ও গালিবে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়ের পরিবারই বহিরাগত। মীরের পরিবার এসেছিল আরব থেকে, গালিবের পরিবার তুর্কীস্থানাগত। উভয়েই দু'বার অনাথ হয়েছিলেন, অসামুল্লাহ্ ও পিতার মৃত্যুতে মীর এবং পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যুতে গালিব। উভয়েই প্রেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন। উভয়েই দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। উভয়েই ছিলেন বৃত্তি নির্ভর, উভয়েই নিজের সম্পর্কে খুব গর্বিত ছিলেন। গালিব বন্ধুদের চিঠি লিখতেন, বন্ধুরাও তাঁকে চিঠি লিখতেন। এই সূত্রেই উর্দু গদ্য গালিবের চিঠিপত্রে সমৃদ্ধ হয়েছে। মীরের মতোই গালিব বন্ধুদের চিঠি পত্রের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। মীর যে দিল্লীবাসী বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠি পত্র পেতেন না এবং তারি জন্য এই খেদ, তা এই গজলটি থেকে বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মীর নিজে তেমন চিঠি পত্র লিখতেন না। অন্তত উর্দু সাহিত্যে তার চিঠিপত্রের কোনো অবদান নেই, যেমন আছে গালিবের। জিগর— হৃৎপিণ্ড। মোবারক— অভিনন্দনযোগ্য। পতঙ্গ, শমা— পতঙ্গ (পরওয়ানা) হ'লো প্রেমিকের এবং শমা দীপশিখা প্রেমিকার প্রতীক। পতঙ্গ দীপশিখায় আকৃষ্ট হয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এই শমা-পরওয়ানা রূপকটি উর্দু কবিদের বড় প্রিয়। মীর-গালিব-ইকবাল তো বটেই, সম্ভবত এমন কোনো উল্লেখযোগ্য উর্দু কবি নেই যিনি এই রূপকটি ব্যবহার করেন নি। মুহব্বৎ— প্রেম। বন্ধ করো— তুঃ গালিব—

প্রেমের পরে জোর চলেনা, গালিব, তারে যাও নেভাতে,
নিভবে না সে, জলবে ওনা দিলেও তুমি অগ্নি তাতে।

বান্দা— ইসলামে সব মানুষই ঈশ্বরের বান্দা। বৈষ্ণব শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের কথা আছে। ইসলাম দাস্য প্রেম এবং ভীতিভাবাশ্রিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দাস্য প্রেমের প্রশংসা করেছেন— তিনি প্রভু, আমি দাস, এই ভাবটি ভাল। রামকৃষ্ণদেব নিজেও দাস্য ভাবের চরম নিদর্শন রামায়ণের রামদাস হনুমানের ভাবে ভাবিত হয়ে সাধনা করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে লিখেছেন, ঐ সময়ে পঞ্চবটীতে রামকৃষ্ণের সীতা দর্শন হয়েছিল এবং তাঁর মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ লাঙ্গুলের ন্যায় এক ইঞ্চি বৃদ্ধি পেয়েছিল। জীবনের লক্ষ্য— জীবনের পূর্ণ

বিকাশ একদিকে হৃদয়ের উৎকর্ষে, অপর দিকে ঈশ্বরের আভিমুখ্যে। কি আর কাঁদিবে—মীর এখানে শমা-পরোয়ানা রূপকল্পে একটি নতুন কথা যোগ করেছেন। এই শেরটি গালিবের একটি চিঠি স্মরণ করায়। সেই চিঠিতে গালিব লিখেছেন যে 'যে নিজে মরবে না, সে অন্যের মৃত্যুতে শোক করবে।' চিঠিটি গালিব মির্জা হাতিম আলি বেগ মেহের-কে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন। মীরের শেরটিতে বলা হয়েছে যে নিশ্চিতভাবেই তো শমা (দীপশিখা) নিভে যাবে, অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সুতরাং যে অতি শীঘ্র নিজেই প্রাণ হারাবে সে অন্যের মৃত্যুতে আর কী শোক করবে। গালিবের কথায় শোক সেই করতে পারে যে নিজে মরবে না। অর্থাৎ কেউই যখন অমর নয় তখন অপরের মৃত্যুতে শোক করা নিরর্থক। পর্দা — আবরণ, অন্য অর্থে সঙ্গীতের পর্দা। বান্দা হ'তে— আকবর ও ফকিরের কাহিনী স্মরণীয়। একবার এক ফকীর আকবরের কাছে কিছু চাইতে এসে দেখলেন যে প্রার্থনারত অবস্থায় সম্রাট নিজেই ঈশ্বরের কাছে নানা জিনিষ চাইছেন। তাই দেখে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। প্রার্থনা শেষে আকবর তাঁকে ফিরে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা না জানিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। ফকীর বললেন যে সম্রাট তো নিজেই প্রার্থী। সুতরাং তাঁর কাছে না চেয়ে আকবর যাঁর কাছে চাইছেন অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছেই চাইবেন। মৃত্যু পথ কথা— মীরের এ শেরটি আপাতসরলতা ও কৌতুকের নির্মোকে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের একটি অপূর্ব নিদর্শন। তু: রবীন্দ্রনাথ— কেন রে এই দুয়ার টুকু পার হ'তে তোর ভয়। অথবা

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

রবীন্দ্রনাথের পদ দু'টির চেয়েও মীরের পদটি উন্নততর, কেননা উভয়েই দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু মীরে আপাতসরলতা ও কৌতুকের যে নির্মোক আছে রবীন্দ্রনাথে তা নেই। এই প্রসঙ্গে গালিবের শেরটি স্মরণীয়: মরার দিন এক ঠিক তো আছেই, রাত্রে কেন নিদ্রা না হয়। জানিনিকো কিছু— জ্ঞান সমুদ্র সম্মুখে পড়ে আছে, তীরে বসে আমি নুড়ি কুড়োচ্ছি, একথা বলেছিলেন বৈজ্ঞানিক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭খ্রী:)। তাঁর প্রায় এক শতাব্দী পরে মীর নিউটনের উক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়েও একই কথা বলেছেন। তবে মীর শেরের দ্বিতীয় লাইনটিতে অতিরিক্ত একটি তাৎপর্য আরোপ করেছেন। 'কিছু জানি না এটা জানতেই যে একটি জীবন চলে গেল,' নিউটন একথা বলেন নি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও মনিকে বলেছিলেন, 'আমি জানি, আমি কিছুই জানি না।' সক্রেটিসও একথা বলেছিলেন। মীরের পরবর্তী কবি শেখ, ইব্রাহিম জওক.ও (১৭৮৯-১৮৫৪খ্রী:) একটি দ্বিপদীতে লিখেছেন:

জানিতাম জ্ঞান থেকে কিছু যাবে জানা,
জানিলাম সবি কিছু রহিল অজানা।

এসব মহান পুরুষদের চিন্তার সমতার প্রমাণ। কেবলি হিন্দে—সেকালে হিন্দ্ বলতে কেবল উত্তর ভারত বোঝাত। দিওয়ানা - উন্মাদ। দিল্ জিনিসের কবির নগর সভ্যতার প্রতি এই বীতশ্রদ্ধা তাঁর আগ্রা–দিল্লী—লক্ষ্ণৌ বাসের ফল। বাসনা খারাপ কার—কবি এখানে সম্ভবত বন্ধুগণ কর্তৃক কাব্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বাসনা উদ্দীপ্ত করার ইঙ্গিত করছেন। কবি বলছেন, নয়তো তিনি তাঁর রচনা নিয়ে খুশিই ছিলেন। পরবর্তী শেরটিও এই ধারণার পোষক। মীর, মির্জা রফীহ্, খাজা মীর—সমসাময়িক এই কবিত্রয়ের সুসম্পর্কের কথা এখানে বলা হয়েছে। শেরটি সম্ভবত এঁদের যৌবনকালের, ১৭৫৮'য় খাজা মীর দর্দ্-এর মৃত্যুর পূর্বের রচনা। মির্জা মহম্মদ রফীহ্ সওদার জন্ম দিল্লীতে (১৭১৩-১৭৮০ খ্রীঃ)। আহ্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণের (১৭৬১ খ্রীঃ) চার বছর পর অন্যান্য কবিদের আগে ইনি দিল্লী ত্যাগ করেন এবং ফরুখাবাদ ও পরে নবাব আসফুদ্দৌলহ্'র সঙ্গে ফৈজাবাদ হয়ে শেষ জীবনে লক্ষ্ণৌ এসে স্থিতিলাভ করেন (১৭৭৫ খ্রীঃর পর)। এখানে নবাব আসফুদ্দৌলহ্ তাঁর জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করেন এবং তাঁকে মলক্-উল-শোরা (কবি শ্রেষ্ঠ) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন কসীদহ্ (প্রশস্তি কাব্য) রচনায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। চল্লিশটির বেশি কসীদহ্ তিনি রচনা করেছেন। মর্সিয়ায়ও (শোকগাথা) তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। খাজা মীর—খাজা মীর দর্দ—১৭১৯-১৭৫৮খ্রীঃ)। ইনি ছিলেন সম্মানিত সুফী সাধক. সুফী ভাবাপন্ন গজল ও শের লিখেছেন। ইনি উর্দুর এক প্রমুখ কবি, যদিও মীর একে অর্ধ কবি বলেছেন। দিল্লীর দুর্দিনে যখন সকল কবি দিল্লী ত্যাগ করেন তখন বড় কবিদের মধ্যে কেবল ইনিই দিল্লীতে থেকে যান। অত্যাশ্চর্য এই কবিগণ—তু: ইকবাল: ভরী বজ়ম মেঁ রাজ়. কী বাৎ কহ্ দী/বড়া বে অদব হূঁ সজ়া চাহ্তা হূঁ। পূর্ণ সভায় কয়েছি গোপন কথা, বড় বে-আদব, চাই যেন সাজা পাই। রেখতা বলি' বলি'—বাংলায় কবিতা 'রচনা' করা হয়। কিন্তু উর্দুতে বলা হয়। এর কারণ এই যে সমঝদারদের সামনে উর্দু কবিতা পাঠ করাই রীতি। করিছে পেয়ার—প্রথম বয়সে মীর একবার এক আত্মীয়ার সঙ্গে গোপন প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ জন্য পিতার মৃত্যুর পর আগ্রায় বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এবং তিনি দিল্লী চলে যান। সেটা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। এই শেরটি তার অনেক পরের রচনা। বাক্য রম্য করো—উপদেশটি ভালোই। মীর দেখতে ভালোই ছিলেন, কিন্তু নিজ জীবনে এবং কবিতায়ও তিনি 'বাক্য রম্য করো' নীতিটি পালন করেন নি। অন্তত অনেক ক্ষেত্রেই

তিনি যে রূঢ়ভাষী ছিলেন তার প্রমাণ এই গ্রন্থেই আছে। হাঙ্গামা হতেছে— সাধারণ লোক মন্দির ও মসজিদ থেকে প্রেরণা পায়। কিন্তু মন্দির-মসজিদের কর্তা ব্রাহ্মণ-শেখরা পরস্পর বিবাদ করে। এই শেরটি থেকে মীরের সময়কার একটি সাম্প্রদায়িক চিত্র পাওয়া যায়। তাই সত্য কয়— অর্থাৎ সত্য কথাটি বলে না। কিছু নাহি হয়— ডঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ লিখেছেন যে মীরের পূর্বে কবিতায় দ্বৈত অর্থের খুব প্রচলন ছিল। মীরের কবিতায়ও এর বাহুল্য আছে। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক সওদা, দর্দ প্রভৃতি কবিতায় দ্বৈত অর্থের ব্যবহার পরিহার করে ফারসী গজলের ঢং অনুসরণ করেন। এঁদের শিষ্যরাও এঁদের অনুসরণ করেছেন। এ শেরটি সম্ভবত মীরের সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনার ফল। মীরের রচনার যা বৈশিষ্ট্য তা এখানে দীনতার ছদ্মবেশে মীর উল্লেখ করেছেন। গর্ব ও ছদ্ম দীনতার মিশ্রণে এটি একটি সুন্দর শের। বিরূপ সমালোচকদের উত্তরে গালিবও একটি শেরে লিখেছেন: আমি কোথাকার জ্ঞানী কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কলাকার, অকারণ হে গালিব হ'লো সবে দুশমন তোমার। এটি ক্ষেদোক্তি মাত্র। মীরের শেরটি ব্যঞ্জনার দরুন শ্রেষ্ঠতর। দিল্-এ ঠাঁই পাই— বাল্যকালে সৈয়দ অমানুল্লাহ-র সঙ্গে মীর যে সব দরবেশের কাছে যেতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন বায়াজিদ নামে এক দরবেশ। তিনি অমানুল্লাহ্ ও মীরকে উপদেশ দিতেন মন্দির-মসজিদ পরিহার করে মানুষের মনে স্থান লাভের চেষ্টা করতে। এখানে মীর বায়াজিদের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। অন্যত্র অপর এক দরবেশের কথা যে মীরের একটি শের-এ প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। আপন অস্তিত্ব—

তু: গালিব –

আছিল না কিছু যবে আছিল খোদা,
কিছু যদি নাহি হয় খোদা তো হবে,
হওয়াতেই ডুবিয়েছে আমারে, বলো,
আমি যদি না হতাম কী হ'তো তবে?

লক্ষ্ণৌর চেয়ে— এই শেরটি থেকে বোঝা যায় যে মীর বাধ্য হয়ে লক্ষ্ণৌ চলে এলেও দিল্লীই ছিল তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে। অল্প বয়সে নিকটাত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ লোকদের ব্যবহারে মীরকে জন্মস্থান আগ্রা ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই দুর্ব্যবহার এবং জন্মস্থান ত্যাগ, এই দু'টি ছিল মীরের জীবনে প্রথম দুঃখ। এর পূর্বে পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁর সুখের ও সম্মানের জীবন ছিল। পরবর্তী কালে দিল্লী ত্যাগ করতে হওয়ায় বাকি জীবন তিনি ঐ নগরীর জন্য মনে মনে দুঃখ ভোগ করেছেন, যদিও ঐ নগরী তাঁকে আশ্রয় বা স্বস্তি দিতে পারে নি। তবু ৪০ বৎসর যে নগরীতে তিনি বাস করেছেন, জন্মস্থান থেকে সেই নগরীই তাঁর প্রাণমন জুড়ে ছিল। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে যে আগ্রার জন্য তাঁর

কোনো খেদ ছিল না। ছিল, যেমন এই শেরটিতে : চলা অকবরাবাদ সে জিস ঘড়ী / দর্ ও বাম পর চশমে হসরৎ পড়ী / আকবরাবাদ ছাড়ি চলিনু যখন, ঘরদ্বার 'পরে পড়ে ব্যাকুল নয়ন। এই প্রসঙ্গে ১১৭ বৎসর পরে লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব এবং অখতার (সূর্য) ছদ্মনাম ধারী ওয়াজিদ আলি শা'র লক্ষ্ণৌ ত্যাগ খেদোক্তি স্মরণ করা যেতে পারে : দরো দীওয়ার পে হসরৎ সে নজ়র করতে হ্যায়

খুশ রহো অহলে ওতন হমতো সফর করতে হ্যায়

ওয়াজিদ আলী শা'র শেরটি মীরের শেরটির দ্বারা প্রভাবিত। মীর শেষ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌকে পছন্দ করেন নি। এ শহরকে তিনি পেচক নগরী বলেছেন এবং এ নগরী ত্যাগ করতে চেয়েছেন। রাত্রি দিবা— কুদিন-সুদিন। খাই তার গালি— তু: গালিব—

কতনা মধুর তার অধর, গালি খায়,

প্রতিদ্বন্দ্বী বেমজা হয় না তায়।

সুখ সন্ধানীর— এটি একটি অপূর্ব শের, বিরোধালঙ্কারের একটি চমৎকার নিদর্শন। যে সুখের সন্ধান করে সে গৃহত্যাগ ক'রে প্রাচীরের তলে দিন যাপন করে না। প্রেমের জন্য যে এই কষ্ট স্বীকার করেছে, তাকে সুখ সন্ধানী বলা সত্যের অপলাপ। কিন্তু মীর বক্তাকে দিয়ে সরলভাবে বলাচ্ছেন যে যে-ব্যক্তি প্রেমের জন্য শোর গোল সৃষ্টি না ক'রে প্রাচীরের তলে পড়ে আছে, সে নিশ্চই সুখের জন্য এরূপ করছে, প্রেমের জন্য তার কোনো ব্যাকুলতা নেই। উঠে পড়ে কোলাহল— তু: গালিব—

অভিযোগে পূর্ণ মোর হিয়া, রাগে যথা পুরিত সেতার,

ঝঙ্কার দাওনা বারেক, দেখ ফল কিবা হয় তার।

মদানন্দ মেঘাগমে— তু: গালিব—

ছেড়েছি সরাব, কথনো সখনো খাই,

দিনে মেঘ যদি রাতে চন্দ্রমা পাই।

শেরটিতে মীর বৈষ্ণব কবিতার বিপ্রলব্ধার মতো একটি রসমূর্তির সৃষ্টি করেছেন। বহুদিন রহিবে স্মরণে— তুলনীয় বিবেকানন্দ : 'মানুষ হয়ে জন্মেছিস, একটা দাগ রেখে যা।' কাঁদো হেনো— ক্রন্দনের সময় অঙ্গাদির, স্বরের বা ভাষার বিকৃতির জন্য অনেক সময় শোক সত্ত্বেও হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। মীর সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক। উজার এ বসতিতে— তু: জ়ফর—

উজার এ নগরীতে কিছু নাহি মন চায়,

কেবা কিবা পায় বলো অস্থির দুনিয়ায়।

তুলনায় জ়ফরের শেরটিই উৎকৃষ্টতর। হেন কর্ম করে যাও— তু: জ়ফর—

সে জীবনে কিবা লাভ যদি হ'লো নাকো ভালো কাজ করা,
অমরতা হ'বে লাভ যদি আত্মদানে হয় কভু মরা।

মেঘের মৌসুম হবে— তুঃ জ.ফর—

সে র'বে একেলা বসি' কদলী পাদপ তলে,
তখন আমিও সেথা একেলা যাইব চলে,
জ.ফর, বলো না কতো স্ফূর্তি হ'বে তা হ'লে!

এই অবসর—কোরাণে আছে, এই জীবন ও সৃষ্টি ক্ষণকালের ব্যাপার, যে কোনো সময়ে সৃষ্টি ধ্বংস (কেয়ামৎ) হ'তে পারে। তখন ঈশ্বরের সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত হতে হ'বে এবং বিচার অনুসারে হয় স্বর্গ অথবা নরক বাস চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হবে। সে ক্ষেত্রে এই জীবন তো প্রতীক্ষা মাত্রই। এই ভাব অন্য শেরেও আছে।

কেমনে স্বীকার করি – তুঃ গালিব—

১) কোন মুখে বিদেশের জানাইব অভিযোগ সব ?
ভুলি নাই দেশে মোর আছে কতো নির্মম বান্ধব।
২) সমব্যথী মোর করে অপযশ, লাগুক আগুন, এই তো প্রণয়,
দুঃখের তাপ সহেনা যাহার বন্ধু আমার কেন সে হয় ?

অস্তিত্ব আপন— তুঃ গালিব—

সৃষ্টি ধোঁকায় দিওনা অসদ ধরা,
কল্পনা জাল বুত্তে জগৎ গড়া।

আধ খোলা চক্ষু— তুঃ গালিব

আধেক খোলা তাহার আঁখির তীব,
তার বারতা শুধাক মোরে কেহ,
শুধাক আসে জ্বলন কোথা হ'তে,
হিয়ার পারে যে জ্বলনের গেহ!

মিলনে ও বিচ্ছেদেতে – তুঃ গালিব—

তফাৎ কিছুই নাইকো প্রেমে বাঁচায় মরায়,
তাকে দেখেই পরাণ বাঁচে যার বিরহে পরাণ হারায়।

একটি চর্যাপদে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে :

জইসো জাম মরণ বি তইসো,
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো।

বহু খেদ করিবে— মীর জীবিতাবস্থায়ই বহু সম্মান পেয়েছিলেন। সুতরাং এ শেরটি

তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হয়তো তিনি প্রাপ্ত সম্মানে সন্তুষ্ট ছিলেন না।
দুই আঁখি আসিবে ভরিয়া— কোরাণে এই বাঞ্ছিত অবস্থার উল্লেখ আছে— 'যখন তা (কোরাণ) পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ...... এবং কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।' (১৭। ১০৭-৯)। ঈশ্বর প্রেমে কাঁদার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার উপদেশ দিয়েছেন। বাংলা গানেও আছে, 'কেন হরি বলতে নয়ন ঝরে না।'
এবং চৈতন্যদেব : গলদশ্রু ধারায় নয়ন গদগদ ভাষেতে বদন,

রোমাঞ্চে দেহ পূর্ণ হ'বে তব নাম গ্রহণে কখন ?

দশ দিন খেদ—. তুঃ উর্দূ প্রবাদ— 'চার দিন কী চাঁদনী, ফির অন্ধেরী রাত।'
মহররমে খেদ— ঈদের সুখউৎসব হয় একদিনের, কিন্তু মহররমের দুঃখের অনুষ্ঠান চলে দশ দিন ধরে। দুঃখবাদী মীরের বক্তব্য এই যে পৃথিবীতে সুখের তুলনায় দুঃখ অনেক বেশি। মহররম শিয়া মুসলমানেরা বিশেষ গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করেন। মীরও শিয়া ছিলেন। লক্ষ্ণৌ নবাব বংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী শ্রীঅঞ্জুম কদরের মতে, জওক. ও দাগ. ব্যতীত প্রায় সকল খ্যাতনামা উর্দূ কবিই ছিলেন শিয়া, যথা মীর, গালিব ইত্যাদি। বিচ্ছেদ রজনী – তুঃ গালিব—

১) বিরহ রজনী কারে আর বলি কেমন সে জ্বালা তার,
মরা আর মোর কী খারাপ ছিলো হ'তো যদি একই বার।
২) বিচ্ছেদরজনীগুলি স্মরণেতে যবে দেয় দেখা
কত কাল আছি পৃথিবীতে ভুলি তার হিসাবের লেখা।

নসীম— ভোরের হাওয়া। কামাল— উৎকর্ষ। পেয়ার করার লাগি - এটি পারসিক কবি শেখ সাদীর একটি দ্বিপদীর উর্দূ অনুবাদ। মীর এরূপ ক'টি ফার্সী দ্বিপদীর অনুবাদ করেছেন এবং ডঃ হকের মতে. মূলের চেয়ে অনুবাদ ভালো। মূল ফারসী শেরটি এই

দোস্তাঁ মুহ্ কনন্দম কে চুরা দিল্ বুতো দাদম
বায়েদ অওঅল বুতো গুফতন কে চনী খূব চুরায়ী

চিত্রকল্প— তুঃ জফর— দিল্লীতো শুধু ছিল না শহর, ছিল সে বাগিচা আর,
কত না শান্তি ছিলো হেথা, হায়, দেখো আজি সে উজাড়।

বার্তা না করিও— অপরের রেখতা সম্পর্কে অসন্তোষ এবং নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারনার প্রকাশ। একাক্ষর অবসর— দীর্ঘজীবী মীরের এ খেদ অযৌক্তিক। তবে নিজ রচনা সম্পর্কে অতৃপ্তি সকল শ্রেষ্ঠ লেখকেই বর্তমান। নয় তা কাবায়—কাবাকে অস্বীকার করা ইসলামে খুবই গর্হিত কাজ। মীর অন্যত্রও একাজ ক'রেছেন। শৌণ্ডিক আপণ— শুঁড়ির দোকান - অর্থাৎ পানশালা। একটি সাক্ষাতে— তুঃ গালিব—

গোপন কটাক্ষে কভু ব্যক্ত লক্ষ প্রেম হৃদয়ের,
কোপন কটাক্ষ কভু সমতুল লক্ষ শৃঙ্গারের।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - 'যাঁহারা মনে করেন যথার্থ বন্ধুত্বের জন্য অনেক দিন এবং অনেক কথাবার্তা হওয়া চাই-ই, তাঁহাদের এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, না, তাহা আবশ্যক নহে। (দত্তা) ঠাঁই মাত্র আছে— সম্ভবত মীর বলতে চেয়েছেন যে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল পীর—দরবেশদের মধ্যেই ইসলাম বেঁচে ছিল। অন্যত্র তা ছিল কলুষিত। খাস—বিশিষ্ট। চেষ্টালব্ধ কিবা হয়— তু: ১। রামচরিত মানস (বালকাণ্ড) : রাম কীন্‌হ চাহহিঁ সোই হোঈ।
কবৈ অন্যথা অস নহিঁ কোঈ॥

অথবা উর্দু দ্বিপদী : মুরদই লাখ বুরা চাহে তো ক্যা হোতা হ্যায়
ওহী হোতা হ্যায় যো মঞ্জু.রে খে.দা হোতা হ্যায়
কিবা হয় তাতে যদি দুশমন লক্ষ মন্দ চায়,
হয় তা-ই যা করেছে মঞ্জুর খোদায়।

একটু রঙীন— শেরটি ভারি চমৎকার। মীর অতি দরিদ্র, কৌপীন মাত্র ধারী। কিন্তু ওরি মধ্যে তাঁর রঙীন মেজাজের পরিচয় তিনি রেখেছেন কৌপীনটি জাফরাণী রঙে রাঙিয়ে নিয়ে। অনুরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রূপাত্মক একটি প্রবাদ এই : 'বুড়ঢী ঘোড়ী লাল লগাম।' অর্থাৎ স্ত্রী ঘোড়াটি বুড়ো হ'লে কি হবে, তার লাগামটি বেশ বাহারে, লাল। অবশ্য মীর যে এখানে তাঁর নিজের কথাই বলছেন, তা নয়।

উভয়েতে ডাকে— তু: গালিব—
একদিকে মোর ধর্ম অন্য দিকে অন্য ধর্ম টানে,
পশ্চাতেতে কাবা মোর দেবালয় সম্মুখের পানে।

কুফরেতে ঝুঁকেছিনু— প্রথাগত ভাবে মসজিদ-মন্দিরে যাওয়াকে মীর অগ্রাহ্য করছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরে আসক্তিই প্রকৃত ধর্ম। কী বা আর কামাল— অন্যত্র অন্য কথা বলেছেন— 'বচন রচনা নহেকো সহজ।' কত দ্রুত শেষ— দীর্ঘজীবী মীরের বয়সের জন্য খেদ। আরো কিছু শের বলো— নিজ সৃষ্টিতে অতৃপ্তি সব প্রকৃত স্রষ্টারই সাধারণ লক্ষণ। কেমন শক্তিমান— ভালো কাজ নষ্ট করে যারা গর্ব করে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ। মন্দির অরণ্যে ভ্রমে ভ্রমিয়াছি— এটি মনে হয় মীরের শেষ বয়সের রচনা। শেষ বয়সে লোকে সাধারণত আপন ধর্মকেই আশ্রয় করে। তাঁর তেজ বীর্য তখন কমে আসে। মীরও তাই কাবার পথের সন্ধান করছেন। নতুবা যিনি বারম্বার রোজা, নামাজ ও কাবাকে অস্বীকার করেছেন, এমনকি ইসলামকে অপবাদ দিয়েছেন (ইসলামের দীপ্তি লাগি কিছু কিছু

কুফরতো চাই), কেন তিনি এখন সুদূর কাবায় যাওয়ার জন্য খিজিরের সাহায্যে প্রার্থী হবেন? মীরের মতো স্পষ্ট করে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়ের বিরোধিতা না করলেও গালিবও নিজ রচনায় কিছু কিছু ইসলাম বিরোধী কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে রোজা ও নমাজ তিনি মানতেন না। ইসলামে নিষিদ্ধ মদ্যপানে ও জুয়ায় তিনি দারুন অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে চিঠিতে তিনিও কেবল আল্লাই যে ভরোসা এ কথা বলেছেন। আগুনের পুজক — প্রাচীন পারসিক জরথুস্ত্র ধর্মানুসারী।

আনন্দ ছাড়া কিছু নয়— তু: গালিব—

প্রেমের ছোঁয়ায় এই জনমেই পান করেছি জীবন সুধা,
সকল ব্যথার প্রলেপ সে মোর, শান্তি বিহীন সে মোর ক্ষুধা।

বালকের মতো বানালাম— তু: গালিব—

আমার কাছে এই দুনিয়া সব শিশুদের মেলা,
অহর্নিশি সম্মুখে মোর চলছে তাদের খেলা।

মীরের নিজেরো এরকম অন্য শের আছে। বাংলার সাধক কবির গানও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে:

লোকে বলে লোকে বলে রে
ঘর বাড়ি বালা নায় আমার,
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার।
ভাল করি ঘর বানাইয়া কএ দিন থাকব,
আর আয়না দিয়া চাইয়া দেখি
পাকা চুল আমার।
এই ভাবিয়া হাছন রাজায় ঘর দুয়ার না বান্দে,
কথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।
হাছন রাজায় বুজত যদি বাইচবে কত দিন
দালান কুটা বানাইত করিয়া রঙ্গিন।

এই কবি হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২)-এর পিতা ছিলেন সিলেট জিলার জমিদার। মীর ও হাসন রাজা উভয়ের ভাবনাই সুফী চিন্তাপ্রসূত।

কারোয়াঁ—ক্যারাভান, উটের সারিসহ যাত্রীদল। ৯০-১২৫ সংখ্যক কবিতাগুলি কতআ। ১২৬ থেকে আবার শের ও গ.জ.ল। ভেবে দেখো দুঃখে— মীরের যে সব কবিতায় সমকালীন ইতিহাসের চিত্র আছে এটি তার অন্যতম। বেখুদ— আত্মবিস্মৃত। হামেশাতো দিয়ু দেখা— তু: রবীন্দ্রনাথ, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।'

ফর্দ

তাক্ত নাহি করে— তুঃ গালিব—

দেখিও গালিবে তাক্ত কেহ না করে,
বাহিরে কাফের, সাধক সে অন্তরে।

মীর অমানুল্লাহ্‌র সঙ্গে কবি মীর এক দরবেশের কাছে গিয়েছিলেন যিনি একটি গুহায় বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল এহ্‌সানুল্লাহ্‌। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি গুহার ভিতর থেকে বলতেন, 'আমি ঘরে নেই'। একথা শুনে অনেকে চলে যেতেন, কিন্তু যাঁরা তাঁর এ ব্যাপারটা জানতেন তাঁরা অপেক্ষা করতেন এবং দর্শন পেতেন। এই শেরটিতে ঐ ঘটনার প্রতিফলন হয়েছে। নসীম— ভোরের হাওয়া।

রুবাই

পীর— সাধক-গুরু। হইবে কি কাজ— তুঃ গালিব—

কিবা এসে যায় বলো তসবীহ্‌ বা উপবীতে,
দেখি নিষ্ঠা যায় পারা শেখে বিপ্রে চিনে নিতে।

আদম-প্রকৃত মানুষ। নিজেই আলম— নিজেই নিজে জগতে একাকী বাস করবে। এই চতুষ্পদীটি বোধ হয় মীরের শেষ বয়সের রচনা, যখন নিজের সম্বন্ধে গর্বোক্তি কমে গেছে। নতুবা এটির ভিত্তিতে মীর নিজেই বাতিল হয়ে যাবেন। শাম— সন্ধ্যা।

বনে নাকো আর— তুঃ গালিব—

কোন মুখে বিদেশের জানাইব অভিযোগ সব,
ভুলি নাই দেশে মোর আছে কত নির্মম বান্ধব।

এ সভা উজ্জল ছিল— তুঃ গালিব—

বন্ধুজন কোন গুণ স্মরি' মোর করিবে ক্রন্দন,
আছে মাত্র সুমধুর সাঙ্গীতিক আমার বচন।

আজব ফকির— তুঃ গালিব—

দেখিও গালিবে তাক্ত কেহ না করে,
বাহিরে কাফের, সাধক সে অন্তরে।

মুস্তজাদ

দিল্লীতে বহুৎ শক—জফরের উদ্ধৃত শের দ্রষ্টব্য। লেখকের 'বাহাদুর শা' জফরের কবিতা' গ্রন্থে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে দিল্লীর দুরবস্থার বর্ণনায় জফরের আরো অনুরূপ কবিতা দেখা যেতে পারে। মীরের ও জফরের কিছু কবিতায় শতাধিক বৎসর পূর্বের দিল্লীর চিত্র বিবৃত আছে।

মসনোবী

এটি মাত্র নির্বাচিত ৭৮ লাইনের অনুবাদ। মূল কবিতাটি ২৩৬ লাইনের।

মির্জা গালিবের সঙ্গে মীরের যেমন অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিলো, তেমনি ছিল বাসস্থানের বিষয়েও। তবে গালিব তাঁর বাসস্থানের কথা বলেছেন চিঠিপত্রে, মীরের মতো কবিতায় নয়।

দিল্লীতে মীর যেখানে থাকতেন এখন তার হদিস করা কঠিন। কিন্তু গালিবের বাসস্থানের হদিস পাওয়া যায়। লালকেল্লার কাছে চাঁদনী চকের দক্ষিণে বিল্লী মারেঁা মহল্লায় বড় প্রবেশদ্বার যুক্ত একটি বাড়ি এখনো আছে যেটিকে গালিবের অন্যতম বাসস্থান বলে দেখানো হয়। (গালিব দিল্লীতে কয়েকটি স্থানে বাস করেছেন।) বিল্লী মারেঁা-র এই বাসস্থানের কথা গালিবের চিঠিতে আছে। গালিবের চিঠিপত্রে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধেও কিছু কিছু খবর এই সব চিঠিপত্রে আছে। তাতে দেখা যায় যে গালিবের ঘরের হাল মীরের ঘরের চেয়ে কিছু ভালো ছিল না। একটি চিঠিতে গালিব লিখেছেন, 'আমার আস্তানা রাস্তার উপরেই'। (পূর্বোক্ত বিল্লী মারেঁা-র গৃহটিও রাস্তার উপরে।) অপর একটি চিঠিতে লিখেছেন যে তিনি সবার বেগের হাবেলিতে বাস করতেন। আর একটি চিঠিতে প্রিয়পাত্র ও কাব্য-শিষ্য লোহারুর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আলাউদ্দীন অহমদ খাঁ আলাঈ-কে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই গালিব লিখেছেন: মিয়াঁ, বড় বিপদে আছি। মহলসরার দেওয়ালগুলি পড়ে গেছে। পায়খানা ভূমিসাৎ হয়েছে।……দিওয়ানখানার অবস্থা মহলসরার চেয়েও খারাপ।……ছাতের অবস্থা চালুনির মতো। মেঘ যদি দু' ঘণ্টা জল দেয় তবে ছাত দেয় চার ঘণ্টা। গালিবের এই বাসস্থানও ছিল দিল্লীতে। মীরের কবিতার সঙ্গে গালিবের এই চিঠির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত। শেখ চিল্লী—কল্পিত বেওকুফের নাম। বসর—বাস।

এই গ্রন্থে উর্দূ কবিতার যে সব রূপের অনুবাদ আছে তা হল শের, গ.জ.ল, ফর্দ, রুবাই, মুস্তজাদ, মুখম্মস ও মসনোবী। অপর রূপ মুসদ্দসের অনুবাদ এই গ্রন্থে নেই। শের হ'ল গজলের অংশ এক একটি দ্বিপদী। গজলের প্রতিটি শের স্বয়ং সম্পূর্ণ, অন্য

শেরগুলির সঙ্গে অর্থজনিত তার সম্পর্ক সাধারণত থাকে না। প্রথম শেরের দু' লাইনে এবং পরবর্তী প্রতি শেরের শেষ লাইনগুলিতে মিলের অনুক্রম চলে। গজল হ'ল মূলত প্রেমের কবিতা। ফর্দ্ দু' লাইনের স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা, কিন্তু শেরের মতো ফর্দ্ কারো অংশ নয়। ফর্দ্ কথাটির অর্থও 'এক'। রুবাঈ হ'ল চতুষ্পদী, মিল চলে ককখক অনুক্রমে। রবীন্দ্রনাথের কণিকা কাব্যগ্রন্থে ফর্দ্ ও রুবাঈ-র সুন্দর নমুনা আছে, যদিও রুবাঈ-র মিল আবশ্যিকভাবে উদূ'র মতো নয়। ফর্দ্-এর তুলনা:

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

রুবাঈ-র তুলনা: কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি' উঠে, "এসো মোর দাদা" ॥

মুস্তজ়াদ কথাটির অর্থ হ'ল 'বর্ধিত করা'। মুস্তজ়াদে প্রতি লাইনের শেষে একটি বর্ধিত অংশ থাকে বলে এরূপ নাম। কবিতাটি চার লাইনের। মূল ও বর্ধিত উভয় অংশেই মিল চলে রুবাঈ-র মতো, অর্থাৎ কক খক অনুক্রমে। মুখ়ম্মসে থাকে প্রতি স্তবকে পাঁচটি করে পদ। প্রথম স্তবকটিতে সব লাইনের শেষে এক মিল থাকে। পরবর্তী স্তবকগুলিতে প্রথম চার লাইনের মিল অন্য রকম, কিন্তু শেষ লাইনের মিল হবে প্রথম-স্তবকের সঙ্গে। মুসদ্দসের প্রতি স্তবকে থাকে ছ'টি ক'রে পদ বা লাইন। প্রথম চার লাইনে একরকম মিল, শেষ দু' লাইনে অন্য রকম। উদূ´ কবি আলতাফ হুসেন হালীর (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রীঃ) মুসদ্দস বিখ্যাত।

শের, গ়জ়ল, ফর্দ্, রুবাঈ, মুস্তজ়াদ, মুখ়ম্মস, প্রভৃতি শব্দগুলি আরবী। এদের মূল কাব্যরূপও তাই আরবী হওয়ার সম্ভাবনা।

উদূ´ কবিতার এগুলি হ'ল গঠনগত রূপ, অর্থাৎ বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ রূপের দিক থেকে অর্থাৎ বিষয়ানুগভাবে উদূ´ কবিতার বিভাগ হ'ল গ়জ়ল (প্রেম বিষয়ক কবিতা), মর্সিয়া (শোক গাঁথা), মসনোবী (নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা), ক়সীদহ্ (প্রশস্তি কাব্য), সেহ্রা (বিবাহের কবিতা), সলাম (ঈশ্বর বা মহম্মদ বন্দনা) প্রভৃতি। এগুলিও আরবী শব্দ। কাব্যরূপগুলিও মূলত হয়তো আরবীই ছিল।

মূল উদূ´ পাঠে উচ্চারণ সম্পর্কে এই ইঙ্গিতগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে: শ=sh, স=s, ক়=ক, খ়=খ্‌ব, গ়=gh, জ়=z।

যাঁরা উদূ´ ভাষা জানেন তাঁদের জন্য একটি কথা। গালিবের সময়েই (১৭৯৭-

১৮৬৯ খ্রীঃ) উর্দু তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। সুতরাং গালিব পাঠ করতে যেয়ে (মূল উর্দুতে) পাঠককে ঠেক খেতে হয় না। কিন্তু তাঁর পৌনে এক শ' বছর আগে উর্দুর রূপে কিছু পার্থক্য ছিল। মীরের কবিতায় তার ছাপ রয়ে গেছে। এই গ্রন্থের উর্দু অংশে পাঠক তার কিছু পরিচয় পাবেন যেমন—করেঁ হ্যায় (কী হ্যায়), উন্‌নে (উন্হোঁনে), কসোকো (কিসীকো), জাগহ্ (জগহ্), ছেড়ু হুঁ (ছেড়তা হুঁ), কভো (কভী), করু হুঁ (করতা হুঁ), কিয়া চাহিয়ে (করনা চাহিয়ে) প্রভৃতি। অবশ্য পোয়েটিক লাইসেন্স এর নামে এর কিছু কিছু চলতে পারে, কিন্তু সব নয়।

এই গ্রন্থে মীরের অনুবাদ ব্যতীত অন্য যে সব অনুবাদ আছে তা সব লেখকের স্বকৃত, অধিকাংশ লেখকের 'মির্জা গালিবের কবিতা', 'বাহাদুর শা', জফরের কবিতা' এবং 'ইকবালের কবিতা' গ্রন্থত্রয় থেকে গৃহীত। এই গ্রন্থের মূল কবিতার পারম্পর্যে ডঃ আব্দুল হক সম্পাদিত 'ইন্তখাবে কলামে মীর (মীরের নির্বাচিত রচনা) নামক সুখ্যাত গ্রন্থের অনুসরণ করা হয়েছে।

-- সমাপ্ত --